অলৌকিক নয়, লৌকিক

প্রবীর ঘোষ

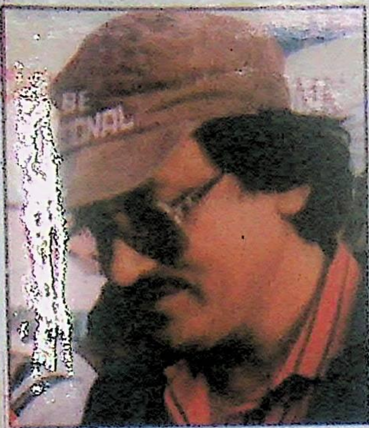

সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে উপাসনা-ধর্মের নতুন দিকে আলো ফেলেছে গ্রন্থটি। বৈচিত্র্যময় অসম-বিকাশের পৃথিবীতে নানা উপাসনা-ধর্মের বিবর্তনের ইতিহাসও বৈচিত্র্যেভরা। প্রাক-বৈদিক যুগ থেকে নানা ধর্মের বিকাশ ও হিন্দু-ধর্মের পাঁচটি তন্ত্র-ধারা নিয়ে গ্রন্থটিতে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনায় বৈদিক সাহিত্য চিহ্নিত-'আস্তিক্যবাদ' ও 'নাস্তিক্যবাদ'-যেমন এসেছে, তেমন-ই এসেছে তন্ত্র ও তন্ত্রের শাখা-প্রশাখা। স্বভাবতই এসেছে 'বশীকরণ', 'মারণ-উচ্চাটন' ইত্যাদির মত রহস্যময় নানা প্রসঙ্গ। আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী লেখক তাঁর সুনামের মুকুটে আরও একটি রত্ন যুক্ত করলে গ্রন্থটিতে, প্রামাণ্যতা বজায় রেখে তন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি ও তন্ত্র-তত্ত্বের রহস্য উন্মোচন করে।

অলৌকিক নয়, লৌকিক

পঞ্চম খণ্ড

অলৌকিক নয়, লৌকিক

পঞ্চম খণ্ড

প্রবীর ঘোষ

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ALOUKIK NOY, LOUKIK (Vol. V)
(Natural, not Supernatural)
by PRABIR GHOSH
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
www.deyspublishing.com
₹ 250.00

ISBN 978-81-295-1869-9

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৩, মাঘ ১৪০৯
ষষ্ঠ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৭, মাঘ ১৪২৩

প্রচ্ছদের আলোকচিত্র : ছত্রিশ গড় প্রদেশের বস্তারের একটি মাতৃমূর্তি

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : যুক্তিবাদী

অঙ্কন : মিলন, প্রশান্ত মণ্ডল

২৫০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং : লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মানবতাবাদী এবং দীক্ষিত পাঠক
শ্রীসনাতন মুখোপাধ্যায়'কে

প্রবীর ঘোষের অন্যান্য বই

আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না
অলৌকিক নয়, লৌকিক (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ)
সংস্কৃতি ঃ সংঘর্ষ ও নির্মাণ
যুক্তিবাদের চোখে নারী-মুক্তি
ধর্ম-সেবা-সম্মোহন
যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা
প্রবাদ-সংস্কার-কুসংস্কার
স্বাধীনতার পরে ভারতের জলন্ত সমস্যা
পিংকি ও অলৌকিকবাবা
অলৌকিক রহস্যজালে পিংকি
অলৌকিক রহস্য সন্ধানে পিংকি
অলৌকিক দৃষ্টি রহস্য
বিশ্ব ক্যুইজ

প্রবীর ঘোষ ও ওয়াহিদ রেজা সম্পাদিত
দুই বাংলার যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম

© PRABIR GHOSH 72/8 DEBINIBAS ROAD, KOLKATA700 074, INDIA.
All rights reserved throught the World Reproduction in any manner in whole or part, in Bengali or other languages, probihibited.

সূচীপত্র

কিছু কথা ১১

অধ্যায় ঃ এক

'ধর্ম' ঃ সংজ্ঞায় গোলমাল ... ... ১৩—২০

খোঁজ ১৩/ 'ধর্ম' ঃ সংজ্ঞায় গোলমাল ১৫/ আধ্যাত্মবাদ কতটা দর্শন ১৮

অধ্যায় ঃ দুই

উপাসনা-ধর্ম ঃ প্রাচীন মত ... ... ২১—৮৩

পেনসিল-খোকা ও ভগবান ২১/ উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি ২২/ উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে প্রাচীন ধর্মীয় মতবাদ' ২৪/ দৈব-প্রত্যাদেশ বা অপৌ(ষেয় প্রত্যাদেশ ২৪/ ঈ্বরে বি্বাস ঃ সহজাত প্রবৃত্তি ২৭/ সহজাত প্রবৃত্তি কাকে বলবো ২৮/ সহজাত প্রবৃত্তি ত্রে(াধ, আত্র(মণ প্রবৃত্তি, পাল্টা আত্র(মণ প্রবৃত্তি ২৯/ সহজাত প্রবৃত্তি—যৌন অভিলাষ ৩১/ ধর্মীয় আচরণ-বাদে ঈ্বরের বি্বাস ৩৩/ নাস্তিক্য মতবাদ ৩৪/ সাংখ্য ৩৫/ মীমাংসা ৩৬/ স্বভাববাদ ৩৭/ বৌদ্ধ মতবাদ ৩৭/ বুদ্ধের মূল চার সিদ্ধান্ত ৪০/ ঈ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করা ৪০/ আত্মাকে নিত্য স্বীকার না করা ৪১/ কোনও গ্রন্থকে স্বতঃপ্রমাণ বলে স্বীকার না করা ৪৩/ জীবনপ্রবাহকে স্বীকার করা ৪৪/ অষ্টাঙ্গিক মার্গ ৪৫/ বৌদ্ধ সংঘ ৪৬/ ত্রিপিটক ৪৭/ বৌদ্ধধর্মে বিভাজন ৪৭/ নির্বাণ ৪৮/ বুদ্ধকে বিকৃত করার খেলায় শামিল অনেকেই ৫০/ গ্রিক, কুষাণ, শক রাজাদের সমর্থন কেন ৫৫/ বৈদিক সাহিত্য মতে নাস্তিক যারা ৫৮/ মাধ্যমিক ৫৯/ যোগাচার ৫৯/ সৌত্রান্তিক ৫৯/ বৈভাষিক ৬০/ চার্বাক ৬০/ 'ভূতবাদ' একটি বিপ-বাত্মক চিন্তা ৬৬/ দিগম্বর ৬৭/ পা্বনাথের চার নীতি বা চতুর্যাম

৬৮/ মহাবীর ৬৮/ পঞ্চব্রত ৬৯/ দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর-এর বিরোধীতা ৭০/ স্যাদ্‌বাদ বা আপেক্ষিক গুণবাদ ৭১/ মোক্ষ ৭১/ জৈন সংঘ ৭২/ অণু-পরমাণু বা 'পুদ্‌গল' ৭২/ জৈন ও বণিক সম্প্রদায় ৭২/ প্রাচীন ভারতে নাস্তিক্যবাদ-ই ছিল মূলস্রোত ৭৩/ আধুনিক নাস্তিক্যবাদ 'মার্কসবাদ' ৭৪/ নির্যাসে বস্তুবাদ, 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ' ৭৬/ 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ' সমাজবিদ্যার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ৭৬/ মার্কসবাদের সেই সময়, এই সময় ৭৮/ চিন ও মাওবাদ ৮১/ ভারতে মাও চিন্তার প্রভাব ৮২

অধ্যায় ঃ তিন

'সমকালীন যুক্তিবাদ' নাস্তিক্যবাদের সঙ্গে বাড়তি কিছু ... ৮৪—১৩৫

'সমকালীন যুক্তিবাদ' চির নতুন ৮৪/ যুক্তিবাদ ও যুক্তিবাদী সমিতি ৮৬/ যুক্তিবাদ দর্শনের সাত-সতেরো ৮৮/ ভারতের এক সময়ের মূল চিন্তাধারা কি শুকিয়ে যাচ্ছে ৯০/ কীসব বেয়াড়া প্রশ্ন ৯৭/ জ্ঞান আসে যুক্তির পথ ধরে ৯৯/ ইন্দ্রিয় যখন প্রতারিত ১০০/ বিভ্রম যখন মনের ১০২/ যুক্তির রূপ রস পাল্টে দেয় সময়, সমাজ ১০৫/ দুই চেতনার ভালো-খারাপ ১০৭/ খণ্ডিত ছেড়ে পূর্ণতায় ঃ ভালো-খারাপের মাপকাটি ১১০/ মারাদোনার পায়ের জাদু ও যুক্তিবাদ ১১৯/ প্রেমের রহস্যময়তা ও যুক্তিবাদ ১২১/ সমকালীন যুক্তিবাদ ১২৪/ 'ঈশ্বরে বিশ্বাস', 'বিজ্ঞানে বিশ্বাস' ঃ আকাশ-পাতাল ১২৫/ 'যুক্তিবাদ' পাবলিক খাচ্ছে ভালো ১২৭/ 'সমকালীন যুক্তিবাদ'-এর পালের হাওয়া কাড়তে অনেকেই ১২৮/ চার্বাক থেকে দেকার্তে এবং 'যুক্তিবাদ ১৩১/ 'তর্কবিদ্যা' ও 'যুক্তিবাদ' এক নয় ১৩৪/ পাশ্চাত্যের 'যুক্তিবাদ' ও 'নব্য-যুক্তিবাদ' ১৩৪

অধ্যায় ঃ চার

উপাসনা-ধর্ম ঃ আধুনিক মত ... ... ১৩৬—১৪৭

ভগবানের জঙ্গলে এক পাগল ১৩৬/ উপাসনা-ধর্ম ঃ নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিতে ১৩৭/ টাইলরের 'সবেরই প্রাণ আছে তত্ত্ব' ১৩৮/ হার্বার্ট স্পেনসর-এর 'প্রেতপুজো তত্ত্ব' ১৩৯/ রবার্টসন স্মিথ-এর 'টোটেম তত্ত্ব' ১৪০/ দুর্খাইম-এর 'টোটেম তত্ত্ব' ১৪১/ যাযাবর জীবন ও টোটেম প্রথা ১৪২/ হিন্দু উপাসনা-ধর্মে টোটেমের প্রভাব ১৪২/ প্রাক-সর্বপ্রাণ তত্ত্ব ও জাদু ১৪৩/ আমরা কী পেলাম ১৪৫/ 'ধর্ম-দর্শন' ও 'হাঁসজারু' ১৪৭

অধ্যায় ঃ পাঁচ

ভারতবর্ষের জাদু সংস্কৃতি ... ... ১৪৮—১৫৯

হে অন্ধ, রাত্রি নেমেছে ১৪৮/ ভারত জুড়ে জাদু বিশ্বাসের নিদর্শন ১৫০/ হরপ্পা সভ্যতা ও জাদু বিশ্বাস ১৫২/ আদিম উপজাতি, আধুনিক উপজাতি ঃ ১৫৬/ ধর্মীয় জাদু বিশ্বাস ও ম্যাজিক শো দুই পৃথিবী ১৫৭

অধ্যায় ঃ ছয়

তন্ত্রের প্রথম ধাপ যোগ এবং ... ... ১৬০—১৮৭

একই অঙ্গে এত রূপ ১৬০/ বৈদিক-ধর্মের গোড়ার কথা ১৬৫/ ঋক্‌বেদের দেবতারা ১৬৮/ যৌন-উশৃঙ্খলার পথ ধরে তন্ত্র ১৭৫/ সাংখ্য ও দেহতত্ত্ব ১৭৭/ যোগদর্শন ১৭৯/ শুক্র বা বীর্য সম্পর্কে যোগ ১৮১/ যোগ ও কুলকুণ্ডলিনী ১৮২/ যোগের চার বিভাগ ১৮৬/ লয়যোগ ১৮৬/ রাজযোগ ১৮৬/ হটযোগ ১৮৭/ মন্ত্রযোগ ১৮৭

অধ্যায় ঃ সাত

বৈদিক সাহিত্য, জাদু-বিশ্বাস, যজ্ঞে যৌনাচার ... ... ১৮৮—২০৪

সত্য খোঁজে মুক্ত মন ১৮৮/ বৈদিক সাহিত্যের গল্পো ও দুই ডাক্তার ১৯০/ বেদ ১৯০/ সামবেদ ১৯০/ যজুর্বেদ ১৯১/ অথর্ববেদ ১৯১/ উপনিষদ ১৯২/ উপনিষদ-এর নিষ্ঠুরতা ১৯৪/ উপনিষদ-এর বিভাজন ১৯৪/ গীতা উচ্চবর্ণের স্বার্থগন্ধী ১৯৬/ পুরাণ ১৯৬/ জাদু বিশ্বাস ও যজ্ঞে যৌনাচার ১৯৯/ বৈদিক যজ্ঞ ও যৌনাচার ২০২

অধ্যায় ঃ আট

হিন্দু উপাসনা-ধর্মে তন্ত্র ... ... ২০৫—২২০

সত্য সেলুকাস ২০৫/ হিন্দু উপাসনা-ধর্মের পঞ্চোসাধনা ও তন্ত্র ২০৬/ বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দুতন্ত্রের খিচুড়ি ২০৭/ বৈষ্ণবধর্ম ও তন্ত্র ২১০/ আড়বার ২১১/ নিম্বার্ক ও বল্লবপন্থী ২১১/ শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণবধর্ম ২১২/ শৈবধর্ম ও তন্ত্র ২১৩/ পাশুপত ২১৩/ নায়নার ২১৪/ শৈব সিদ্ধান্ত ২১৪/ আগমান্ত ২১৫/ বীরশৈব ও লিঙ্গায়েৎ ২১৫/ বৈদিক সাহিত্যে শিব ২১৬/ নাঙ্গা সন্ন্যাসী ও শৈবধর্ম ২১৭/ সৌরধর্ম ও তন্ত্র ২১৭/ গায়ত্রী মন্ত্রের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক ২১৮/ গাণপত্য ও তন্ত্র ২১৮

অধ্যায় ঃ নয়

শাত্ত(ধর্মে তন্ত্র ... ... ২২১—২৫২

কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে ২২১/ তন্ত্র সাধনা শ্রেষ্ঠ সাধনা ২২৬/ তন্ত্র গু(মুখী শাস্ত্র ২২৬/ দী(ামাস নির্ণয় ২২৭/ আগম, নিগম ও যামল ২২৭/ শত্তি(তান্ত্রিক সম্প্রদায় ২২৮/ বঙ্গীয় ঘরানা ২২৯/ তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য রচনা ২২৯/ কাশ্মিরীয় ঘরানা ২২৯/ দ(ীণীয় ঘরানা ২২৯/ দশমহাবিদ্যা ২৩০/ বঙ্গে মাটির কালী প্রতিমার আবির্ভাব ২৩০/ নারীকে শত্তি(জ্ঞানে পুজো-বিধি ২৩১/ নারী-শত্তি(বিষয়ে তন্ত্রের বাণী ২৩২/ তন্ত্র সাধনার সাত অচার ২৩২/ পঞ্চমকার সাধনা ২৩৩/ কুমারী পুজো ও রজঃ ২৩৪/ তন্ত্রে বলি ও ফললাভ ২৩৫/ তন্ত্রে বীজমন্ত্র ২৩৭/ 'বিন্দু-সাধন' ও মস্তিষ্কে বীর্য প্রেরণ ২৩৭/ 'যন্ত্র' বা 'যন্ত্রম' ২৩৮/ জপের মালা ২৪৪/ জপমন্ত্র ও আসন ২৪৫/ যোগিনী ২৪৫/ যোগিনীকে ভার্যা করার মন্ত্র-তন্ত্র ২৪৬/ বশীকরণ ২৪৭/ মারণ-উচ্চাটন ২৫০/ গভীরে নামছি পিছল সিঁড়ি বেয়ে ২৫০/

অধ্যায় ঃ দশ

ইসলাম ধর্ম ও নবি মোহাম্মদ ... ... ২৫৩—২৬৫

ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য ২৫৬/ ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি ২৫৬/ নবি মোহাম্মদের জীবনে নারী ২৫৭/ ইসলাম ধর্মে গুনাহ ২৫৮/ ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ২৫৮/ ইসলামে যাকাত ২৬২/ সুফি মতবাদ ও উদারতা ২৬২

অধ্যায় ঃ এগারো

রেইকি গ্রাণ্ডমাস্টার, ফেং শুই (মতার দাবিদার, জ্যোতিষী ও অলৌকিক (মতার দাবিদারদের প্রতি ... ২৬৬—২৬৮

২৫ ল(টাকার চ্যালেঞ্জ ২৬৬

কিছু কথা

ঈশ্বরপুজো নিয়ে, উপাসনা-ধর্ম নিয়ে, ভারতের সাধক-সাধিকাদের জীবনী (?) ও নীতি-উপদেশ নিয়ে বাংলা ভাষায় বইয়ের অভাব নেই। আজও, একবিংশ-শতাব্দীতে পা দিয়েও আমরা 'সাধক-সাধিকা' বলতে, সাহিত্য-সংগীত-বিজ্ঞান বা ক্রীড়া সাধনার মত বাস্তব সাধনার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের বুঝি না। যা নেই, তার সাধনায় মত্ত অথবা মত্তের ভানকারীদের বুঝি। তাঁদের নামে ভক্তি গদগদ হই। আমরা রামকৃষ্ণ, লোকনাথের ছবির সামনে ধূপ জ্বালি, পুজো করি। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের ছবির সামনে ধূপ জ্বালি না, পুজো করি না। এই আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের সংস্কৃতির মূল ধারা।

আমরা ক'জন জানি—প্রাচীন ভারতীয় দর্শন মূলত নিরীশ্বরবাদী দর্শন। কথাটা অনেকের কাছে নতুন শোনালেও এ'টাই একশো ভাগ সত্যি। আমরা সত্যিটা ভুলতে বসেছি মিথ্যের লাগাতার প্রচারে। আমাদের কাছে সত্য ধরা পড়ে না জিজ্ঞাসু মনের অভাবে, 'সবজান্তা' ভণ্ডামির কারণে। আমরা 'ইগো'য় ঠাসা কুয়োর ব্যাঙ হয়ে বাঁচতে ভালোবাসি।

এখনও আমাদের বাংলা ভাষা অনেক ভাষার তুলনায় কম সমৃদ্ধ। এখনও আমরা 'ধর্ম' বলতে প্রধানত উপাসনা-ধর্মকেই বুঝি। 'Property' (বৈশিষ্ট্য বা গুণ) এবং 'Religion' (ঈশ্বর নির্ভর উপাসনা-ধর্ম বা উপাসনা-ধর্ম)-এর মত দুটি স্পষ্ট বিভাজন সমৃদ্ধ ভাষাগুলোতে উপস্থিত। কিন্তু বাংলা ভাষায় অনুপস্থিত। ফলে 'ধর্মের বই' বলতে আমরা উপাসনা-ধর্মের বইকেই বুঝি। উপাসনা-ধর্ম নিয়ে যে'সব বই-পত্তর বাজারে চলছে, তার প্রায় সবই উপাসনা-ধর্মগুরুদের লেখা। এইসব বই তন্ত্র, যোগ, পূজা-পদ্ধতি, উপদেশময়। মারণ-উচ্চাটন, বশীকরণের মত বিষয় নিয়েও পুরানো পুঁথি-পত্তর নতুন করে ছাপছেন কোনও কোনও প্রকাশক। 'ধর্মগ্রন্থ'-এর ক্রেতারা সাধারণভাবে ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষ। এইসব 'ধর্মগ্রন্থ'গুলোর আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে; যত গুরু, তত মত। প্রাচীন মুনি ঋষিদের বেলায়ও বিভিন্ন দেব-দেবীর জন্ম বৃত্তান্ত থেকে কর্ম-কাণ্ড নিয়ে মতপার্থক্যের শেষ ছিল না। তাই থেকে 'নানা মুনির নানা মত' প্রবাদের উৎপত্তি।

উপাসনা-ধর্মকে সমাজ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে কিছু বাংলা বই লেখা হয়েছে। বইগুলোতে কিছু প্রসঙ্গ এসেছে কিছু প্রসঙ্গ আসেনি। সব প্রসঙ্গ নিয়ে গভীরভাবে জানা ও তাকে সহজ বাংলায় তুলে ধরা এক জন্মের কাজ নয়, একজন মানুষের কাজ নয়। কিছু গবেষক নতুন নতুন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করে কাজটাকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারেন। রামায়ণ, মহাভারতের মতো মহাকাব্য থেকে বেদ—সবই সৃষ্টি হয়েছে বহু মানুষের কয়েক'শো বছরের পরিশ্রমের ফল হিসেবে।

ইতিহাসধর্মী ও দর্শনধর্মী বইয়ের ভীড়ে এমন বইয়ের সংখ্যাই আবার বেশি, যে'গুলোয় গভীর গবেষণার ছিটে-ফোঁটা নেই। আকাডেমিক প্রয়োজন মেটাবার কোনও দায় নেই। বিশ্লেষণের চেষ্টা নেই। আছে সত্য-বিকৃতির ধারাবাহিক অনুকরণ।

দর্শন, সমাজ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন কিছু দিকে আলোকপাত করতেই বইটি লেখায় হাত দিয়েছি। আদিম যুগে এক সময় মানুষের মধ্যে ঈশ্বর-বিশ্বাস, উপাসনা-ধর্মে বিশ্বাস ছিল না। এইসব বিশ্বাস এক একটি অঞ্চলে, নানা সময়ে, বিভিন্নভাবে সূচিত হয়েছে। বৈচিত্রময় ও অসম-বিকাশের পৃথিবীতে নানা উপাসনা-ধর্মের বিবর্তনের ইতিহাসও বৈচিত্র্যভরা। নানা উপাসনা-ধর্মের এই বিবর্তন বা বিকাশ ধারা এবং ভারতবর্ষে প্রাক-বৈদিক যুগ থেকে নানা ধর্মের বিকাশ ও হিন্দু-ধর্মের পাঁচটি তন্ত্র ধারা নিয়ে এই বইটিতে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছি। আলোচনায় বৈদিক সাহিত্যে চিহ্নিত 'আস্তিক্যবাদ' ও 'নাস্তিক্যবাদ' যেমন এসেছে, তেমন-ই এসেছে তন্ত্র, তন্ত্রের শাখা-প্রশাখা। বিভিন্ন তন্ত্র পদ্ধতির পাশাপাশি স্বভাবতই এসেছে 'বশীকরণ', 'মারণ-উচ্চাটন' ইত্যাদির মত রহস্যময় নানা প্রসঙ্গ ও তার বিশ্লেষণ। সচেষ্ট থেকেছি বইটির প্রামাণ্যতা বজায় রাখতে। আন্তরিক থেকেছি তন্ত্রের বিভিন্ন আকর গ্রন্থ থেকে তন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি ও তন্ত্র-তত্ত্বের রহস্য উন্মোচন করতে।

মাত্র দিন দু'য়েক আগের ঘটনা। এক বেসরকারি টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন এই বঙ্গের এক বিদূষী সাহিত্যিক। তিনি বললেন, আমি ধর্ম-টর্ম তেমন মানি না। তবে হিন্দু-আধ্যাত্মবাদ যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দর্শন, এটা মানি।

দর্শন কী? আধ্যাত্মবাদ কী? হিন্দু ধর্ম কী? এ'সবের অ আ ক খ না জেনেই কত সাবলিলভাবে কথাগুলো বলে গেলেন! প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক, অতএব ওজনদার 'বুদ্ধিজীবী', সুতরাং যে কোনও বিষয়ে বলার অধিকার আছে। না জানলেও আছে। যিনি সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন, তিনি হাত-টাত নেড়ে কথা বলছিলেন। সুন্দরী এবং ঝক্‌ঝকে কথা-বার্তা, ভালো অ্যাঙ্কার। নিম্নমেধার এই অ্যাঙ্কারের বাচনভঙ্গীর ঝলকানি যত, অজ্ঞতাও ততটাই প্রকট।

বাঙালী সাহিত্যিক-শিল্পী-অভিনেতা-খেলোয়াড় প্রত্যেককেই প্রচার মাধ্যমগুলো 'বুদ্ধিজীবী' ছাপ মেরে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কর্মক্ষেত্রের বাইরের যে কোনও বিষয়ে যা খুশি মতামত প্রকাশের অধিকার জন্মেছে। দুঃখের কথা—এটাই পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙালি 'বুদ্ধিজীবী'দের মূল রোগ। এই বঙ্গে এমন বুদ্ধিজীবীরাই সংখ্যায় বেশি।

'প্রাজ্ঞ' সাজা যায় না। 'প্রজ্ঞা' গড়ে তোলার ব্যাপার। জিজ্ঞাসা ও গতিময়তার পথে একটু একটু করে গড়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বড় শত্রু এইসব বুদ্ধিজীবীরা—যাঁরা ধর্মেও আছেন, প্রগতিতেও আছেন। এমন ভণ্ড বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক লড়াই জরুরি। 'বুদ্ধিজীবী'দের অধ্যাত্মবাদী গোলা-গোলা কথার বিরুদ্ধে কামানের গোলা দাগতে এই বইটি কাজে লাগলে আমি খুশি হবো। খু-উ-ব খুশি।

উষ্ণ অভিনন্দন প্রতিটি পাঠক-পাঠিকাকে। একটি অনুরোধ—উত্তর পেতে জবাবি খাম পাঠাবেন।

প্রবীর ঘোষ
৭২/৮ দেবীনিবাস রোড
কলকাতা ৭০০ ০৭৪

১ ডিসেম্বর, ২০০২

অধ্যায় : এক

'ধর্ম' : সংজ্ঞায় গোলমাল

খোঁজ

আমার শৈশব আর কৈশোর কেটেছে খড়্গপুরে। থাকতাম ট্রাফিক সেটেলমেন্টের রেল কোয়ার্টারে। পাঁচমিশেলি শহর। গোটা ভারতের একটা ছোট সংস্করণ বললে বোধহয় ঠিক হয়। সন্ধে হলে মা সামনের জাফরি ঘেরা বারান্দায় বসে গান গাইতেন, 'ভব সাগর....'। ঈশ্বর আরাধনা। আমি আর বোনেরা মা'র সঙ্গে গলা মেলাতাম। আমাদের কোয়ার্টারে একটা পুজোর ঘর ছিল। ওটা স্টোর রুমেরও কাজ করতো। বৃহস্পতিবার মা সুর করে লক্ষ্মীর ব্রত পড়তেন। পুজো শেষে বাতাসা বা গুঁজিয়া পেতাম।

পামেলা ছিলেন প্রতিবেশী। বয়সে আমার চেয়ে সামান্য বড়। সুঠাম চেহারা। গায়ের রঙ কালো হলেও চক্চকে। মুখে সব সময় লেগে থাকতো হাসি। কেরালিয়ান খ্রিস্টান। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়তেন। স্কুল বাসে পড়তে যেতেন। বড়দিনের অনেক আগে থেকেই ঘর সাজাবার ধুম পড়ে যেত। বড়দিনে আমরা পাড়ার অনেকেই ওদের কোয়ার্টারে সারারাত ধরে হইহই করতাম। গ্রামোফোনের ইংরেজি গানের সঙ্গে ছেলে-মেয়েরা, বড়রা সবাই নাচতাম, খেতাম। এক বড়দিনে পামেলাদি আমাকে প্রথম মদ খাইয়েছিলেন।

আমাদের আর এক প্রতিবেশী ছিলেন প্রণয় বড়ুয়া। আমি যখন ফাইভে বড়ুয়াদা তখন নাইনে। দারুণ ফুটবল খেলতেন। আমাদের স্কুলের ছাত্রদের তিন হিরো ছিলেন বড়ুয়া-পুলক-ছোট্কা। তিনজনেই ফুটবল হিরো। পরে একসঙ্গে বি এন আর ফুটবল টিমে দাপিয়ে খেলেছেন ওঁরা। বড়ুয়াদা টিপটপ বাবু। টকটকে গায়ের রঙ। আমার সেরা হিরো। ওঁর কোয়ার্টারের ঠাকুর ঘরে হাতখানেক লম্বা একটা পিতলের বুদ্ধমূর্তি ছিল। সন্ধের সময় অনেকগুলো মোম জ্বলতো বুদ্ধমূর্তির সামনে। ওই ঘরে গেলে মনে হতো, বড় বেশি থমথমে পরিবেশ। নীলতারার মূর্তি ও-বাড়িতেই প্রথম দেখি।

বৌদ্ধরা নাকি তান্ত্রিক? তুক্-তাক করতে জানে। পাড়ার লোকেরা ওঁদের কোয়ার্টারে ঢুকতে ভয় পেতো।

বিপ্লব গাঙ্গুলি আমার সহপাঠী আর খেলার সঙ্গী ছিল। আমাদের লাগোয়া ওদের কোয়ার্টার। সেদিন আমাদের বাড়ি ইলিশ এসেছে। ইলিশ-ভাপা আর ইলিশের ঝোলের গন্ধে ঘর ম-ম। খড়্গপুরে ইলিশ তেমন মেলে না। এই রুপোলি ইলিশ এসেছে কোলাঘাট থেকে। ঘণ্টা কয়েক আগে ধরা। সন্ধেয় বিপ্লব এসে ইলিশের গন্ধ পেয়ে বায়না ধরলো মাছ ভাত খেয়ে যাবে। আমার মা-বাবা ভীষণ রকমের অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলেন। বামুনের ছেলেকে ভাত খাওয়ানোটা কতটা গর্হিত কাজ হবে ভেবে পীড়িত হচ্ছিলেন। বিপ্লবের জ্যাঠা পুরোহিতগিরি করতেন। তাই সেদিন আমাদের বাড়ি বিপ্লবের ভাত-মাছ খাওয়া হয়নি। আমরা হিন্দু, বিপ্লবও হিন্দু। তারপরও একজনের রান্না আর একজন খেতে পারবে না। হিন্দু ভগবানের এই বিধান সেদিন একটুও ভাল লাগেনি আমার।

মুমতাজ আমাদের প্রতিবেশী। আমার বন্ধু। উর্দুভাষী মুসলমান। ওর বাবা মেল গাড়ির গার্ড। মুমতাজ আর ওর মা-বাবা ভাঙা বাংলা বলতে পারতেন। কোয়ার্টারে রেডিওগ্রাম ছিল, সোফা ছিল। ওদের বাড়িতে গেলে গান শুনতাম বেশি, আড্ডা হতো কম। গজল, খেয়াল শোনার কানেখড়ি ওখানেই। মুমতাজ সকালে পামেলাদির স্কুল বাসে স্কুল যেত। ওকে দেখলে মনে হতো নায়িকা নুতন-এর কিশোরী বেলা। ওদের কোয়ার্টারেই প্রথম গরুর মাংস খেলাম। মুমতাজের মা আমাকে বার কয়েক শিখিয়ে-পড়িয়ে দিলেন, "কাউকে বোলো না গরুর মাংস খেয়েছো। আর আমরা খাইয়েছি, এটাও বোলো না।"

সেদিনই মাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম, হিন্দুরা গরুর মাংস খেলে জাত যায়।

—"জাত যায় মানে?"

—"মানে তুই আর হিন্দু থাকবি না।"

আমি হিন্দু হলাম-ই বা কবে? হিন্দুত্ব চলে যাওয়ার পর আমি এখন কোন ধর্মের মানুষ? তবে কী আর প্রতি সন্ধ্যায় মা-বোনেদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দেবতার উদ্দেশে উপাসনা গান করা চলবে না?

আমাদের পাড়াতেই একটি পরিবার থাকতেন। তাঁরা সন্ধে বেলায় সমবেত উপাসনা গান গাইতেন। একটু বেশির পরিশীলিত গান। রবিবাবুর গান। ওঁদের সঙ্গে তেমন পরিচয় ছিল না। শুনেছিলাম, ওঁরা ব্রাহ্ম। গরু, শুয়োর সবই খান। আবার ভগবানের উপাসনা গান করেন। গরু, শুয়োর খেলে ওদের ভগবান রাগ করেন না, আমাদের ভগবান কেন ত্যাজ্যপুত্র করে দেন? গরুর মাংস খাওয়ার পরও আমি শরীরে মনে আমিই আছি, কিন্তু আমি নাকি আর হিন্দু নেই? আমি যদি গরু খাবার খবরটা কাউকে না বলি? আমি আমাদের ঠাকুরঘরে লক্ষ্মীকে ছুঁয়ে দিই? লক্ষ্মী কি মুসলমান হয়ে যাবেন? একদিন ছুঁয়েও দিলাম, তারপরও দেখি লক্ষ্মী দিব্বি

পুজো নিয়ে যাচ্ছেন্।

একদিন মুমতাজকে জিজ্ঞেস করলাম, "হ্যাঁরে আমি কি মুসলিম হয়ে গেছি?" মুমতাজ বলেছিল, "মুসলিম হওয়া অতো সোজা নয়। মসজিদে গিয়ে অনেক কিছু করতে হয়।"

এই সময় আমাকে একটা প্রশ্ন মাঝে মাঝে খোঁচা দিচ্ছিল—এখন আমার ধর্ম কী? আমার মা-বাবা হিন্দু বলে আমি হিন্দু হয়েই জন্মেছি। আমাকে হিন্দু দেবতারই পুজো করতে হবে? আমার ইচ্ছের কোন দাম নেই?

স্কুলের মাস্টারমশাই শুভেন্দু রায় একদিন খড়্গেশ্বর মন্দিরের বাগানে বসে আমার মাথার চুলগুলো নেড়ে দিয়ে বললেন, "ধুর বোকা, কোনও কিছু খেলে ধর্ম পাল্টে যায় না। আই মিন 'প্রপার্টি' বা গুণ পাল্টে যায় না। ধর্ম বলতে যদি 'রিলিজিয়নের' কথা বলো, তবে বলবো রিলিজিয়ান নিজেই তো হাজার হাজার বছর ধরে পাল্টাতে পাল্টাতে আসছে। ধর্মগুলো মানুষেরই তৈরি, তাই ধর্মে ধর্মে এত নিয়ম কানুনের পার্থক্য। গোমাংস খাওয়া অধর্ম হলে সব ধর্মবিশ্বাসীদের কাছেই অধর্ম হওয়া উচিত ছিল। বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলিম ইত্যাদি ধর্মগুলো এসেছে দেড় থেকে আড়াই হাজার বছর আগে। তার আগে রিলিজিয়ান চিন্তা কোথায় ছিল? আদিম মানুষদের কোনও রিলিজিয়নই ছিল না, কোনও ঈশ্বর বিশ্বাসও ছিল না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে—এমনটা ভাবার মত চিন্তার উন্নতি এক সময়ের আদিম মানুষদের মধ্যে ছিল না। রিলিজিয়নের ধারণা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখনও সেই চাপিয়ে দেওয়া চিন্তার থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারিনি আমরা। তাই গোরুর মাংস খেলে তোমার জাত যায়, শুয়োরের মাংস খেলে মুমতাজের। ওইসব চিন্তার জঞ্জাল মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো।"

ঝেড়েই ফেললাম। আর তাইতো চেপে বসলো উপাসনা ধর্মের উৎপত্তি খোঁজার ইচ্ছে।

'ধর্ম' : সংজ্ঞায় গোলমাল

বাংলা ভাষায় 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ আদৌ প্রাঞ্জল নয়। বরং সত্যি বলতে কী, বেশ তালগোল পাকানো। অভিধানে শব্দার্থ খুঁজতে গেলে দেখবেন 'ধর্ম' শব্দটি নানারকম অর্থ বহন করে। 'ধর্ম' অর্থে গুণ, বৈশিষ্ট্য, স্বভাব। উদাহরণও মিলবে। যেমন আগুনের ধর্ম দহন, তরোয়ালের ধর্ম তীক্ষ্ণতা। আবার 'ধর্ম' মানে—সাম্প্রদায়িক ঈশ্বর উপাসনা রীতিনীতি, ঈশ্বর ও পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস। উদাহরণ রয়েছে। যেমন—হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ইত্যাদি ঈশ্বর উপাসনা পদ্ধতি ও পরকাল বিষয়ে বিশ্বাসের ওপর গড়ে ওঠা সম্প্রদায়।

তাহলে মানুষের ধর্ম কী? আমরা কি মানুষের গুণ বা বৈশিষ্ট্য হিসেবে 'মানবতা' বলব? নাকি ঈশ্বর উপাসনা নির্ভর বিভাজন মেনে হিন্দু, মুসলিম ইত্যাদিকে মানুষের ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করব? যেসব মানুষ আত্মা-পরমাত্মা-পরলোক ইত্যাদির অস্তিত্বে

বিশ্বাস করেন না, সে'সব মানুষের বিলকুল 'ধর্ম'ই নেই বলাটা কি ঠিক হবে? প্রত্যেক বস্তু ও প্রাণীর যখন 'ধর্ম' রয়েছে, তখন মানুষের ধর্ম নেই—ভাবাটা কি ঠিক হবে?

বাংলা 'ধর্ম' শব্দটির প্রচলিত সংজ্ঞাটি ঈশ্বরে বিশ্বাসী; অধ্যাত্মবাদীদের সৃষ্টি। একসময় মানুষ তো বিশ্বাস করত সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। আজও কি আমরা সেই ভুল আঁকড়ে বসে আছি? ভুল শুধরে এগোনোটাই প্রগতির ধর্ম। আসুন না, 'ধর্ম' শব্দের প্রচলিত সংজ্ঞা নিয়ে একটু বিশ্লেষণ করা যাক।

কোনও কিছুর সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় সেই সমাজে সেই সময়কার মানুষের মধ্যে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার ওপর ভিত্তি করে।

আমরা পিছন ফিরে তাকালে দেখতে পাব, সংজ্ঞা ঠিক করে দিত সেই সময়কার চিন্তায় এগিয়ে থাকা মানুষরা। অন্যরা তা মেনে নিত।

সংজ্ঞা অপরিবর্তনীয় নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তা পাল্টেছে, সমাজ পাল্টেছে, সেইসঙ্গে পাল্টে গেছে অনেক কিছুর সংজ্ঞা।

'সৎ' ও 'সতী'র সংজ্ঞা পাল্টাতে দেখেছি আমরা। যুধিষ্ঠির 'সত্যবাদী', 'ধর্মরাজ' হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন। জানি না, ইন্দ্রপ্রস্থের বিপুল বৈভবের উৎসমুখ কোথায়? পঞ্চপাণ্ডব গোশালার গোধনদের পরিচর্যা করে বা জমিতে হাল চাষ করে এই সম্পদ আহরণ করেছিলেন, এমনটা আমরা কোনও কাহিনীতে পাইনি। তবে কি আর পাঁচজন রাজার মতই প্রজাদের শ্রমের উৎপাদনে থাবা বসিয়ে এই সম্পত্তি সৃষ্টি? তারপরও যুধিষ্ঠির সৎ? দ্রোণকে অস্ত্রত্যাগ করিয়ে হত্যা করতে ছলনার আশ্রয় নেওয়ার পরও তিনি সৎ? জতুগৃহে পাঁচ নিষাদ ও এক নিষাদীকে আশ্রয় দিয়ে, নিশ্চিন্ত ঘুমের কালে তাদের জীবন্ত দগ্ধ করার জন্য ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েও তিনি সৎ? দ্রৌপদীকে সম্পত্তি ধরে নিয়ে তাঁকে পণ রেখে জুয়া খেলার পরও তিনি সৎ? আজকের এগিয়ে থাকা সমাজের কাছে এগুলো উঠে আসা প্রশ্ন।

'সতী' কারা? এ বিষয়ে মনুর বিধান বলছে, "স্বামী দুঃশীল, পরনারীতে উপগত হয়, বিদ্যাদি গুণবর্জিত হলেও সতী স্ত্রীর কর্তব্য সেই স্বামীকে উপেক্ষা না করে দেবতার মত সেবা করা (মনুসংহিতা, ৫ম অধ্যায়, শ্লোক ১৫৪)।" এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে, মনুর বিধানই আমাদের সনাতন হিন্দুধর্মের বিধান। এবং যে স্ত্রী এই বিধান একটুও অমান্য করত সে 'অসতী' বলে সমাজে নিন্দিত হত।

'সতী'র মনু-সংজ্ঞা জানার পর আজকের সমাজের এগিয়ে থাকা মানুষদের মনে হতেই পারে, মেরুদণ্ডহীন, ব্যক্তিত্বশূন্য, ক্রীতদাসী মানসিকতা সম্পন্ন, অন্যায়কে

প্রশ্রয়দানকারী এক কলঙ্কিতা বিবাহিতাকে একসময় ‘সতী’ বলা হত। বউয়ের প্রতি একইভাবে ক্রীতদাস মানসিকতার পুরুষকে কেন ‘সৎ’ বলে সংজ্ঞায়িত করা হল না? কেন তাদের ‘স্ত্রৈণ’ বলে নিন্দা করা হয়?

‘ব্যভিচারিণী’ বলতে মনু ছয়টি ব্যাভিচার দোষের নারীকে চিহ্নিত করেছেন। দোষ ছ’টি হল—স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ, যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ানো, অসময়ে ঘুমনো, নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে দীর্ঘদিন থাকা, মদ্যপান, খারাপ পুরুষের সংসর্গ (মনুসংহিতা, অধ্যায় ৯, শ্লোক ১৩)।

অর্থাৎ যাঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে, যাঁরা সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সংগীতশিল্পী, চিত্রশিল্পী, নাটক বা চলচ্চিত্রের পরিচালিকা বা অভিনেত্রী অথবা টপ একজিকিউটিভ, জীবিকার স্বার্থে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ান, তাঁরা সনাতন হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা মত ‘ব্যভিচারিণী’। যাঁদের পেশাগত কারণে ঘুমোবার সময়টা রাতের চেয়ে দিনেই বেশি প্রশস্ত, অথবা যাঁরা পড়াশুনো বা গবেষণার কাজে বিদেশে আত্মীয়-পরিচিতের বাড়িতে থাকতে বাধ্য হন, সেই প্রত্যেকটি নারীই ‘ব্যভিচারিণী’, নিন্দনীয় চরিত্র। এই ব্যভিচারিণীর সংজ্ঞা কি বর্তমান সমাজজীবনের প্রেক্ষিতে মেনে নেওয়া যায়?

মদ্যপান দোষণীয় হলে তা নারী-পুরুষ নির্বিশেষেই দোষণীয় হওয়া উচিত। খারাপ পুরুষের সঙ্গ, নারী-পুরুষ দুয়ের বেলাতেই খারাপ বলে চিহ্নিত হওয়া উচিত। এ’খানে কিছু খট্‌কা রয়েছে। পুরুষ সঙ্গ বলতে মনু যদি দেহমিলন বোঝাতে চেয়ে থাকেন, তবে খারাপ বরটির সঙ্গে বউ কোন নীতিতে দেবতাজ্ঞানে মিলিত হবে?

ছেলেবেলায় পড়েছি, হর্ষবর্ধন বিশাল মাপের ‘দানবীর’ ছিলেন। চার বছর অন্তর কনৌজের ধর্মমেলায় যেতেন। সেখানে রাজকোষ উজাড় করে দান করতেন। শেষে পরিধানের পোশাকটি দান করে, বোনের দেওয়া বস্ত্র পরে প্রাসাদে ফিরতেন। চার বছরের মধ্যে আবার তাঁর শূন্য রাজকোষ ভরে উঠত কোন ম্যাজিকে? যাদের দারিদ্র্য ঘোচাতে দান করা, তাদের শুষেই কী আবার রাজকোষ পূর্ণ করার খেলা খেলতেন না ‘দানবীর’ সম্রাট?

আজকের এগিয়ে থাকা মানুষদের মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্ঘাতে ‘দানবীর’-এর সংজ্ঞা বিপন্ন বোধ করছে।

অনেকদিন আগে কে যেন প্রশ্ন তুলেছিলেন, “হুজুরের প্রতি প্রেমময় ভারতরত্নরা যদি ‘দেশপ্রেমিক’ হন, তাহলে ‘দেশদ্রোহী’ কারা?’ ‘শুদ্ধতাবাদী’রা রে-রে করে উঠেছিলেন।

চলচ্চিত্রে, সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বার-বার উঠে এসেছে নৈরাশ্যতাড়িত, বিকারগ্রস্ত, যৌন-উচ্ছৃঙ্খল, খুনি-মানসিকতার চরিত্র হিসেবে। শোষণযুক্ত রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংগ্রামে জান বাজি রাখা জনগোষ্ঠীকে যে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী'র সম্মান জানানো উচিত, সমাজবিজ্ঞান-ই আমাদের তা শিখিয়েছে।

'ধর্ম' শব্দের যে সংজ্ঞা অধ্যাত্মবাদী দর্শন ঠিক করে দিয়েছিল, সেই সংজ্ঞা কি এখনও আমাদের মেনে নেওয়া উচিত? প্রশ্নটা উঠেছে এখানেই যে, অধ্যাত্মবাদ কি আদৌ দর্শন? দর্শন না হলে অধ্যাত্মবাদী দর্শনের চোখে আমরা 'ধর্ম'কে সংজ্ঞায় বাঁধব কীভাবে?

অধ্যাত্মবাদ কতটা দর্শন

'দর্শন' হল জীবন ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখার পদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গি। 'অধ্যাত্মবাদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 'আত্মা সম্বন্ধীয় মতবাদ'। অধ্যাত্মবাদ স্বতঃপ্রমাণ হিসেবে ধরে নেয়—"আত্মা জন্মহীন, নিত্য, অক্ষয়, অনাদি। শরীর হত হলেও আত্মা হত হয় না।"

আত্মা সম্বন্ধে এ'কথা হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গীতায় বলা হয়েছে। আত্মার ধর্ম আমরা গীতায় পেলাম। আত্মা সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে—আত্মাকে শাণিত অস্ত্র দ্বারা খণ্ডন করা যায় না, আগুনে দগ্ধ করা যায় না ইত্যাদি। এই হল আত্মার ধর্ম; হিন্দুধর্মের আত্মা। মৃত্যুর পর 'পরলোক' চিন্তা, আত্মা সংক্রান্ত চিন্তা—এও অধ্যাত্মবাদেরই চিন্তা। পরলোকে গত জন্মের পাপ-পুণ্যের হিসাব করে স্বর্গের সুখ বা নরকের যন্ত্রণা ভোগের কথা—আত্মা সংক্রান্ত মতবাদেরই কথা।

নরকে আত্মাকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কাটা, গরম তেলে দগ্ধ করার কথা আছে। আর একদিকে বলা হচ্ছে আত্মাকে কাটা যায় না, দগ্ধ করা যায় না। এ'সবই তো অধ্যাত্মবাদের স্ববিরোধিতা। এমন স্ববিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবন ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে কীভাবে দেখা যাবে? বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতি না হলে 'দর্শন' বলি কী করে?

'আত্মা' ও 'মন' যে এক ও অভিন্ন—এ বিষয়ে বহু ধর্মীয়বেত্তাই সহমত। বহু থেকে এক-আধটি নমুনা পেশ করছি।

আচার্য শংকর তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলেছেন, "মন হল আত্মার উপাধিস্বরূপ।"

সাংখ্য দর্শন মতে—আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। (সাংখ্যসূত্র ৫/৬৯) ও (সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য ২/৪২/৪৭)

শ্রীভাষ্যকার রামানুজের মতে "আত্মা চৈতন্যস্বরূপ।" (যতীন্দ্রমতদীপিকা, পৃষ্ঠা

৯৮ আনন্দ আশ্রম সংকলন)

জৈন দর্শনে বলা হয়েছে, "চৈতন্যই জীবের লক্ষণ বা আত্মার ধর্ম।" (যড়দর্শনসমুচ্চয়, পৃষ্ঠা ৫০ চৌখাম্বা সং)

স্বামী বিবেকানন্দের মতে— চৈতন্য বা চেতনাই আত্মা। (বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র, অখণ্ড সংকলন, প্রকাশক: নবপত্র, পৃষ্ঠা ১৬২)

স্বামী অভেদানন্দের মতে, "আত্মা বা মন মস্তিষ্কের বহির্ভূত পদার্থ; মস্তিষ্কজাত নয়।" (মরণের পরে, পৃষ্ঠা ৯৮)

এই কয়েকটি উদাহরণ থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, এইসব আধ্যাত্মবাদী দার্শনিকরা 'আত্মা ও মন' এক ও অভিন্ন মনে করতেন এবং আত্মা বা মন 'নিত্য', 'অক্ষয়', 'অমর'—বিশ্বাস করতেন।

স্কুলের পাঠ শেষ করা প্রতিটি ছেলেমেয়ে শরীর বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠেই জেনে গেছে যে—'মন' হল মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের কাজকর্মের ফল। বুঝে গেছে যে, মৃত্যুর পর দেহ বিলীন হয়। বিলীন হয় দেহাংশ, মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ। মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ নেই, কিন্তু তার কাজকর্ম আছে, কাজকর্মের ফল হিসেবে মনও আছে, অর্থাৎ আত্মা আছে—এমনটা শুধু বোকা কল্পনাকেই সম্ভব।

এই আলোচনা শেষে আমরা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি, চিন্তা চেতনা, মন-ই যদি আত্মা হয়, তবে সেই আত্মা কখনই অমর হতে পারে না। আত্মার অমরত্ব তত্ত্বের উপরই দাঁড়িয়ে আছে পরমাত্মার কল্পনা।

আত্মা-পরমাত্মার মিথ্যে তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল অধ্যাত্মবাদ শেষ পর্যন্ত কোনওভাবেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুকে দেখার, বিশ্লেষণ করার, বোঝার পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে না। এরপরও আত্মা-পরমাত্মার বিশ্বাস-নির্ভর অধ্যাত্মবাদকে 'দর্শন' বলে চিহ্নিত করলে তা হবে ভুল।

এই ভুল দর্শন মানুষের 'ধর্ম'কে গুণ বা বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক শক্তির উপর বিশ্বাসের নানা প্রথা ও আচার পদ্ধতি বলে প্রচার করে আসছে। বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের উপাসনা পদ্ধতি, এই সংক্রান্ত রীতিনীতি, পরমাত্মা, ইহকাল, পরকাল বিষয়ক মত 'ধর্ম' বলে প্রচারিত হয়ে আসছে।

'ধর্ম' আমাদের কাছে যথেষ্ট তালগোল পাকানো ব্যাপার। এরজন্য হয়তো কিছুটা দায় আমাদের ভাষার দীনতা। ইংরেজি ভাষায় কিন্তু একটা স্পষ্ট সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়েছে property ও religion-এর মধ্যে। Property-র অর্থ SAMSAD ENGLISH-BENGALI DICTIONARY-তে বলা হয়েছে characteristic বৈশিষ্ট্য;

any quality গুণ বা ধর্ম। Religion শব্দের অর্থ হিসেবে লেখা আছে belief in a higher unseen controlling power, esp. in a personal God, অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক শক্তির বিশেষত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস; any system of faith and worship অর্থাৎ যে কোনও উপাসনা রীতির প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। ইংরেজি property ও religion শব্দের মধ্যে একটা স্পষ্ট বিভাজন রয়েছে। SAMSAD এর অভিধানে তাই property, natural quality of behaviour or function-এর অর্থ বোঝাতে লেখা আছে মানবধর্ম, কালধর্ম, আগুনের ধর্ম। আমাদের ধর্ম শব্দে এই ধরনের বিভাজন নেই। তাই গোল বাঁধার সম্ভাবনাও বেশি।

আসুন না আমরাও স্পষ্ট একটা সীমারেখা তৈরি করি। মানুষের ধর্ম' বলতে আমরা মানুষের 'বৈশিষ্ট্য' বা 'গুণ'কেই চিহ্নিত করি। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়কে তাদের ঈশ্বর বিশ্বাস ও উপাসনার রীতিনীতির নির্ভরতাকে 'উপাসনা-ধর্ম' বলে পরিচিত করতে শুরু করি। আমরাই পারি ধর্মের পুরনো সংজ্ঞাকে বাতিল করতে। আমরাই পারি নতুন শব্দ সৃষ্টি করতে।

অধ্যায় : দুই

উপাসনা-ধর্ম : প্রাচীন মত

পেনসিল-খোকা ও ভগবান

কিশোর বয়সে শেষ দেখা দিদিমা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসেন। ছোট-খাট চেহারা। টকটকে ফরসা গায়ের রঙ। সাদা কদম-ছাঁট এক মাথা ঘন চুল। বয়স হয়েছিল, কিন্তু চামড়া ছিল—মাছি বসলে পিছলে পড়ার মত। দুপুরে চোখে চশমা এঁটে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, কাপড়ে বাঁধাই সোনালী রঙে ছাপাই প্রচ্ছদের উপন্যাস পড়তেন। রাতে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা এ'সব পড়তেন। দিদিমার কাছে প্রথম শুনি—শ্রীকৃষ্ণের নিজের মুখে বলা কথাগুলোই গীতায় লেখা আছে।

আমার সহপাঠী মহম্মদ অফতাবুদ্দিনদের বাড়িতে ঘি-জবজবে হালুয়া খেতে খেতে ওর চাচার কাছ থেকে প্রথম শুনলাম, "অলৌকিক যে আছে, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল কোরান। কোরানে রয়েছে আল্লার বাণী।"

আমাদের স্কুলের লাহিড়ী স্যার ভূগোল আর বিজ্ঞান পড়াতেন। তিনি ঠাকুর পুজোয় বিশ্বাস করতেন না। জন্ম-সূত্রে ব্রাহ্মণ হলেও উপবীত ধারণ করতেন না। বলতেন, ধর্মীয় আচার-আচরণ পুরোহিতরা তাঁদের ইচ্ছে মতো, সুবিধে মতো তৈরি করেছেন। ভগবান এসব বিধান ওঁদের কাছে দিয়ে জাননি। যাঁরা দাবি করেন, ইহকাল আর পরকালের সুখ-শান্তির উপায় ভগবান স্বয়ং এসে তাঁদের কাছে বলে গেছেন, বুঝবে তাঁরা সকলেই মিথ্যেবাদি। উদ্দেশ্য, পরের মাথায় হাত বুলিয়ে খাওয়া। এ জন্যেই তো এক ধর্মের ভগবানের উপদেশের সঙ্গে আর এক ধর্মের ভগবানের উপদেশে জমিন আসমান ফারাক। সৃষ্টি থাকলে স্রষ্টা থাকবেই। এই স্রষ্টাই ভগবান। ভগবানের সঙ্গে ধর্মীয় আচরণের কোনও সম্পর্ক নেই।

বাবারে বাবা; এযে দেখি যত মানুষ তত মত! কোনটা ছেড়ে কোন্‌টা ধরি? বিভ্রান্ত পেনসিল-খোকার সামনে তখন এটাই বড় প্রশ্ন।

উপাসনা-ধর্মের (religion) উৎপত্তি

১ লক্ষ বছর আগেও পৃথিবীতে মানুষ ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই সময়টাকে বলছেন, আদি প্রত্নপ্রস্তর যুগ। ভূপালের কাছে ভীমভেটকা পাহাড়ে, প্রত্নবিজ্ঞানীরা ১৯৭১ থেকে টানা অনুসন্ধান চালিয়ে কিছু পাথরের হাতিয়ার পেয়েছেন। এ'গুলো কম-বেশি ১ লক্ষ বছরের পুরোন। ৪০ হাজার বছর আগে আঁকা গুহাচিত্রের বহু ছবি রয়েছে 'ফোর হানড্রেড সেঞ্চুরিজ অব কেভ আর্ট' বইতে। বইটির লেখক পৃথিবী বিখ্যাত গুহাচিত্র বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিক ল্য অ্যাবে আঁরি ব্রুইল। ৪০ হাজার থেকে ১ লক্ষ বছরের পুরনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে মনে হয়, আদিম মানুষের মধ্যে তখনও উপাসনা-ধর্মের প্রাথমিক বিকাশ শুরু হয়নি।

মিশর, মেসোপোটেমিয়া, ব্যাবিলন, গ্রিস, চিন, ইরান, ভারত ইত্যাদি দেশে ধর্মের শুরুর যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে, সে সব নিদর্শনগুলোর তৈরির কাল নির্ধারণ করা হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে পাশাপাশি অঙ্কনশৈলী, বর্ণবিন্যাসের পদ্ধতিও পরীক্ষা করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত পাওয়া নানা নিদর্শনের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, পৃথিবীতে উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি কম-বেশি হাজার দশেক বছরের প্রাচীন। এই উৎপত্তি কোনও এক বা একাধিক অঞ্চলে দেখা গিয়েছিল, পৃথিবী জুড়ে নয়।

পৃথিবীর উপাসনা-ধর্মের (religion) ইতিহাস নিয়ে এর আগে অনেক গবেষণা হয়েছে। কিন্তু গবেষণা শুরুর ইতিহাস মাত্র ১৩০ বছরের পুরনো। তখনকার পৃথিবী আজকের মত ছোট্ট হয়ে যাওয়া অবস্থায় ছিল না। গবেষকরা তাঁদের গবেষণা চালিয়ে ছিলেন এক বা কয়েকটা অঞ্চল বেছে নিয়ে। সেখানকার অধিবাসীদের ঈশ্বর বিশ্বাসের সম্ভাব্য উৎপত্তি ও উপাসনা-ধর্মের ক্রমবিকাশ নিয়ে তাঁদের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। আজ বিভিন্ন অঞ্চলের গবেষণা কর্ম থেকে আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পাচ্ছি, পরবর্তী ধাপের কাজগুলো করতে পাচ্ছি। প্রাথমিক গবেষকদের সে সুযোগ ছিল না। বিভিন্ন গবেষকদের তথ্যকে গেঁথে আমরা উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি ও তার ক্রমবিকাশের রূপরেখা তৈরি করতে পারছি। এই পূর্বসূরি গবেষকদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের নানা তথ্য ও তত্ত্বকে মিলিয়ে আমরা বেশ কিছু অনুমানে পৌঁছতে পারছি।

পূর্বসূরি গবেষকদের অনেকেই এমন মত প্রকাশ করেছেন যে, উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে তিনি যে মত প্রকাশ করেছেন, সেটা গোটা বিশ্বের জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, আঞ্চলিকতায় আবদ্ধ নয়।

কোনও উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি ও তার ক্রমবিকাশ তত্ত্ব বিশ্বজনীন হওয়ার পক্ষে একটি বড় সমস্যা বা বাধা রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসম বিকাশের সমস্যা ছিল এবং আছে। সুতরাং উপাসনা ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ পৃথিবী জুড়ে একই ধাঁচে হওয়া অসম্ভব।

আদিম মানুষের উপাসনা ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে আরও একটা বড় ধরনের সমস্যা রয়েছে। আদিম মানুষ থেকে আধুনিক মানুষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি ও তার ক্রমবিকাশের ইতিহাস তো কেউ লিখে যায়নি, সুতরাং গোটা বিষয়টাই অনুমান-নির্ভর। অনুমানকে যতটা সম্ভব ঠিক-ঠাক ভাবে পরিচালিত করলে আমরা আদিম মানুষের ইতিহাসের একটা রূপরেখা গড়ে তুলতে পারি। এজন্য বিজ্ঞানের কিছু বিভাগের সাহায্য নেওয়া একান্তই জরুরি। সেগুলো হল, নৃবিদ্যা বা নৃতত্ত্ববিদ্যা (Anthropoligy), পুরাতত্ত্ব (Archaecology), মনোবিজ্ঞান (Psychology), সমাজবিজ্ঞান (Sociology) এবং কিছুটা ভাষাতত্ত্ব (Philology or Linguistics)।

উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যে হঠাৎ করে প্রবেশ করেনি। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে একটু একটু করে গড়ে উঠেছে। উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি ও তার বিবর্তন নিয়ে গবেষণা বা গভীর চিন্তাভাবনার শুরু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, সে কথা আমরা আগেই বলেছি। তার আগে উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে যে সব ধারণা প্রচলিত ছিল, সে সব ধারণা এসেছিল বিভিন্ন উপাসনা-ধর্মীয় গোষ্ঠীর অন্ধ-বিশ্বাস থেকে। এইসব আবেগ-সর্বস্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের যুক্তিহীনতাকে মাথায় রেখেই বেশ কিছু বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় শাখাগুলোর সাহায্য নিয়ে নতুন ভাবে ধর্মের উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস খোঁজার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বিভিন্ন ধরনের ধর্ম-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক চেতনা সমান ভাবে এগোয়নি। যেমন ইউরোপ, আমেরিকায় খ্রিস্টান ধর্ম-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক চেতনা যতটা এগিয়েছে, আরব ভূখণ্ডের মুসলিম সাংস্কৃতিক চেতনা ততটা এগোয়নি। সাংস্কৃতিক চেতনা বলতে আমাদের বুঝতে হবে শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, নাটক, সিনেমা, খেলাধূলা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয়, এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান। সংস্কৃতি বলতে বোঝায় চলমান জীবনের ভালো-খারাপ প্রগতি, দুর্নীতি, অন্ধ-বিশ্বাস, যুক্তিমনস্কতা ইত্যাদি সব কিছু। আবার স্থান ভেদে একই ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষদের চেতনার বিকাশে আমরা অসমতা দেখতে পাই। ইউরো-আমেরিকানরা অর্থের জোরে পৃথিবী জুড়ে খ্রিস্টান ব্রাদার-হুডের পরিধি বাড়াতে চাইছে। পাদ্রিরা আজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তারা পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে ধর্মান্তরের বিনিময়ে শিক্ষা-চিকিৎসা-চাষ-হাতের কাজ শেখানো ইত্যাদি সেবা দিচ্ছে। বাড়ছে খ্রিস্টধর্মীয়দের সংখ্যা। কিন্তু তারপরেও ইউরো-আমেরিকান খ্রিস্টানদের সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের খ্রিস্টান বা নাইজিরিয়ার খ্রিস্টানদের সাংস্কৃতিক চেতনার কোনও তুলনাই হয় না। কারণ চেতনা নির্দেশিত হয় বহু শর্তের দ্বারা।

আমাদের দেশের দিয়ে তাকান। দেখতে পাবেন এ'দেশে হিন্দু ধর্মের বিকাশ সর্বত্র সমানভাবে হয়নি। রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার-সহ গো-বলয়ে হিন্দু ধর্মীয় আবেগ যতটা প্রবল, পশ্চিমবঙ্গসহ উত্তর-পূর্ব ভারতে ততটাই দুর্বল।

সাংস্কৃতিক চেতনা যে সব অঞ্চলে এগিয়েছে, সেখানেই ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো দুর্বল হয়েছে। যুক্তিবাদের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিহীন ধর্মীয় বিশ্বাসের অস্তিত্ব ভেঙে পড়ছে।

ধর্মীয় বিশ্বাসের অস্তিত্ব টিকে আছে উৎসবের প্রতীক হিসেবে। ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে।

আজ আধুনিক শিক্ষা ও মননের অধিকারী মানুষদের কাছে প্রাচীন উপাসনা-ধর্মগুলো গুরুত্বহীন, বোকাবোকা ব্যাপার মনে হতেই পারে, হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাঁরা ভারতীয় হলেও বিশ্বাস করে না, তন্ত্র-মন্ত্রে অসুখ সারে, ঈশ্বর কৃপায় মৃত প্রাণ পায়। তাঁরা অসুখ হলে ডাক্তার দেখান। ধর্ম আজ অগ্রণী চেতনার মানুষদের কাছে গুরুত্বহীন—এই সত্য স্বীকার করেও বলি, কেউ যদি বিভিন্ন উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি খুঁজতে গবেষণা করেন, সেটাকে আমরা গুরুত্বহীন মনে করি না। কারণ, এইসব উপাসনা ধর্মের ঐতিহাসিক মূল্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

আসুন, এবার আমরা উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে কিছু প্রধান ধর্মীয় মতবাদ নিয়ে আলোচনায় যাবো।

উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে প্রাচীন ধর্মীয় মতবাদ

এক ঃ দৈব-প্রত্যাদেশ বা অপৌরুষেয় প্রত্যাদেশ (Theory of Revelation) ঃ

'অপৌরুষেয়' শব্দের অর্থে 'মানুষের দ্বারা নয়'। দৈব-প্রত্যাদেশ মতবাদে বিশ্বাসীরা মনে করতো, তাদের ঈশ্বর কোনও একজন মানুষকে যাবতীয় উপদেশ দিয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, এইসব উপদেশ প্রচারের। যেহেতু ঈশ্বরের দেওয়া উপদেশ, তাই ভক্তদের কাছে এসব উপদেশ ছিল অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত ও অভ্রান্ত। ঈশ্বরের উপদেশ শোনা ঈশ্বরের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ইহুদি, খ্রিস্টান, মুসলিম ইত্যাদি ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন। এই ধর্মপ্রবর্তক বা Prophet-রাই মানুষের উপাসনা-ধর্ম চেতনার জনক। আর উপাসনা-ধর্মের জনকদের মধ্যে এই চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে দৈব-প্রত্যাদেশ।

এই ধর্মীয় মতবাদকে গ্রহণ করতে কিছু বাস্তব অসুবিধে রয়েছে। দৈববাণী শোনা ধর্মপ্রবর্তকদের আবির্ভাবের আগে কি তবে কোনও ঈশ্বর চিন্তা মানুষের মধ্যে ছিল না? অবশ্যই ছিল। সে আলোচনায় আমরা পরে যাব। তার আগে দৈববাণী প্রসঙ্গে

আরও দু-একটি জরুরি প্রশ্ন উঠে আসে। যেমন—

ঈশ্বরই যদি ধর্মপ্রবর্তকদের দৈববাণীর মাধ্যমে তাঁর উপদেশ প্রচারে উদ্যোগী হয়ে থাকেন, তবে পৃথিবীতে একটি মাত্র উপাসনা-ধর্ম বা religion থাকার কথা। কারণ ঈশ্বর-ই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং ঈশ্বর এক। তবে কেন এত উপাসনা-ধর্ম? তবে কেন ঈশ্বর ধারণায় এত পার্থক্য?

কেন হিন্দুদের ঈশ্বর সাকার, মুসলিমদের নিরাকার? একজন হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হলে কি সেই মানুষটির ঈশ্বর সাকার থেকে নিরাকার হয়ে যাবেন? কেন হিন্দু ধর্মের শুয়োর খাওয়া নিষিদ্ধ নয়, মুসলিম ধর্মে নিষিদ্ধ। মুসলিম ধর্মে 'রোজা' আবশ্যিক পূণ্য কর্ম হলে, হিন্দু ধর্মে রোজার বিধান নেই কেন? হিন্দু ধর্মের মানুষ মৃত্যুর পর আবার জন্ম নেবে, মুসলিম ধর্ম নিয়ে মারা গেলে কেন আবার জন্ম নেবার প্রশ্নই নেই! এমন হাজারো প্রশ্নে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেকার বিরোধ উঠে আসতে বাধ্য। আবার ভাবুন তো, আমি যদি হীনযানপন্থী বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী হই, তবে বুদ্ধদেবের উপদেশ মেনে আমাকে বিশ্বাস করতে হবে—ঈশ্বর নেই, ধর্মপ্রবর্তকদের প্রচারিত বাণী আদৌ ঈশ্বরের দেওয়া নয়। এত পার্থক্যের মধ্যে সমতা কোথায়? এত কিছুর পর কী করে মানি— দৈববাণী তত্ত্বকে?

এরপর আরও একটি জরুরি প্রশ্ন উঠে আসে। ঈশ্বর বা আল্লা এত নারী বিদ্বেষী, নিষ্ঠুর কেন? পৃথিবীর মানুষদের অর্ধেক পুরুষ, তো অর্ধেক নারী। ঈশ্বর বা আল্লা কেন পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন? কেন তিনি নিরপেক্ষ নেন? এরপর তাঁকে ন্যায়-বিচারক বলে মানি কেমন করে?

অপৌরুষেয়, বেদ ও মনুসংহিতা শুধু নারীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণে থেমে থাকেনি, মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। শ্রমজীবী শূদ্রদের প্রতি যে সব ভয়ংকর বিধান দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও চূড়ান্ত অমানবিক।

এরপর প্রশ্ন উঠে আসা স্বাভাবিক যে, এইসব অমানবিক উপদেশাবলী কি সত্যিই ঈশ্বরের মহান-বাণী হতে পারে? হতে পারে অমোঘ বাণী? ঈশ্বর কি তবে একজন স্বার্থপর, উগ্র-পুরুষতান্ত্রিক, উচ্চবর্ণের নিষ্ঠুর পুরুষ? নাকি এসবই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া উচ্চবর্ণের স্বার্থপর কিছু মানুষের বিধান? প্রশ্নাতীত আনুগত্যে দৈববাণী তত্ত্ব মেনে না নিয়ে প্রশ্ন করুন। উত্তর মিলবেই।

একটা সময় চিন্তায় এগিয়ে থাকা কিছু মানুষ সমাজকে শৃঙ্খলায় আনতে কিছু কিছু আচরণ-বিধি ঈশ্বরের নামে সমাজের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বিভিন্ন উপাসনা-ধর্মে কিছু কিছু উপদেশ আছে, যাতে বলা হয়েছে ঈর্ষা, লোভ, চুরি, লুণ্ঠন,

খুন ইত্যাদি খারাপ। গরীবকে দয়া করার কথাও আছে। তারপরেও উপাসনা-ধর্মের পৃষ্ঠপোষক রাজা-রাজড়াদের হাতে লুণ্ঠন, খুন হতো ব্যাপক আকারে। লোভ আর ঈর্ষা থেকেই অন্য রাজ্য জয়ের আকাঙ্ক্ষা, অন্য দেশের সম্পদ ও মানুষ লুণ্ঠনের ঘটনাগুলো ঘটতো। এইসব রাজা-সম্রাটেরা ধর্মের বাণীকে কোনও দিনই একটুও তোয়াক্কা করেনি। ঋষি, ব্ল্যাক-ম্যাজিশিয়ান বা জাদুপরোহিত, পুরোহিত-পাদ্রি, যে নামেই এই ধর্মগুরুদের ডাকি না কেন, এই ধর্মগুরু শ্রেণীর সঙ্গে শাসক শ্রেণীর একটা সুসম্পর্ক, নির্ভরতা, 'দিবে ও নিবে' সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ফলে রাজার গুয়ে গন্ধ পেতেন না ধর্মগুরুরা। তারপরেও স্বীকর না করে উপায় নেই, ধর্ম প্রবর্তকদের ধর্মীয় বিধানে সমাজকে কিছুটা হলেও সুশৃঙ্খল করার একটা প্রয়াস যে যুগে ছিল। ধর্ম প্রবর্তকরা সেই সময়কার সমাজ-সাংস্কৃতিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি, ফলে পুরুষতান্ত্রিকতা ও জাত-পাতের বিভেদ সৃষ্টিকে সমাজের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

একটা সময়ে এইসব ধর্মীয় বিধানের কিছু ইতিবাচক ভূমিকা ছিল সমাজের উপর। এইসব ধর্মীয় বিধান-ই ছিল আইন, ছিল কিছু সুনীতিবোধ গড়ে তোলার ভিত্তি-ভূমি। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে আজ এইসব ধর্মীয় বিধান তার উপযোগিতা হারিয়েছে।

ধর্মীয় বিধানের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। ফুরিয়েছে ধর্মপ্রবর্তকদের ভূমিকা। সমাজে শৃঙ্খলা রাখতে এমন দৈববাণীর 'মহান মিথ্যে'র চেয়ে আইনের শাসন, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা নিতে সক্ষম।

এখানে 'আইনের শাসন' বলতে অবশ্যই আইন প্রণয়ন ও প্রনীত আইনের প্রয়োগ বোঝাতে চাইছি। ভারতীয় আইন অনুসারে বেশ্যালয় চালানোর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির কথা লেখা আছে। সহমরণে প্ররোচনা দেওয়া আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার শামিল হিসেবে গণ্য করে শাস্তি দানের কথা রয়েছে। পশু বলি শাস্তি যোগ্য অপরাধ। গ্রহরত্ন বা তাবিজ-কবজ দিয়ে রোগ সারানোর দাবি করলে এবং সেই দাবির কথা কেউ প্রচার করলে উভয়েরই কঠোর শাস্তির কথা আইনের বইতে আছে। কিন্তু এ'দেশে সে'সব আইনের বইতেই শুধু আছে, প্রয়োগ নেই। জনতার আবেগে আঘাত পেতে পারে ভেবে সব রাজনৈতিক দল-ই আইন প্রয়োগে ভয় পায়। ভয়টা ভোট হারাবার। তাই তো এই রাজ্যেও প্রতি বছর ডাইনি হত্যার নামে নরহত্যা হয়। যে'সব ওঝা, জানগুরু, গুনিন 'ডাইনি' বলে কোনও মানুষকে ঘোষণা করে, তারা জনগণের আবেগের ঝড়ে দিব্বি শাস্তি এড়িয়ে যায়। আইনের শক্ত হাতের প্রয়োগ প্রত্যেকটি বে-আইনি কাজকে বন্ধ করতে পারে। এইসব বে-আইনি কাজ চলার

পিছনে আরও অনেক উপাদান কাজ করে। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হল ব্যক্তিস্বার্থ ও দুর্নীতি।

ঈশ্বর-বিশ্বাস ও উপাসনা ধর্মের উপদেশ কখনই আইনের বিকল্প নয়। তাই তো ধর্মের দেশ ভারত দুর্নীতিতে পৃথিবীর প্রথম সারির দেশ।

এই অবস্থায় সমাজের সুনীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'মহান মিথ্যা' ঈশ্বরের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ঈশ্বরের উপযোগিতা আছে তাদের কাছে, যারা শোষিত মানুষদের মগজে ঢোকাতে চায়—তোমায় বঞ্চনার কারণ আমরা নই। বঞ্চনার জন্য দায়ী ঈশ্বরের কৃপা না পাওয়া, পূর্বজন্মের কর্মফল, নিয়তি ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঈশ্বর বিশ্বাস, উপাসনা-ধর্মে বিশ্বাস একসময় রাজশক্তির আনুকূল্য পেত, এখন রাষ্ট্র শক্তির আনুকূল্য পায়। 'ঈশ্বর' নামের পণ্যের উপযোগিতা উপলব্ধি করে পত্রিকায় ঢাউস ঢাউস বিজ্ঞাপন দেয় তান্ত্রিক-জ্যোতিষীরা। এরা ঈশ্বর ও উপাসনা-ধর্ম ভাঙিয়ে অনায়াসে পরের মাথায় হাত বুলিয়ে খাচ্ছে। ঈশ্বর আছে বলেই খাচ্ছে না থাকলে খাবে কী? মন্দির-মসজিদ-গীর্জা উপাসনা-ধর্ম ভাঙিয়েই ধনী। মানুষের অজ্ঞানতা ও বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েই তাদের মস্তানি।

দুই ঃ ঈশ্বরে বিশ্বাস; সহজাত প্রবৃত্তি (Theology : Basic Instinct)

ঈশ্বরে বিশ্বাসকে অনেকেই সহজাত প্রবৃত্তি বলে মনে করেন। তাঁদের এই মনে করার পিছনে একটা যুক্তি খাড়া করেন, "হাজার হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ঈশ্বর-'বিশ্বাসের ধারা স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে চলে আসছে। যারা ঈশ্বর দেখেনি, যারা ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রকাশ দেখেনি, তাদের মধ্যেও আমরা ঈশ্বর-বিশ্বাস দেখতে পাই। ঈশ্বর-বিশ্বাস, ঈশ্বর-চেতনা, বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মধ্যে সহজাত ভাবে রয়েছে বলেই মানুষের মনে ঈশ্বর-চেতনার প্রকাশ অনিবার্য। ঈশ্বর-চেতনার পথ ধরেই আসে উপাসনা-ধর্ম।"

প্রশ্ন উঠে আসতে পারে—ঈশ্বর-বিশ্বাস সহজাত প্রবৃত্তি হলে ঈশ্বর অবিশ্বাসী কিছু মানুষের অস্তিত্ব কেন দেখা যায়? এর উত্তরে 'সহজাত প্রবৃত্তি' তত্ত্বের প্রবক্তারা বলেন, "সবেরই ব্যতিক্রম আছে। ঈশ্বরে অবিশ্বাসীরা এমনই ব্যতিক্রমী উদাহরণ। যেমন সবার সব ইন্দ্রিয় কাজ করে না, কেউ দেখতে পায় না দৃষ্টি ইন্দ্রিয়ের অভাবে, তেমনই ঈশ্বর অবিশ্বাসীরা এমনই মানুষ 'ঈশ্বর' বিশ্বাস যাদের সহজাত প্রবৃত্তি নয়।"

যাঁরা এমন যুক্তি দেন, তাঁদের বোধহয় এটা জানা নেই যে, ইউরোপে নাস্তিকরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ।

‘সহজাত প্রবৃত্তি’ কাকে বলবো

আসুন একটু দেখা যাক, ‘সহজাত প্রবৃত্তি’ বিষয়টা কী। মানুষের মধ্যে শুধু নয়, মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যেও সহজাত অর্থাৎ সহিতজাত বা জন্মগত ভাবে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা জন্মের পরে প্রকাশিত হতে থাকে। যেমন : বেঁচে থাকার সংগ্রাম (Survival)। বেঁচে থাকার সংগ্রামের শুরু খাবার খুঁজে নেবার মধ্য দিয়ে। ক্ষিদে পেলে শিশু মায়ের দুধ খোঁজে। খোঁজ না পেলে চলে কান্না। পেটের জ্বালাই নানা অপরাধের আঁতুড়ঘর। তাইতো কোনও দেশ যত দেউলিয়া হতে থাকে, ততই গরিবি বাড়ে, ততই বাড়ে নানা অপরাধ।

বেঁচে থাকার তাগিদেই মানুষ মাথা গোঁজার ঠাঁই খোঁজে। গুহাবাসী আদিম মানুষের কাল থেকে আজও সহজাত প্রবৃত্তির তাগিদে মানুষ মাথা গোঁজার আস্তানা খোঁজে। ঝুপড়ি থেকে প্রাসাদ—সবের সৃষ্টির মূলেই রয়েছে আস্তানা খোঁজার সহজাত প্রবৃত্তি, বাঁচার সংগ্রাম।

বন্যার স্রোতের তোড়ে ভেসে যেতে যেতে যে মা এক হাতে গাছের ডাল, ার এক হাতে সন্তানকে ধরে বাঁচার ও বাঁচাবার সংগ্রাম চালায়, সেও স্রোতের তাড় বাড়লে সন্তানকে ছেড়ে দিয়ে দু-হাতে গাছ আঁকড়ে ধরে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিবশে। এটাই মূল ধারা। ব্যতিক্রম থাকতে পারে, কিন্তু তা ব্যতিক্রমই।

সাঁইতিরিশ কেজির মস্তান পট্‌কা থানার বড়বাবুর পিছনে রিভলবার ঠেকিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় তাঁকে আধ কিলোমিটার দৌড় করিয়ে ছেড়েছে—খবর। বড়বাবু দৌড়েছেন রিভলবারের ভয়ে, পটকার ভয়ে নয়। জীবন বাঁচাতে মান-সম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে পট্‌কার আদেশ মান্য করে আধ কিলোমিটার দৌড়েছেন। এখানে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে আত্মসম্মান বিসর্জন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে একটুও দেরি হয়নি।

মানসিক অবসাদের চাপে কখনও কখনও বেঁচে থাকার সংগ্রাম বা Survival-এর সহজাত প্রবৃত্তি হেরে যায়। নিজের জীবনকে শেষকরে দেওয়াকে তখন কেউ কেউ কাম্য মনে করে, মুক্তির উপায় মনে করে। এই অবসাদ অনেক কারণেই আসতে পারে। কোনও দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর, খরচ চালাতে বেসামাল অবস্থা এবং রোগ মুক্তির সম্ভাবনা নেই, এমন অবস্থা থেকে অবসাদের জন্ম হতে পারে। ব্যবসায় একদম ডুবে যাওয়া, বিশাল দেনার দায় থেকে মানুষ সহজে বিষণ্ণতার শিকার হন। দুর্ঘটনায় বিকলাঙ্গ হয়ে চাকরি জীবন থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হওয়া থেকে আসতে পারে বিষণ্ণতা। প্রিয়জনকে হঠাৎ করে হারাবার ব্যথা থেকে, অথবা প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কারণে অবসাদ আসতে পারে। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অবসাদ মাথা চাড়া দেওয়ার প্রবণতা বেশি, কারণ তাঁরা বেশি রকম আবেগ তাড়িত। আবার কেউ আদর্শের কারণে আত্মবিসর্জন দেন হাসিমুখে। বিধর্মীদের হাতে ধর্ম আক্রান্ত ভেবে, ধর্মে বিশ্বাসীদের আত্মঘাতী ঘাতক-বাহিনী হতে আমরা দেখেছি।

এমন বাহিনীর হাতে আমরা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারকে ধ্বংস হতে দেখেছি। দীর্ঘ-মেয়াদি মগজ ধোলাইয়ের মধ্য দিয়ে বাঁচার প্রবৃত্তির উপর 'আত্মত্যাগের আদর্শ' স্থাপন করা হয়। আবার ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দেখতে পাবেন রক্তোন্মাদরা প্রাণ নিতে ও দিতে একটুও পিছ-পা নয়। গণউন্মাদনা তাদের বেঁচে প্রবৃত্তিকে সাময়িক ভাবে ভুলিয়ে দেয়।

এইসব অস্বাভাবিক অবস্থায় না পড়লে সহজাত প্রবৃত্তি তাদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বজায় রাখে।

সহজাত প্রবৃত্তি ক্রোধ (Anger), আক্রমণ প্রবৃত্তি (Aggression), পাল্টা আক্রমণ প্রবৃত্তি (Counter aggression)

তৃতীয় সন্তানও মেয়ে হওয়ায় ক্রুদ্ধ বাবা সন্তানটিকে আছড়ে মেরে ফেলেছেন। এমন ধরনের খবর আমরা মাঝে-মধ্যেই খবরের কাগজে পড়ি।

পুরুলিয়ার একটি খবর। রফিকের সঙ্গে ফতেমার বিবাহিত জীবন মাত্র এক বছরের। বিয়েতে দশ হাজার টাকা পণ দেওয়ার কথা ছিল ফতেমার বাপজানের। দিয়েছিল সাত হাজার। পাওনার তিন হাজার দিচ্ছি-দেব বলে এক বছর ধরে ঠকাচ্ছিল। এক রাতে ফতেমার বাপকে জোচ্চোর বলায় ফতেমা চিৎকার জুড়ে দিয়েছিল, বাপ তুলে গাল দেবে না বলছি। ধাঁ করে মাথায় আগুন ধরে গেল রফিকের। ফতেমার মাথায় বসিয়ে দিল হেঁসোর কোপ। এক কোপেই সব শেষ।

আপনি একজন নিছক মধ্যবিত্ত। ছাপোষা মানুষ। বউ সন্তানসম্ভবা। আপনার ছোট্ট শহরের ছোট্ট সরকারি হাসপাতালে সন্তানের জন্ম দিতে অপেক্ষায় আছেন। প্রসব ব্যথা উঠছে না। ডাক্তারবাবু ইনজেকশন দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে পাঠিয়ে দিলেন জেলার বড় হাসপাতালে। সঙ্গে গেলেন আপনি ও তিন পড়শি। জেলা হাসপাতালের গেটে যখন পৌঁছলেন তখন রাত এগারোটা। গেট বন্ধ। এগারটা থেকে আড়াইটে অ্যাম্বুলেন্স হর্ন বাজিয়ে গেল। আপনারা গেট খোলার জন্য চেঁচালেন। হাসপাতালের কিছু রোগীও চেঁচালেন। কিন্তু দারোয়ান, নার্স, ডাক্তার—কারও দেখা পাওয়া গেল না। তারপর আপনারা এক মাথা আগুন নিয়ে দাপিয়ে বেড়ালেন, ভাঙচুর করলেন। এমন ঘটনা অনেক ঘটে।

রুচি ও সংস্কৃতিগত অগ্রগামীতার কারণে উচ্চ শিক্ষিতদের রাগের অভিব্যক্তি কিছুটা ভিন্ন ধরনের। প্রতীচী ট্রাস্টের সমীক্ষার রিপোর্ট আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন অমর্ত্য সেন। পুরুলিয়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল জানতে প্রতীচী ট্রাস্ট সমীক্ষা চালিয়েছিল। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন সমীক্ষা রিপোর্টের ভূমিকায় লিখেছেন, "স্কুলশিক্ষায় অগ্রসর ও অনগ্রসর শ্রেণী-বিভাজন দূর হয়নি, বস্তুত তীব্রতর হয়েছে, এটা লজ্জার কথা।" অমর্ত্য সেনের

না থেকে সক্রিয় ভাবে অংশ নেয়। দেহ শুচিতার ভণ্ডামী নেই।

মধ্যবিত্তদের একটা প্রবণতা—দেহশুচিতার পক্ষে সাড়ম্বরে বলা। যৌন অভিলাষ একটি সহজাত প্রবৃত্তি হওয়া সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত সমাজ বিষয়টিকে 'খারাপ', রেখে-ঢেকে রাখার বিষয় বলে চিহ্নিত করে দিয়েছে।

যৌন অভিলাষ নিশ্চয়ই প্রকাশ্যে সংঘটিত হওয়ার বিষয় নয়।
কিন্তু যৌন-শিক্ষা, ছেলে-মেয়েদের
বন্ধুত্বপূর্ণ মেলামেশাকে
খারাপ ভাবাটাই
কুশিক্ষা।

এমন বহু মানুষের মুখোমুখি অবিরত হই, যাঁরা গর্বের সঙ্গে বলেন, "আমার মেয়ে খুব ভালো। একটিও ছেলে বন্ধু নেই।" যেন ছেলে বন্ধু না থাকাটাই মেয়েদের ভালো হওয়ার আবশ্যিক শর্ত। অনেক ছেলের মা-বাবাও এমন বোকা বোকা গর্ববোধ নিয়ে থাকতে ভালোবাসেন।

যৌন অভিলাষ সহজাত প্রবৃত্তি। মিলন ইচ্ছে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানসিকতার পরিবারের ছেলে-মেয়েরা স্বাভাবিক ভাবে মেলামেশা করে। বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। গোপনে প্রেমপত্র দেওয়ার ঘটনা বিরল, কারণ তার প্রয়োজন নেই। গোপনে পার্কে বা সিনেমা হলে দেখা করার দরকার হয় না। বন্ধু-বান্ধবীদের ব্যক্তিজীবন নিয়ে অহেতুক কৌতূহলও কম। মধ্যবিত্ত মানসিকতার রক্ষণশীল পরিবারের ছেলে-মেয়েরা সংস্কৃতিগত ভাবে দুর্বল মানসিকতার (ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, তবে তা ব্যতিক্রম-ই)। এই অবস্থায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের যৌন অভিলাষের অভিব্যক্তি ঘটে গোপনে। কিছু সময় অজাচারে।

মানসিক কারণে শারীরিক অসুখে মধ্যবিত্ত নারীরাই বেশি ভোগেন। মধ্যবিত্ত বলতে আমি মধ্যবিত্ত মানসিকতার কথা বলছি। মা, মাসি, পিসি, দিদিমা, ঠাকুমারা মেয়েদের শিখিয়ে এসেছেন, লজ্জাই নারীর ভূষণ। স্বামীর কাছে মিলন প্রার্থনা করলে স্বামী চরিত্রহীনা ভাববে। মিলনকালে স্ত্রী সক্রিয়ভাবে অংশ নিলে স্বামী কামুকা ভাববে। মধ্যবিত্ত নারীদের মিলন-আনন্দ উপভোগের সুযোগ থাকে না। ফলে বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই স্ত্রী'র কাছে এই মিলন ভরণ-পোষণের বিনিময়ে স্বামীর কাছে নিজের দেহকে তুলে দেবার প্রচলিত প্রথা হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘ যৌন অবদমনের ফলে মানসিক কারণে নানা ধরনের শারীরিক অসুখের প্রকাশ ঘটে। নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মানসিক অবস্থার নারীদের মধ্যে একটা বিষয়ে মিল আছে; তাঁরা পুরুষদের সঙ্গে মিলনের সময় পুরুষদের মতই সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। ফলে সাধারণভাবে তাঁরা যৌন অবদমনের কারণে মানসিক কারণে দেহজনিত (Psycho-somatic disorder)

রোগে ভোগেন না।

সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে ঈশ্বর বিশ্বাসের কোনও স্থান নেই। মনোবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে সহমত। এই অবস্থায় আমরা কোনওভাবেই ঈশ্বর বিশ্বাসকে সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারছি না।

ঈশ্বর বিশ্বাস যে সহজাত প্রবৃত্তি নয়, সেটা মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বে না ঢুকে 'গোদা' যুক্তি দিয়েই প্রমাণ করা যায়।

পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে সাধারণ শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উপাসনা-ধর্মে (religion) বিশ্বাসীর সংখ্যা হু হু করে নেমেই চলেছে। ন'য়ের দশকের এনসাইক্লোপিডিয়ার যে কোনও সংস্করণে চোখ বোলালে দেখতে পাবেন, রিলিজিয়ানে বিশ্বাসীর সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশেরও কম।

এই তথ্য প্রমাণ করে যে, উপাসনা-ধর্মে বিশ্বাস বা ঈশ্বরে বিশ্বাস সহজাত প্রবৃত্তি নয়। সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের পরিণতি।

তিন : ধর্মীয় আচরণ বাদে ঈশ্বর বিশ্বাস (Deism)

এই মতবাদ দৈব প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করে না। ঈশ্বর বিশ্বাসকে সহজাত প্রবৃত্তি মনে করে না। এই মতবাদ মনে করে মানুষের সাধারণ যুক্তিবোধ ও বুদ্ধি থেকেই উপাসনা- ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে। এক সময় আদিম মানুষ তাদের সাধারণ যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পেরেছে, সৃষ্টি থাকলে তার একজন স্রষ্টা থাকবে। এই যে নানা ধরনের প্রাণী, উদ্ভিদ, নদী, পাহাড়, বন, সূর্য, চন্দ্র, তারা, আকাশ, মেঘ, বৃষ্টি— এ'সব যখন আছে, তখন এদের একজন স্রষ্টা নিশ্চয়ই আছে। এই স্রষ্টার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া সত্যকেই মেনে নেওয়া। ঈশ্বর সত্য। ঈশ্বর-উপাসনা মানে সত্যকে উপাসনা। উপাসনা মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের মেলার উপায়। এই স্রষ্টা ও সৃষ্টির মিলনে ফোড়ে বা দালালের কোনও ভূমিকাই নেই। ভক্তিই স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির মিলনের শেষ কথা।

পুরোহিত সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থে নানা ধর্মীয় আচার-আচরণ নিয়ম-কানুন ইত্যাদি তৈরি করেছে। ঈশ্বর ও মানুষের মাঝখানে যোগাযোগকারী হিসেবে নিজেদের দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এই ধূর্ত পরজীবী পুরোহিত সম্প্রদায়ই শক্তিমান শাসক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মকে প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছে।

ধর্মের মূল সত্য হলো—ঈশ্বর আছেন, আত্মা ঈশ্বরের সৃষ্টি, যাবতীয় সৃষ্টির স্রষ্টা ঈশ্বর। আত্মা অমর। যেহেতু যুক্তি-বুদ্ধি মানুষের সহজাত, তাই এই সত্যগুলো

মানুষের কাছে ধরা পড়েছিল। আচারহীন উপাসনা-ধর্মই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। 'সত্য ধর্ম', 'স্বাভাবিক ধর্ম' বা 'বিশুদ্ধ ধর্ম'-র উৎস হল মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি। পরবর্তী কালে পুরোহিতের স্বার্থপরতা ও প্রতারণা থেকে উঠে এসেছিল আচারসর্বস্ব বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাসনা-ধর্ম।

এই মতের প্রথম লিখিত প্রবক্তা ছিলেন লর্ড হার্বার্ট (Lord Herbert)। ১৬৬৩ সালে তাঁর এই ধর্ম বিষয়ক মতামত প্রকাশিত হয়। পরে ফ্রান্সের বেশ কিছু চিন্তানায়ক এই মতটি গ্রহণ করেন।

এই মতটি গ্রহণে আমাদের কিছু অসুবিধে রয়ে গেছে। (১) কেউ যদি প্রশ্ন তোলেন, 'সৃষ্টি থাকলে স্রষ্টা থাকবে'—এই তত্ত্বকে মেনে নিলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। কারণ তখন সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন আসবে—'ঈশ্বরের স্রষ্টা কে?' জানি না এই মতবাদীরা কী উত্তর দেবেন? যদি তাঁদের চতুর উত্তর হয়—ঈশ্বর স্বয়ম্ভু, তবে প্রশ্ন উঠবেই—প্রকৃতিকে স্বয়ম্ভু ভাবতে অসুবিধে কোথায়? (২) আদিম মানুষের বুদ্ধি কখনই এতটা উন্নত ছিল না যে আত্মা, আত্মার অবিনশ্বরতা ইত্যাদি আধুনিক ধর্ম বিশ্বাসের মূল তত্ত্ব চিন্তায় আসবে। (৩) এই মতবাদকে মেনে নিলে মানুষের মনের ক্রমবিবর্তনকে অস্বীকার করতে হয়। যা মনোবিজ্ঞান বিরোধী। (৪) সমস্ত ঐতিহাসিক ধর্মই পুরোহিতদের ধূর্ততা থেকে উদ্ভূত—এমন মতামতও ঠিক নয়।

**মানুষের মনে প্রকৃতির রহস্যময়তা ঘিরে ভক্তি-ভয়ের উদ্ভব হয়েছিল
পুরোহিত সম্প্রদায়ের উৎপত্তির আগে। পুরোহিত সম্প্রদায়
মানুষের এই ভয়-ভক্তি-আবেগ ইত্যাদিকে কাজে
লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করেছে।
পুরোহিতরা ধর্মের স্রষ্টা নয়।
ধর্মের পালক ও
পুষ্টকারী।**

চার ঃ নাস্তিক্য মতবাদ (Theory of Atheism)

Atheist শব্দের অর্থ Disbelief in the existence of God, অর্থাৎ নাস্তিক শব্দের অর্থ—যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। এটাই বিশ্বজনীন মতবাদ অর্থাৎ এই মতবাদ বিশ্ব জুড়ে স্বীকৃত।

বৈদিক সাহিত্য অবশ্য 'নাস্তিক' শব্দের একটু অন্যধরনের বিস্তৃত অর্থ তৈরি করেছে। যথা (১) যে বেদ মানে না, (২) যে বেদকে অপৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বর-সৃষ্ট মনে করে না, (৩) যে বেদকে অভ্রান্ত মনে করে না, (৪) যে দেশাচার মানে না, (৫) যে পরলোকে বিশ্বাস করে না, (৬) যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না।

বৈদিক সাহিত্যে ছ'টি শ্রেণীর নাস্তিকের কথা বলেছে, (১) মাধ্যমিক (২) যোগাচার (৩) সৌত্রান্তিক (৪) বৈভাষিক (৫) চার্বাক (৬) দিগম্বর।

আমরা প্রথমে নাস্তিক্য মতবাদ নিয়ে আলোচনার সময় বিশ্বজনীন 'নাস্তিক' শব্দের অর্থকে ধরে আলোচনায় যাব। অর্থাৎ 'নাস্তিক্যবাদ' বলতে ধরে নেব 'নিরীশ্বরবাদী' মতবাদ।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শন বলতে যে চিন্তাধারা বোঝায়, তা প্রধানত নিরীশ্বরবাদী। কথাটা একটু নতুন শোনালেও এটাই সত্যি, একশো শতাংশ সত্যি।

খবর কাগজ পড়ে আমরা ততটাই জানতে পারি, যা জানান হয়, ছাপা হয়। চাপা খবর আমরা পাই না। ঠিক তেমনি বেশির ভাগ 'ভারতীয় দার্শনিক' যতটা ছেপেছেন, তার চেয়ে বেশি চেপেছেন ও বিকৃত করেছেন।

ম্যাক্সমুলার থেকে রাধাকৃষ্ণণ 'ভারতীয় দর্শনের গবেষক' থেকে 'প্রমাণ্য দার্শনিক'রা বলতে চেয়েছেন, হিন্দু উপাসনা-ধর্ম মূলত একেশ্বরবাদী। তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন, বেদের দেবতারা ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিনিধি বা প্রতীক। পরবর্তীকালে বেদ বিশ্বাসী মানুষরা বুঝেছিলেন, সমস্ত প্রাকৃত্তিক শক্তির উৎস এক। তিনিই পরম ব্রহ্ম। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা।

এইসব 'ভারত বিশেষজ্ঞ', 'পণ্ডিত-দার্শনিক', 'প্রণম্য-দার্শনিক'রা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে, ব্রিটিশ শক্তির পরিমণ্ডলে পরিকক্ক হওয়ার ফলে খ্রিস্ট্রীয় একেশ্বরবাদের সাংস্কৃতিক শাসনকে মেনে নিয়েছিলেন। বৈদিক উপাসনা-ধর্মের যাগযজ্ঞ সর্বস্বতাকে, বহু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসকে, খ্রিস্ট্রীয় একেশ্বরবাদের তুলনায় হীন বলে মনে করেছিলেন। ফলে বৈদিক ধর্মকে মূলত একেশ্বরবাদী বলে প্রচার করতে চেয়েছিলেন। আর এই চাওয়াকে সার্থক করতে এইসব তথাকথিক পণ্ডিতরা ইতিহাস বিকৃত করতে চেষ্টার কসুর করেননি।

মুশকিল হল, বৈদিক সাহিত্য একেশ্বরবাদী তো নয়-ই, এমনকী ঈশ্বরকে সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা বলে মনে করে না। বেদ দ্বিধাহীন ভাবে মনে করে, যে কারণে যজ্ঞ করা হবে, সে ফল মিলবেই। ঈশ্বরের ক্ষমতা নেই এই ফল লাভ আটকে দেবার। ক্ষমতা নেই ফল দেবার। যজ্ঞই একমাত্র সত্য। দেবতার ভূমিকা শূন্য।

সাংখ্য

সাংখ্য দর্শনকে ভারতের প্রাচীনতম দর্শন বলে মনে করেন ভারতীয় দার্শনিকরা। মানেন তথাকথিত 'পণ্ডিত' দার্শনিকরাও। সাংখ্য দর্শন নিরীশ্বরবাদী দর্শন। এখানেই

শেষ নয়। সাংখ্য দর্শন মূলত বস্তুবাদী দর্শন। সাংখ্য যে একটি প্রাচীন মতবাদ, তার প্রমাণ—উপনিষদ সমূহে ও মহাভারতে সাংখ্য দর্শনের উল্লেখ আছে। গৌতম বুদ্ধ গৃহত্যাগের পর সাংখ্য অধ্যয়ন করেছিলেন বলে মনে হয়। কারণ সাংখ্য দার্শনিক কপিল ছিলেন গৌতম বুদ্ধের উত্তরসূরী এবং বৌদ্ধ ধর্মের উপর সাংখ্যের প্রভাব স্পষ্ট।

কপিল তাঁর সাংখ্যে ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে কোনও স্থান দেননি। তাঁর মতে প্রকৃতি নিত্য, সমস্ত জাগতিক পদার্থ তারই পরিবর্তনের ফলে উৎপন্ন।

সাংখ্য মনে করে—জড় প্রকৃতির বিবর্তনের মধ্য দিয়েই বিশ্বের সব কিছুর সৃষ্টি। প্রতিটি কাজ বা ঘটনার পিছনেই রয়েছে কারণ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ সাংখ্য-সংস্থাপক কপিলকে ঋষি বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। নিরীশ্বরবাদী কপিল মুনি হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে ঈশ্বরের পরমভক্ত মুনি হিসেবে পুজিত হচ্ছেন—এটাই দুঃখ। ইতিহাস বিকৃতিকে দেখার দুঃখ। প্রচারের দৌলতে বিকৃতিকারীদের আলোকিত হতে দেখার দুঃখ।

মীমাংসা

ভারতবর্ষের আরও একটি প্রাচীন ও অত্যন্ত শক্তিশালী দর্শন হল মীমাংসা। মীমাংসাবাদীরা স্পষ্টতই নিরীশ্বরবাদী। মীমাংসক কুমারিল ভট্টের রচিত শ্লোকবার্তিক থেকে আমরা মীমাংসা দর্শনের কিছু মতামত এখানে তুলে দিচ্ছি। এক : কেউ যদি বলেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আগে থেকেই ঈশ্বর ছিলেন, তবে তাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে সৃষ্টি না থাকলে স্থান থাকে না। স্থান না থাকলে ঈশ্বর কোন স্থানে থাকতেন? দুই : ঈশ্বর নিরাকার ছিলেন, নাকি তাঁর আকার ছিল, দেহ ছিল? দেহ থাকলে সেই দেহের নিশ্চয়ই একজন স্রষ্টা ছিলেন? তিন : ঈশ্বর সৃষ্টির জন্য নিশ্চয়ই আর এক ঈশ্বরের প্রয়োজন হয়েছিল। সেই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করতে আরও একজন ঈশ্বরের প্রয়োজন হয়েছিল। এভাবে অনন্ত ঈশ্বরের প্রয়োজন হতেই থাকবে। চার : কোন উপাদান দিয়ে তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন? সেই উপাদানগুলো কি সৃষ্টির আগে থেকেই বর্তমান ছিল? থাকলে সেগুলো কোথায় ছিল? পাঁচ : সৃষ্টির উপাদানগুলোর স্রষ্টা কে? ছয় : যদি ঈশ্বর তাঁর দেহ থেকেই এই উপাদান তৈরি করে থাকে—তবুও প্রশ্ন থেকে যায় সেই ঈশ্বরের দেহের স্রষ্টা কে? স্রষ্টা হিসেবে একের পর এক ঈশ্বর আনলেও এর উত্তর পাওয়া যাবে না। সাত : ঈশ্বর কেন জগৎ সৃষ্টি করলেন? কী অভাববোধ থেকে এই সৃষ্টি? ঈশ্বরের অভাববোধ থাকার অর্থ তিনি পূর্ণ নন। আট : এই সৃষ্টিকে ঈশ্বরের লীলা বললে, বলতেই হয় ঈশ্বর দায়িত্বজ্ঞানহীন। নয় : ঈশ্বর যদি করুণা থেকে জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে

দশ : বেদ এ'কথাই বলে যে, বাঞ্ছিত ফল পেতে যজ্ঞই একমাত্র সত্য, দেবতার কোনও ভূমিকা নেই। দেবতা ফল দিতেও পারে না, ফল লাভ বন্ধও করতে পারে না।

বৈদিক যজ্ঞ নীতি 'ব্রাহ্মণ' তার প্রমাণ। তাহলে দেবতা বা ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নন।

ঈশ্বর বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে এমন ভয়ংকর আক্রমণ আর কোনও দর্শন-ই সেই সময় হানতে পারেনি। সত্যি বলতে কী, এ'যুগের উচ্চডিগ্রিধারী অনেকের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিদীপ্ত ছিলেন মীমাংসাবাদীরা। মজার কথা হল, প্রচারের আলোয় আলোকিত 'বিখ্যাত পণ্ডিত'দেরও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে হয়েছে যে, সাংখ্য এবং মীমাংসা নিরীশ্বরবাদী মতবাদ ও মূলত বস্তুবাদী মতবাদ।

স্বভাববাদ

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের যুগে আরও একটি যুক্তিমনস্ক মতবাদ উঠে এসেছিল। মতবাদটির নাম 'স্বভাববাদ'। স্বভাববাদের উল্লেখ আমরা পাই মহাভারতে, বৌদ্ধ লংকাবতার সূত্রে ও অশ্বঘোষের বুদ্ধ চরিত-এ। স্বভাববাদ স্পষ্টতই একটি যুক্তিমনস্ক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে (১) বিশ্বপ্রকৃতি কার্য-কারণের নিয়মশৃঙ্খলে বাঁধা, (২) একটি বিশেষ ধরনের কাজের বা ঘটনার পিছনে একটি বিশেষ ধরনের কারণ থাকে। যেমন, মাটি থেকে মৃৎপাত্র-ই হতে পারে, পরিধেয় বস্ত্র নয়, (৩) কারণহীন বা অতিপ্রকৃত ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়।

স্বভাববাদীরাও ছিলেন অতিপ্রাকৃতে অবিশ্বাসী, নিরীশ্বরবাদী।

বৌদ্ধ মতবাদ

বৌদ্ধ মতবাদ বলতে যে সব বাজার চলতি বই রয়েছে তাতে বৌদ্ধত্বের চেয়ে হিন্দুত্বের প্রভাব প্রবল। যে বুদ্ধ নিরীশ্বরবাদী, কার্যকারণ সম্পর্কে বিশ্বাসী— সেই বুদ্ধকে দেবতা বানিয়ে ছাড়তে কেউ-ই প্রায় কসুর করেননি। বুদ্ধকে ঘিরে কাহিনী ও তথাকথিত ইতিহাসে অলৌকিক ঘটনার ছড়াছড়ি। পালি ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে প্রথম লেখা হয় তাও বুদ্ধের মৃত্যুর কয়েক'শ বছর পরে। তখন আদি বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর ও বিভাজন চলছে। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে আমরা পেলাম পল্লবিত, অলৌকিকে ভরা বুদ্ধকে।

সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ নাগাদ। পিতা শুদ্ধোদন ছিলেন শাক্য উপজাতি গোষ্ঠীর প্রজাতন্ত্রের পার্লামেন্ট বা গণসংস্থার সদস্য। এই সময়

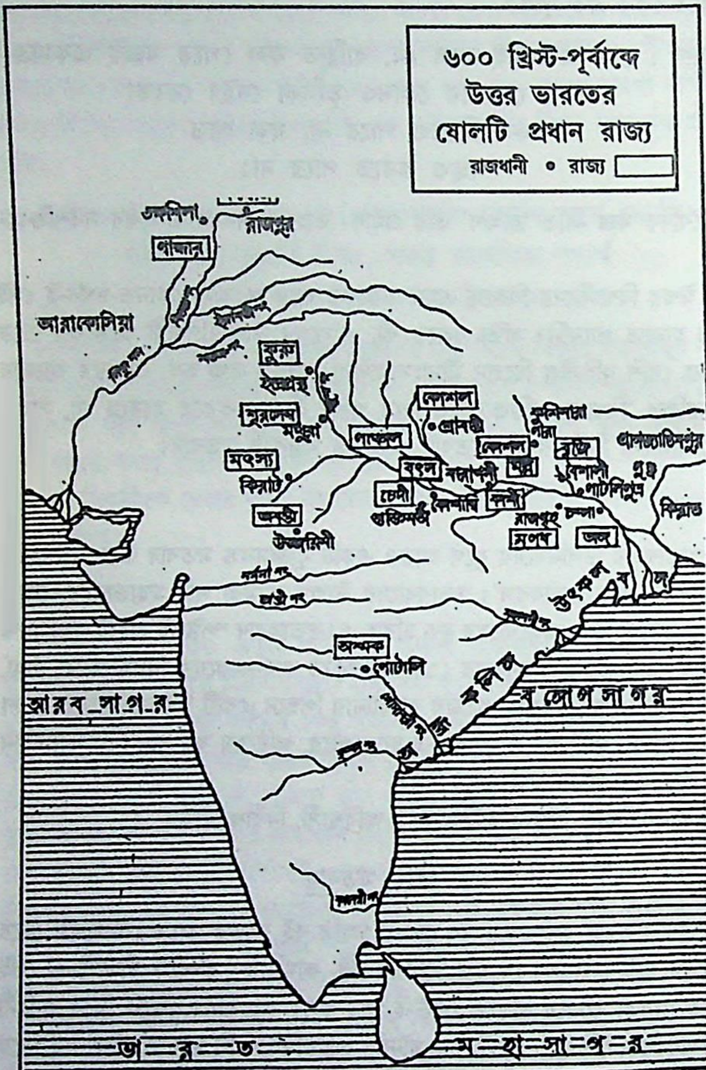

৬০০ খ্রিস্ট-পূবাব্দে উত্তর ভারতের ষোলটি প্রধান রাজ্য

ভারতবর্ষে আরও কিছু গণরাজ্য বা প্রজাতন্ত্র ছিল। এইসব গণরাজ্যের, গণসংস্থার সদস্যদের রাজা বলা হত। বুদ্ধ সাহিত্য বিনয়পিটক, বুদ্ধচর্যা, মজ্ঝিমণিকা ইত্যাদি থেকে আমরা জানতে পারছি শাক্য প্রজাতন্ত্রে শুদ্ধোদন ছাড়াও রাজা ছিলেন ভদ্দিয় এবং দণ্ডপানি।

গৌতমের মা মায়াদেবী পিত্রালয়ে যাওয়ার পথে কপিলাবস্তুর কাছে লুম্বিনীতে গৌতমের জন্ম দেন। লুম্বিনীর বর্তমান নাম রুম্মিনদেই, নেপাল-তরাই অঞ্চলের নৌতনবা স্টেশন থেকে আট মাইল পশ্চিমে। গৌতমের জন্মের সাত দিনের মধ্যে মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। মাসি তথা বিমাতা গৌতমী শিশুটিকে পালনের দায়িত্ব নেন। গৌতমী-পালিত পুত্রের নাম হয় গৌতম। যৌবনে গৌতমের বিয়ে হয়। পাত্রী প্রতিবেশী কোলিয় গণরাজের কন্যা যশোধরা। পুত্র রাহুলের জন্ম হয়। গৌতম ঐশ্বর্যের মধ্যেই বড় হয়েছিলেন। সাধারণের দুঃখ-দারিদ্রের কষ্ট তাঁর অজানা ছিল। বার্ধক্য, রোগ ও মৃত্যু দেখে তিনি মানসিকভাবে আঘাত পান। এই দুঃখময় জীবন থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে সংসার ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েন।

পরিব্রাজক গৌতম প্রথমে যান আলার কালাম-এর কাছে। সেখানে কিছু যোগাভ্যাস শেখেন। তাতে মন পরিতৃপ্ত হল না। এরপর যান রামপুত্তের কাছে। সেখানেও কিছু যোগবিদ্যা শেখেন। এরপর তিনি বোধগয়ার কাছে ছয় বছর যোগ-সাধনা। দীর্ঘ সময় ধরে অনশনে থেকে যোগ-সাধনা করেন। তাতে পরিতৃপ্তি এল না। বোধ বা জ্ঞান এল না। এল অনশনের কারণে কৃশতা ও দুর্বলতা। এই সময় সুজাতা নামের এক গোপকন্যার সঙ্গে গৌতমের পরিচয় হয়। সুজাতা বলেন, এমন দুর্বল শরীরে চিত্তের একাগ্রতা আনা বা সমাধি অসম্ভব। শরীরকে সুস্থ রাখতে খাদ্য-গ্রহণ প্রয়োজন। সুজাতা ছিলেন উন্নতমনা। তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা গৌতমের চিন্তাকে শাণিত করেছিল। তারই পরিণতিতে 'নারী' বিষয়ে গৌতমের পূর্ব-ধারণা পরিবর্তিত হয়। গৌতম 'বুদ্ধ' হওয়ার পর নারীদেরও দীক্ষা দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। ধনী মহিলা বিশাখা যেমন বুদ্ধের গৃহীশিষ্যা ছিলেন, তেমন বিমাতা গৌতমীও সংঘের সদস্যা হন। মেয়েরাও সংঘে যোগদানের অধিকারিণী হন।

যাই হোক, সুজাতার যুক্তি মেনে গৌতম খাবার গ্রহণ করলেন। এতে গৌতমের পাঁচ সাধনসঙ্গী গৌতম আদর্শচ্যুত হয়েছেন মনে করে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন।

একটু সবল হয়ে গৌতম নিরঞ্জনা নদীর তীরে এক বটগাছের তলায় বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। জীবন ও জগৎ রহস্য নিয়ে তিনি নতুন বোধ বা উপলব্ধিতে পৌঁছলেন। নিজের দুঃখময় জীবন থেকে নির্বাণ লাভ করে বুদ্ধ হলেন। আত্মনিগ্রহ থেকে বিচ্যুত দেখে যে পাঁচ সঙ্গী বুদ্ধের সঙ্গ ত্যাগ করেছিল, তাঁদের সন্ধানে তিনি সারনাথে গেলেন। সেখানে সঙ্গীদের পেলেন। তাঁদের সামনে নিজের নতুন পাওয়া 'বোধ' বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন। এই বক্তব্য বা ভাষণ বৌদ্ধ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে 'ধর্মচক্র-প্রবর্তন' হিসেবে খ্যাত। ওই পাঁচ শিষ্যকে নিয়ে বৌদ্ধ সংঘের সূচনা। ধর্মচক্র

প্রবর্তনের চার মাসের মধ্যে বুদ্ধের দীক্ষিত সন্ন্যাসীর সংখ্যা দাঁড়ায় ষাটে। এরপর বুদ্ধ আরও চুয়াল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের নানা অঞ্চলে ঘুরেছেন। অধিবাসীদের উপদেশ দিয়েছেন। এইসব উপদেশে ভক্তির চেয়ে যুক্তি-বুদ্ধির দিকে জোর দিয়েছিলেন বেশি।

আশি বছর বয়সে কুশীনারা বা কুশীনগরে (বর্তমান কসয়া, গোরখপুর জেলা) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বুদ্ধের জীবনী জানতে পড়তে পারেন—বুদ্ধচরিত, ললিতবিস্তর, মহাবস্তু, বিনয়কথা, নিদানকথা, বিনয়পিটক, মজ্ঝিমণিকা, মহাপাদন-সুত্ত,. মহাপরিনির্ব্বাণ-সুত্ত, সুত্তনিপাত ইত্যাদি। পড়তে পারেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, রাহুল সাংকৃত্যায়নের বৌদ্ধ দর্শন।

বুদ্ধের মূল চার সিদ্ধান্ত :

বুদ্ধের উপদেশাবলী বুঝতে হলে বুদ্ধের মূল চার সিদ্ধান্ত জানাটা খুবই জরুরি। সিদ্ধান্তগুলো হল (এক) ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করা, (দুই) আত্মাকে 'নিত্য' স্বীকার না করা, (তিন) কোনও গ্রন্থকে স্বতঃপ্রমাণ হিসেবে স্বীকার না করা, (চার) জীবন প্রবাহকে স্বীকার করা।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করা

জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুদ্ধ অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর মতে—

জগতের সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিক নিয়মে। জগৎ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে প্রকৃতি জগতের স্বাভবিক নিয়ম দ্বারা।

কেউ কেউ মনে করেন, ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, যেমন কুম্ভকার মৃৎপাত্রের স্রষ্টা। ঈশ্বর সর্বব্যাপী। ঈশ্বর স্রষ্টা হলে তিনি কুম্ভকারের মত মাটি ও মৃৎপাত্র হতে পৃথক। ঈশ্বর যদি তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক হন, তবে সর্বব্যাপ্ত হতে পারেন না।

ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হন, তাঁর ইচ্ছাতেই যদি মানুষের কাজ-কর্ম নির্ধারিত হয়, তবে অসৎ কাজের জন্য মানুষ কেন দায়ী হবে?

মনুষ্য জগতের বাইরের অন্যান্য প্রাণী, যাদের ভাল-মন্দ বিচার-বোধ নেই, তাদের কাজ-কর্মের জন্য ঈশ্বর কী ভাবে তাদের দায়ী করবে?

পৃথিবীতে সুখের চেয়ে দুঃখের পরিমাণ বেশি। তবে কি ঈশ্বর যতটা দয়ালু, তারচেয়ে বেশি নিষ্ঠুর?

সমস্ত ঘটনার পিছনে কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে। বুদ্ধের এই সর্বব্যাপী কার্য-কারণ তত্ত্ব 'প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ' নামে পরিচিত।

কার্য-কারণ সম্পর্ক ছাড়া মানসিক জগতের বা বাইরের জগতের কোনও কিছু ঘটা সম্ভব নয়। আমাদের জীবনে যে দুঃখের 'প্রতীত্য' বা 'প্রাপ্তি ঘটে' তার পিছনেও আছে 'সমুৎপাদ' বা 'উৎপত্তি'র কারণ। কারণ দুটি। এক : তৃষ্ণা, দুই : অবিদ্যা। ইন্দ্রিয়সুখের প্রতিটি তৃষ্ণাই মানুষকে লোভী নিষ্ঠুর হত্যাকারী করে তোলে। দুঃখ মানুষের জীবনে অনিবার্য। দুঃখ যেমন আছে, দুঃখ নিবারণের উপায়ও তেমন-ই আছে। দুঃখ বিনাশের পথ হিসেবে বুদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গের উপদেশ দিয়েছেন।

মানুষের জীবনে দুঃখ অনিবার্য, বুদ্ধের এই মতবাদ দুঃখবাদ হিসেবে পরিচিত।

অবিদ্যাকে দুঃখের একটি কারণ বলে বুদ্ধ উল্লেখ করেছেন, এ'কথা আমরা আগেই জেনেছি। অবিদ্যা বলতে তিনি বলেছেন সঠিক জ্ঞানের অভাব,বা সম্যক জ্ঞানের অভাব, সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞানতা, শ্রেষ্ঠ-সত্য না জানা। আমাদের জানতে হবে, চার মহাভূত পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি থেকেই জগতের সবের সৃষ্টি, ধ্বংসে সবই এই চারেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে জানতে হবে। ছয় ইন্দ্রিয় হল—চক্ষু, শ্রবণ, ঘ্রাণ, জিহ্বা, ত্বক ও মন। বিজ্ঞান হল চেতনা বা মনেরই নাম।

বুদ্ধের কথায়, আমাদের যাবতীয় দুঃখের কারণ তৃষ্ণা ও অবিদ্যা। দুঃখ ঈশ্বরের রুষ্টতা থেকে আসে না। ঈশ্বর মানুষের মনোজগতের কল্পনা।

আত্মাকে নিত্য স্বীকার না করা

বৌদ্ধযুগে বেদ-বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজকরা মনে করতেন, আত্মা এক নিত্য চেতন শক্তি। অর্থাৎ আত্মা অমর, যার ক্ষয় নেই, যার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, যাকে অস্ত্র দ্বারা কাটা যায় না, আগুনে পোড়ান যায় না। এই নিত্য চেতন শক্তি শরীর থেকে পৃথক। কোনও দেহে চেতনা বা আত্মা থাকলে সে তখন জীবিত। দেহ থেকে চলে গেলে মৃত। এই সময় কিছু উন্নত চিন্তার এগিয়ে থাকা মানুষ জানালেন—আত্মা শরীরেরই গুণ, শরীর থেকে পৃথক কোনও শক্তি নয়। শরীরে নির্দিষ্ট পরিমাণে ভূত-পদার্থের (মৌল পদার্থের) মিশ্রণের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে শরীরে উষ্ণতা, উদ্যম ও চেতনার সৃষ্টি হয়। ভূত পদার্থের তারতম্য ঘটলে আবার তা হারিয়ে যায়। বুদ্ধ আত্মাকে 'অনিত্য' বললেন। তবে তাঁর এই 'অনিত্য' শব্দার্থ তাঁর সমসাময়িক চিন্তাবিদদের 'অনিত্য' শব্দার্থের চেয়ে কিছু আলাদা।

বুদ্ধ আত্মার সংজ্ঞা দিলেন—'চিত্ত-বিজ্ঞান' বা 'মনো-বিজ্ঞান' আর 'আত্মা' একই

বস্তু। আমরা যে ভাবে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক ও জিহ্বা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষ করতে পারি, মনকে সে'ভাবে পারি না। চোখ হয়তো লোভনীয় খাদ্যবস্তু দেখতে পেল। নাক তার গন্ধ এনে দিতে জিহ্বা ইন্দ্রিয় ভোগ তৃষ্ণা অনুভব করলো। জিভে জল চলে এলো। এই যে চোখ, নাক ও জিভ এই তিন ইন্দ্রিয়কে মেলাবার ভূমিকা যে পালন করল সেও ইন্দ্রিয়। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে চালনাকারী ইন্দ্রিয়ের নাম 'মন'। এই মন বা চিত্ত-ই আত্মা। (মনোবিজ্ঞান অবশ্য 'মন'কে ইন্দ্রিয় বলে স্বীকার করে না।)

বুদ্ধের মতে—সবকিছুই অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী। বুদ্ধের এই সর্বব্যাপী পরিবর্তন, বিবর্তন, অনিত্য তত্ত্বই 'ক্ষণিকবাদ' নামে পরিচিত।

ক্ষণিকবাদ অনুসারে জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল। যার শুরু আছে, তার শেষ আছে। যার জন্ম আছে, তার মৃত্যু আছে। জাগতিক বস্তু, প্রাকৃতিক বস্তু ও মানসিক চিন্তা-ভাবনা সবই নিরন্তন পরিবর্তিত হচ্ছে। বুদ্ধের কথায় এই পরিবর্তনই একমাত্র সৎ, শাশ্বত, সনাতন।

যে প্রদীপ শিখাকে আমরা জ্বলন্ত দেখি, সেই শিখার কিছুক্ষণ আগে দেখা আগুন ও কিছুক্ষণ পরে দেখা আগুন এক নয়। প্রতিটি মুহূর্তে জ্বলছে নতুন আগুন। যতক্ষণ প্রদীপে তেল ও পলতে থাকবে, ততক্ষণ আগুন জ্বলবে। প্রতিটি মুহূর্তের ভিন্ন ভিন্ন আগুনের শিখাকে প্রতিটি মুহূর্তে আমরা দেখছি এবং ভাবছি— একই আগুন।

আমাদের শরীর প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে আসা একটি মানুষের কথা ভাবুন। পাঁচ মাসের শিশু, পনেরোর কিশোর, পঁচিশের যুবক ও পঞ্চাশের প্রৌঢ়ের শরীর এক নয়। আমাদের শরীরের প্রতিটি অণু (বর্তমানে আমরা বলি দেহকোষ) প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে, বিভাজিত হচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে, ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে। পাঁচ মাসের শরীর ও পঞ্চাশ বছরের শরীর এক থাকে না। একই ভাবে একই মানুষের পাঁচ মাসের মন, পনেরোর কিশোর মন, পঁচিশের যুবক মন ও পঞ্চাশের প্রৌঢ় মন এক থাকে না। এই মনরূপ আত্মা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়।

মনের বাইরে কোনও আত্মা নেই। মন বা চিত্ত-বিজ্ঞান প্রতিটি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। কোনও কিছু আমাদের আনন্দ দেয়, আবার কোনও ঘটনা দুঃখ। কখনও আমরা ক্রুদ্ধ হই, আবার কখনও বা ভীত। ফলে আমাদের মন বা আত্মাও পরিবর্তিত হচ্ছে।

প্রশ্ন আসতেই পারে—মন বা আত্মা যদি ক্ষণিক হয়, তবে আমাদের অভিজ্ঞতা স্মৃতিরূপে মনে থাকে কী করে? উত্তরে বুদ্ধের মত—বংশের ধারা অনুসারে মা-বাবার কিছু রূপ-গুণ-দোষ সন্তান বা পরবর্তী প্রজন্মে দেখা যায়। তেমনই আমার

পনের বছরের মন তার অভিজ্ঞতাকে উত্তরাধিকার সূত্রে পঞ্চাশ বছরের মনকে দেয়; আর তারই ফল স্মৃতি।

বুদ্ধ জানালেন, আত্মা বা চিত্ত-বিজ্ঞান যেহেতু শরীরেরই গুণ, তাই শরীর বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও বিনাশ ঘটে।

কোনও গ্রন্থকে স্বতঃপ্রমাণ বলে স্বীকার না করা

বহু উপাসনা-ধর্মই নিজেদের ধর্মগ্রন্থকে 'স্বতঃপ্রমাণ' বলে বিশ্বাস করে। 'স্বতঃপ্রমাণ' কথার মানে—প্রশ্নাতীত ভাবে চিরন্তন সত্য বলে মেনে নেওয়া, গ্রন্থে লিখিত প্রতিটি কথাকে প্রমাণ বলে মেনে নেওয়া। কেন এই মেনে নেওয়া? কারণ এইসব ধর্মগ্রন্থগুলো কোনও মানুষের রচিত নয়। ঈশ্বরের দৈববাণী বা ঈশ্বর কথিত।

বুদ্ধের অন্যতম মূল সিদ্ধান্ত হল— কোনও ধর্মগ্রন্থই স্বতঃপ্রমাণ হতে পারে না। সমস্ত দেশে, সমস্ত কালের জন্য ধর্মগ্রন্থের কথা 'সৎ' বা শাশ্বত হতে পারে না। ধর্মগ্রন্থের প্রতিটি কথাকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়ার অর্থ কার্য-কারণ সম্পর্ক খোঁজা থেকে বিরত থাকা।

অর্থাৎ প্রতীত্যসমুৎপাদবাদকে অস্বীকার করা। অবিদ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া। সম্যক দৃষ্টি বা সঠিক জ্ঞান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা। বস্তুত কোনও গ্রন্থের প্রামাণিকতা নির্ধারিত হয় মানুষেরই জ্ঞান-বুদ্ধি, যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা। জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগ ছাড়া কোনও কিছুকে 'প্রমাণিত সত্য', 'প্রমাণিত শাশ্বত' বলে মেনে নেওয়া বিজ্ঞান বিরোধী।

ঈশ্বর যখন অস্তিত্বহীন, তখন ঈশ্বরের দৈববাণী নিয়ে বা ঈশ্বরের কথা নিয়ে ধর্মগ্রন্থ গড়ে উঠেছে, এমন তত্ত্বকে স্বীকার করা যায় না।

আড়াই হাজার বছর আগে ধর্মগ্রন্থগুলোর স্বতঃপ্রমাণ অস্বীকার করেছিলেন বুদ্ধ। কী বিশাল যুক্তিমনস্কতার পরিচয় তিনি সেই সময়ে দিয়েছিলেন, ভাবলে আজও বিস্মিত হতে হয়।

কোনও ধর্মগ্রন্থকে স্বতঃপ্রমাণ বলে মেনে নেওয়ার অর্থ, ওই গ্রন্থে লেখা কোনও বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার কেড়ে নেওয়া। জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে অগ্রগতির যে বিবর্তন আসে, তাকে রোধ করা। যদি গ্যালিলিও বাইবেলের কথাকে স্বতঃপ্রমাণ বলে মেনে নিতেন, তবে তাঁর কাছে পৃথিবী গোল না হয়ে চ্যাপ্টা-ই থাকতো।

গ্যালিলিও প্রমাণ করেছেন, বাইবেল স্বতঃপ্রমাণ কোনও গ্রন্থ নয়। কোপারনিকাস

প্রমাণ করেছেন, বাইবেলের কথা মেনে সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না।

বাইবেল-বেদ-গীতা-কোরান বা অন্য যে কোনও তথাকথিত স্বতঃপ্রমাণ গ্রন্থই বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়ে চলেছে। আড়াই হাজার বছর আগে একজন বুঝেছিলেন, কোনও ধর্মগ্রন্থই স্বতঃপ্রমাণ নয়, ঈশ্বর সৃষ্ট নয়। আড়াই হাজার বছর পরে আমরা একটুও না এগিয়ে আরও পিছিয়ে পড়েছি। 'আমরা' মানে সিংহভাগ তথাকথিত শিক্ষিতরা।

জীবনপ্রবাহকে স্বীকার করা

বুদ্ধের 'জীবনপ্রবাহ তত্ত্ব' ও হিন্দু উপাসনা-ধর্মের 'জন্মান্তরবাদ' এক বিষয় নয়। বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধ ধর্মে নানা বিভাজন এসেছে। হিন্দু ভাববাদী বা বৈদিক ভাববাদী প্রেরণা থেকে 'মহাযান'-এর উদ্ভব। মহাযানপন্থীরা বৌদ্ধধর্মের মূল চার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলো। তারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করলো। বুদ্ধকে প্রথমে দেবতা, পরে সর্বোচ্চ দেবতার পদে বসালো। বুদ্ধের অবস্থান হল স্বর্গে। তিনি হলেন বিভিন্ন দেব-দেবীর উপর প্রভুত্বকারী দেবতা। এলো দেব-দেবীর পূজার বিধান। মুক্তির উপায় হিসেবে অষ্টাঙ্গিক মার্গ (বুদ্ধের আটটি উপদেশ) অনুসরণের প্রয়োজন ফুরলো। মুক্তির উপায় হিসেবে মন্ত্রের ব্যবহার অনুমোদিত হল। তারপর অনুপ্রবেশ ঘটলো হিন্দু উপাসনা-ধর্মের, তন্ত্রের। আত্মার অমরত্ব স্বীকৃতি পেল। এলো জন্মান্তরবাদ। গড়ে উঠলো বুদ্ধের জাতক কাহিনী, যা বুদ্ধের নানা জন্মান্তরের কাহিনী। বুদ্ধের জীবনপ্রবাহবাদকে হিন্দু উপাসনা-ধর্মের জন্মান্তরবাদের সঙ্গে গুলিয়ে দেওয়া হল। অথচ বুদ্ধ কখন-ই আত্মাকে 'নিত্য' বলে স্বীকার করেননি। অনিত্য আত্মার জন্ম নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

বুদ্ধের কথায়—জন্মান্তর বলতে চিরন্তন আত্মার নতুন দেহ ধারণ বোঝায় না। জন্মান্তর অর্থে একটি জীবন থেকে আরও একটি জীবনের উদ্ভবকে বোঝায়, অর্থাৎ জীবনপ্রবাহকে বোঝায়। আমাদের মধ্যে যে চিত্ত-বিজ্ঞান প্রক্রিয়ার প্রবাহ রয়েছে, সেই চিত্ত-বিজ্ঞান প্রক্রিয়াই একটি মানুষের জীবন থেকে আরও একটি নতুন মানুষের জন্মে প্রবাহিত হয়।

জীবনপ্রবাহকে আরও স্পষ্ট করতে বুদ্ধ প্রদীপ শিখার উদাহরণ দিয়েছিলেন। একটি প্রদীপ থেকে যখন আরও একটি প্রদীপ জ্বালানো হয়, তখন প্রথম শিখা থেকে দ্বিতীয় শিখার জন্ম হয়। যদিও দুটি শিখা পৃথক ও স্বতন্ত্র, তবু একটা শিখা থেকে আরও একটা শিখার জন্মের মধ্যে প্রথম শিখার গুণ দ্বিতীয় শিখায় প্রবাহিত হল। তেমনি একটি জীবন থেকেই আরও একটি জীবনের সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে প্রথম জীবনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বা গুণও প্রবাহিত হয় তার সৃষ্ট জীবনে। এই সৃষ্টি ও কিছু বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিক জীবনপ্রবাহ, জীব থেকে জীবের জন্মপ্রবাহ যতদিন থাকবে ততদিন চলবে।

বৌদ্ধ দর্শনের মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন বুদ্ধের এই জীবনপ্রবাহ তত্ত্বকে 'বংশানুক্রমিতা' তত্ত্ব বলে তাঁর বিভিন্ন লেখায় জানিয়েছেন। তাঁর 'বৌদ্ধ দর্শন' গ্রন্থেও জীবনপ্রবাহ প্রসঙ্গে বলেছেন—বিদ্যা-অবিদ্যা, পারিপার্শ্বিক শিক্ষা যেমন মানুষের দোষ-গুণকে পরিচালিত করে, তেমনই

> বংশানুক্রমিতা থেকে মানুষ মেধা-বুদ্ধি, হিংস্রতা ইত্যাদি বহু দোষ-গুণ-অর্জন করে। এই বংশানুক্রমিতাই বৌদ্ধ ধর্মের জীবনপ্রবাহবাদ।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন (জন্ম ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩, মৃত্যু ১৪ এপ্রিল ১৯৬৩) দীর্ঘকাল বৌদ্ধদর্শন নিয়ে গবেষণা ও চর্চা করেছেন। বৌদ্ধধর্মে বস্তুবাদের রূপরেখা দেখতে পেয়েছিলেন। বুদ্ধকে জানতে, তাঁর দর্শনকে জানতে রাহুল তিব্বতি লামার ছদ্মবেশে তিব্বতে হাজির হন—একবার নয়, চারবার। সেখান থেকে গোপনে সংগ্রহ করে আনলেন অতি মূল্যবান বহু পুঁথি, পাণ্ডুলিপি, চিত্রপট ও পুস্তক। দেশ থেকে তিব্বতে চলে যাওয়া এইসব সম্পদ উদ্ধার করে এনেই থেমে থাকলেন না রাহুল। সে সব তিব্বতি ভাষা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে রাহুলের পাণ্ডিত্য নিয়ে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় থেকে দেবীপ্রসা চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত পণ্ডিতেরা। এই কারণেই রাহুলের মতকে আমাদেরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

দার্শনিক জগদীশ্বর সান্যাল তাঁর 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থে লিখছেন,

> "বুদ্ধদেব বলেন, জন্মান্তর বলতে চিরন্তন আত্মার নতুন দেহ ধারণ করা বোঝায় না। জন্মান্তর অর্থে একটি জীবন থেকে আর একটি জীবনের উদ্ভব।"

এরপর বলতেই হয়, বুদ্ধ কখনই হিন্দুত্ববাদীদের মত কিংবা জাতক কাহিনী-মার্কা জন্মান্তরে বিশ্বাস করতেন না।

দুঃখ এই, আমাদের দেশের মানুষ বুদ্ধকে সম্মান জানায় তাঁর মূল আদর্শের জন্য নয়, তাঁর আদর্শকে নিজেদের মনের মত বিকৃত করে নেওয়ার পর।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ

দুঃখ বিনাশের পথ হিসেবে বুদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলেছেন। অষ্টাঙ্গিক মার্গকে তিনটি স্কন্ধে বা বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক : প্রজ্ঞা বা জ্ঞান, দুই : শীল বা সদাচার, তিন : সামাধি বা চিত্তের একাগ্রতা।

প্রজ্ঞা : সম্মা দিট্‌ঠি (সম্যক দৃষ্টি, সঠিক জ্ঞান, যথার্থ দর্শন), সম্মা সংকল্প (যথার্থ

সংকল্প) বলতে বুদ্ধ ক্রোধ-হিংসা-প্রতিহিংসা ত্যাগ করাকেই যথার্থ সংকল্প বলেছেন।

শীল : সম্মা বাচা (যথার্থ বাক্য) বলতে বলেছেন—সত্য এবং প্রিয় ভাষণ দেবে। মিথ্যা ভাষণ, কটু বাক্য, হেতুহীন বা অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বিরত থাকবে।

সম্মা কম্মন্ত (সৎ কর্ম) হিংসা, চুরি, ব্যভিচার না করা।

সম্মা আজীবা (সৎ জীবিকা) দ্বারা জীবন ধারণ ও পরিবার পালন করবে। অসৎ জীবিকা পরিত্যাগ করবে। অসৎ জীবিকা বলতে বুদ্ধ অস্ত্রব্যবসা, প্রাণী-ব্যবসা, মাংস ব্যবসা, মদ্য ব্যবসার উল্লেখ করেছেন। সুদ ব্যবসা ও দেহব্যবসা সেই সময়কার সমাজে প্রচলিত ছিল। এই দুই বিষয়ে বুদ্ধ বিরূপ কিছু বলেননি।

সমাধি : সম্মা বায়াম (যথার্থ ব্যায়াম) বলতে বুদ্ধ দৈহিক ও মানসিক ব্যায়ামের কথা বলেছেন। শারীরিক শ্রম, সু-চিন্তা ভাবনা করা, ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখার উপদেশ দিয়েছেন। কুচিন্তাকে দূরে রাখতে বলেছেন।

সম্মা মতি (সম্যক মনন) বলতে বুদ্ধ মালিন্যহীন মনের কথা বলেছেন। চিত্ত যে ক্ষণস্থায়ী, এই বিজ্ঞানকে মনে রেখে অমলিন ও সুন্দর মনের প্রবাহ বজায় রাখতে উপদেশ দিয়েছেন।

সম্মা সমাধি (যথার্থ ধ্যান) বলতে বুদ্ধ বলছেন—চিত্তের একাগ্রতার নামই সমাধি।

বৌদ্ধ সংঘ

মূলত সংসারত্যাগী মুক্তিকামী মানুষদের নিয়ে বুদ্ধ সংঘ গড়ে তোলেন। সংঘের নিয়ম-কানুনে বুদ্ধ উপজাতি বা ট্রাইবাল সমাজের প্রচলিত প্রথাগুলোকে অনুসরণ করেছিলেন।

উপজাতি সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দুটি প্রথা আছে। এক : বয়ঃসন্ধিকালে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একজনকে সমাজের পূর্ণ সদস্য করা হয়। দুই : বহিরাগত কেউ সমাজের সদস্য হতে গেলে সমাজের সকলের সম্মতির প্রয়োজন হয়। কেউ আপত্তি তুললে সদস্য করা হয় না। বৌদ্ধ সংঘে একই নিয়মের প্রচলন করেছিলেন বুদ্ধ। সংঘে যোগ দিতে চাইলে নাম, ঠিকানা, বয়স, পিতা-মাতার সম্মতির প্রমাণ ও অতীত ইতিহাস ঘোষণা করতে হত। সংঘের সকলের সম্মতি মিললে তাকে দীক্ষান্তে গ্রহণ করা হত। দীক্ষা গ্রহণকারীর বয়স হতে হত অন্তত পনেরো বছর। কোনও বিবাহিতা রমণী সংঘের সদস্য হতে চাইলে তার স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন হত।

আদিম কিছু উপজাতি সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু নেই। তেমনই সংঘ সদস্যের কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। দিনে একবার খাবার খেতেন। বিশেষ কোনও খাবারের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিল। পোশাক বলতে হলুদ রঙে ছোপানো তিন টুকরো কাপড়। সঙ্গে ওষুধ রাখতে পারতেন ভিক্ষুরা। যে গ্রামেই ভিক্ষুরা থাকুন না কেন, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় তাঁকে নিজের সংঘের সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হতে হত।

সংঘ পরিচালিত হত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। সংঘ-প্রধান নির্বাচিত হতেন। উত্তরাধিকারী নিয়োগ নিষিদ্ধ ছিল। কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন হলে তা সকলের উপস্থিতিতেই হত। সমবেত জীবনচর্যা ও গণতন্ত্র ছিল সংঘের বৈশিষ্ট্য। বিশিষ্ট ভাষাবিদ অসিত চক্রবর্তীর কথায়

"আধুনিক সমাজকে নিয়ন্ত্রণের সূক্ষ্ম হাতিয়ার যে পার্টি,
তার ভ্রূণ রয়েছে বৌদ্ধ সংঘে।"

ত্রিপিটক

বুদ্ধ নিজে কোনও গ্রন্থ রচনা করেননি। তাঁর মৃত্যুর পরে কিছু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তিনটি 'পিটক' বা পেটি রচনা করেছিলেন। তিনটির একত্রিত নাম ত্রিপিটক। পিটক তিনটি হল (১) বিনয়পিটক। এতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচরণ সংক্রান্ত কিছু নির্দেশ আছে। (২) সূত্তপিটক, এর আবার পাঁচটি ভাগ—(ক) দীর্ঘনিকায়, (খ) মঝ্ঝিম নিকায়, (গ) সংযুক্ত নিকায়, এতে আছে বুদ্ধের জাতক কাহিনী, (ঘ) অঙ্গুত্তর নিকায়, (ঙ) খুদ্দক নিকায়, (৩) অভিধম্মপিটক। এতে আছে দার্শনিক আলোচনা।

ত্রিপিটককে বুদ্ধের বাণী বা কাহিনী বলতে রাজি নন প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল বৌদ্ধরা। বিভিন্ন শিলালেখ ও আকর গ্রন্থ থেকে বুদ্ধের নানা উপদেশ নীতি এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনায় গিয়েছি। তা থেকে এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ত্রিপটকের অনেক কথাই মহাযানপন্থীদের কথা, অর্থাৎ বুদ্ধমত-বিরোধী কথা।

বৌদ্ধধর্মে বিভাজন

বুদ্ধের মৃত্যুর পর সংঘগুলোর মধ্যে বিভেদ শুরু হতে থাকে। প্রাচীনপন্থী বৌদ্ধদের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদী বৌদ্ধদের বিভেদ একটু একটু করে বাড়তে থাকে। বৌদ্ধ সাহিত্যগুলোতেও তার প্রতিফলন ঘটতে থাকে।

প্রাচীনপন্থীরা বা হীনযানপন্থীরা দাবি করেন, তাঁরাই বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত চিন্তাধারাকে অবিকৃতভাবে ধরে রেখেছেন। সে দাবিকে অবশ্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

**হীনযানপন্থীরা মনে করেন—বুদ্ধ একজন মানুষ ছিলেন। তিনি
বহুগুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তাঁর মানবিক দুর্বলতাও
ছিল, যেমন অসহিষ্ণুতা, রোগকাতরতা
(চাতুমা-সুত্ত, সেখ-সুত্ত)
ইত্যাদি।**

এক সময় প্রাচীনপন্থীরা সাতটি উপদলে ভাগ হয়ে যায়। মহাযানপন্থীরাও তাদের বিভাজন ঠেকাতে পারেনি। তারা আঠেরোটি সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে যায়।

হীনযানপন্থীরা রইলেন বুদ্ধের নীতি নিয়ে। মহাযানপন্থীরা আবদ্ধ রইলেন বুদ্ধকে

ঈশ্বর বানিয়ে পুজো করার মধ্যে। সঙ্গে যুক্ত করলেন তন্ত্র-সাধনা। মহাযানপন্থীদের হাতে শুরু হলো বৌদ্ধ ধর্মের অবক্ষয়।

নির্বাণ

'নির্বাণ' মানে 'নিভে যাওয়া'। যেমন প্রদীপের আগুন জ্বলতে জ্বলতে নিভে যাওয়া। বৌদ্ধ ধর্মে 'নির্বাণ' শব্দটির গুরুত্ব খুবই বেশি। বুদ্ধ 'নির্বাণ' বলতে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, এই নিয়ে পরবর্তী কালে বৌদ্ধদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা দেয়। এর কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের উপর বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রভাব। 'নির্বাণ' প্রসঙ্গে আমরা প্রধান তিনটি মত নিয়ে আলোচনা করবো।

এক : বুদ্ধের মতে জীবনে দুঃখ আছে, দুঃখ নিবারণের বা নির্বাপনের পথও আছে। দুঃখের পরিসমাপ্তির নামই 'নির্বাণ'। বুদ্ধের মতে চার 'আর্যসত্য' বা মৌলিকসত্য হলো (১) দুঃখ, (২) দুঃখের কারণ, (৩) দুঃখের কারণ বিনাশের উপায়, (৪) বিনাশ।

এই চার আর্যসত্য বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম মূল কথা। এই মূল কথা মেনে নিলে আমরা বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে পারি যে—দুঃখের বিনাশই 'নির্বাণ'।

দুই : 'চিরবিলুপ্তি'। বৌদ্ধ দার্শনিক হিসেবে নাগসেন অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত একটি নাম। নাগসেনের জন্ম আনুমানিক ১৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। মগধে নন্দ যখন রাজত্ব করছেন, সেই সময় আলেকজান্ডার গান্ধার (বর্তমান নাম পাঞ্জাব) অঞ্চল আক্রমণ করেন ও দখল করেন। ফলে গান্ধার অঞ্চলে লাখখানেক গ্রিক বসবাস শুরু করেন। এঁদের মধ্যে সেনা-ভাস্কর-শিল্পী-ব্যবসায়ী ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার মানুষ ছিলেন। ভারতবর্ষে বসবাসকারী গ্রীকদের সঙ্গে রাজধর্ম বৌদ্ধধর্মের মত বিনিময়ের সুযোগ ছিল। এবং মত বিনিময় হত। গ্রিক ভাস্কররাই বুদ্ধকে কল্পনা করে নিজেদের শৈলীতে সৃষ্টি করেছিলেন পাথর খোদাই বুদ্ধ মূর্তি। পাশাপাশি ভারতীয় দর্শনের ওপর গ্রিক দার্শনিকদের প্রভাব পড়েছিল। 'যবন' বা 'ম্লেচ্ছ' বলে হিন্দুধর্মের মানুষরা গ্রিকদের এড়িয়ে চলতো। বৌদ্ধরাই ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে যবন গ্রিকদের ভাবধারা বিনিময়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল।

নাগসেনের জন্ম হয়েছিল শিয়ালকোটের কাছে। যবন রাজা মিনান্দর বা মিলিন্দ-এর রাজ্যের একটি রাজধানী ছিল শিয়ালকোট। মিনান্দর ছিলেন তার্কিক। ভালোবাসতেন শাস্ত্রচর্চা। মিনান্দর প্রকাশ্য সভায় বহু বৌদ্ধ শ্রমণদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত

করে তুলতেন। বৌদ্ধ সংঘের অনুরোধে নাগসেন শিয়ালকোটের অসংখ্যের সংঘে হাজির হন ও মিনান্দরের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মিনান্দর ৫০০ অমাত্য নিয়ে অসংখেয় মঠে হাজির হন। তাঁদের এই আলোচনা 'মিলিন্দ প্রশ্ন' (অনুবাদক : ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপ) থেকে জানা যায়। 'মিনিন্দ পঞ্‌হ্' বা 'মিলিন্দ প্রশ্ন'-তে 'নির্বাণ' প্রসঙ্গ এসেছে। নাগসেন ও মিলিন্দ-র প্রশ্ন ও উত্তরের কিছু নমুনা এখানে তুলে দিলাম।

মিলিন্দ—প্রভু নিরোধ হওয়াকেই কি নির্মাণ বলে?

নাগসেন—হ্যাঁ মহারাজ। ...জ্ঞানী ব্যক্তি....বিষয় তৃষ্ণায় ও ভোগে লিপ্ত হন না ('জ্ঞানী' অর্থে যিনি অবিদ্যাকে দূর করেছেন)। ভোগের তৃষ্ণা তাঁরা নিরোধ করতে পারেন। সকল দুঃখই রুদ্ধ হয়ে যায়। মহারাজ। এই ধরনের নিরুদ্ধ হওয়াকেই নির্বাণ বলে।

মিলিন্দ—(বুদ্ধ, কোথায় আছেন?

নাগসেন—মহারাজ! তিনি পরম নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন, যার পরে তাঁর ব্যক্তিত্বকে তৈরি রাখার মত আর কিছুই থাকতে পারে না....

মিলিন্দ—প্রভু! উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

নাগসেন—মহারাজ! নির্বাপিত অগ্নিশিখা কি আর দেখা যায়?

মিলিন্দ—না প্রভু! সে শিখা তো নির্বাপিত।

'নির্বাণ' অর্থে নাগসেন বিষয় তৃষ্ণা ও অবিদ্যার চির-বিনাশকে শুধু বোঝাননি, দেহেরও চির-বিলুপ্তির কথা বলেছেন।

নির্বাণেই সব শেষ। গৌতম প্রায় ৩৫ বছর বয়সে নিজের দুঃখময় জগৎ থেকে নির্বাণ লাভ করে বুদ্ধ হয়েছিলেন। বুদ্ধ নির্বাণ লাভের পরেও দীর্ঘ বছর বেঁচে ছিলেন। এ থেকে আমরা ধরে নিতে পারি—বুদ্ধ 'নির্বাণ' অর্থে চিরবিলুপ্তি বোঝাননি।

তিন : আনন্দময় অবস্থাই 'নির্বাণ'—এমনটাই মনে করেন মহাযানপন্থী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধরা। মহাযান বৌদ্ধধর্মে স্থানীয় অসংখ্য দেবদেবীর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। ফলে বৌদ্ধধর্মে বড় রকমের গুণগত পরিবর্তন ঘটেছিল। যে বুদ্ধ ছিলেন যুক্তিবাদী, নিরীশ্বরবাদী সেই বুদ্ধের ধর্মে যুক্ত হল বহু দেব-দেবীর পুজো, কার্য-কারণ সম্পর্কহীন (প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ বিরোধী) অলৌকিক বিশ্বাস। গৃহীত হল যৌন-আচারমূলক তন্ত্র-সাধন পদ্ধতি। বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'গুহ্যসমাজ' বা তথাগত গুহ্যক ও 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প'। এতে মাংস, মুদ্রা (বিভিন্ন মৈথুন-ভঙ্গি) ও মৈথুনকে সাধনার অঙ্গ বলা হয়েছে। বুদ্ধের সঙ্গে নানা দেবীর মৈথুন বর্ণনা বৌদ্ধ তন্ত্রে আছে।

মহাযানপন্থীদের বৌদ্ধ তন্ত্র অনুসারে দীর্ঘস্থায়ী মৈথুনের মধ্যে-ই শুধু পাওয়া যায় অপার আনন্দ অনুভূতি, তখন সমস্ত মানসিক ক্রিয়া হারিয়ে ফেলে মানুষ। মিলনের এই অপারে আনন্দই হচ্ছে 'নির্বাণ'।

বুদ্ধের মূল সিদ্ধান্ত ও উপদেশকে উড়িয়ে দিয়ে ধর্মের নামে 'নির্বাণ' প্রসঙ্গে নাগসেনের দেওয়া সংজ্ঞা ও মহাযানপন্থীদের দেওয়া সংজ্ঞাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। বরং আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, মহাযানপন্থীদের পরিবর্তিত বৌদ্ধ ধর্ম স্পষ্টতই বুদ্ধ বিরোধী। তাদের 'নির্বাণ' সংজ্ঞা হিন্দু তন্ত্রের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে প্রভাবিত। আর নাগসেনের মতামত বুদ্ধের মত থেকে সামান্য সরে আসা।

আমরা 'নির্বাণ' শব্দটির সংজ্ঞা হিসেবে প্রথমটিকেই গ্রহণ করবো।

'নির্বাণ'—অস্তিত্বের নাশ নয়। 'নির্বাণ' বলতে মৈথুনে ডুবে থাকার ভণ্ডামী নয়। সিদ্ধার্থ গৌতম 'নির্বাণ' লাভ করে 'বুদ্ধ' হয়েছিলেন এই তথ্যই প্রমাণ করে 'নির্বাণ' মানে, দুঃখের বিনাশ।

বর্তমানে বুদ্ধ বিরোধী মহাযানপন্থার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে তিব্বত, চিন, জাপানে। ভারতে বৌদ্ধদের সংখ্যা কম। এ'দেশের বৌদ্ধদের মধ্যে মহাযানপন্থীদের সংখ্যাই বেশি। ফলে এ সব দেশে নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধ ঈশ্বর রূপে পূজিত হচ্ছেন।

হীনযানের প্রসার ঘটেছে শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যান্ডে, এ'সব দেশে বৌদ্ধধর্ম কিছুটা হলেও বুদ্ধের মতাদর্শ রক্ষা করতে পেরেছে।

হীনযান ও মহাযানপন্থীরা বর্তমানে নানা ভাগে বিভক্ত। নতুন নতুন বিশ্বাস ও ভাবধারার অনুপ্রবেশের জন্যেই এত বিভাজন।

বৌদ্ধ দর্শনের ওপর নির্ভর করে, নানা বিভাজিত বুদ্ধের মতবাদের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস-ধর্মগ্রন্থের সংখ্যা এতই বিপুল যে, কারও পক্ষেই এক জীবনে পড়ে ওঠা সম্ভব নয়।

বুদ্ধকে বিকৃত করার খেলায় শামিল অনেকেই :

ভারতের তথাকথিত কিছু অতি বিশিষ্ট দার্শনিক ও ঐতিহাসিক জেনে বুঝে-ই বুদ্ধকে নিজের মন-মত ছাঁচে ঢালতে চাইছেন। জেনে-বুঝে সত্যকে বিকৃত করার খেলায় মেতেছেন। উচ্চবর্ণের হিন্দু দার্শনিক ও ঐতিহাসিকদের অনেকেই বুদ্ধকে আরও বড় করে দেখাতে গিয়ে দাস মালিকদের পক্ষে বুদ্ধের সরবতা বিষয়ে চোখ-কান বুজে থেকেছেন। বুদ্ধের সময়কার সমাজে ব্যাপক ক্রীতদাস প্রথা ছিল, ভয়ংকর দারিদ্র্য ছিল। অত্যন্ত চড়া সুদে ঋণ দিতেন শ্রেষ্ঠী, বণিক, ধনী সম্প্রদায়। ঋণে জামিন হিসেবে সম্পত্তি না রাখতে পারলে বউ, বোন বাঁধা রাখতে হত

ঋণদাতার কাছে। এই মহিলাদের শ্রমের সঙ্গে দেহ দিতে হত। এরপর ঋণ শোধ না হলে ঋণগ্রহীতাকে দাস থাকতে হতো ঋণদাতার কাছে। দারিদ্র্য ও দাসত্বের এই যন্ত্রণা ও দুঃখ ছিল ভয়ংকর। শ্রমজীবী শূদ্রদের জীবনও ছিল বিভীষিকাময়। দিন থেকে রাত কঠোর শ্রমের বিনিময়ে এক বেলা উচ্ছিষ্ট খাবার মিলতো। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোতে যাদের শূদ্র বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, বৌদ্ধ গ্রন্থে তারাই চণ্ডাল, নেসাদ, পুক্কুস নামে পরিচিত। পরিচয় পাল্টালেও ধনী মহাজনদের উৎপীড়ন একই রইলো।

শোষক-শাসক বা রাষ্ট্র গ্রাম থেকে সম্পদ সংগ্রহ করতো চার ভাবে। (১) উৎপন্ন ফসলের উপর কর (২) বাধ্যতামূলক শ্রম বা বেগার খাটা (৩) রাজার জন্য ফসলের অংশ সংগ্রহ (৪) রাজাকে দেওয়া আবশ্যিক কর। এই কর আদায় ছিল নিষ্ঠুর অত্যাচারমূলক। শারীরিক নির্যাতন, সম্পত্তি লুণ্ঠন, ঘার-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, নারীদের উপর অত্যাচার—কিনা হত! এই অত্যাচারের শিকার শুধু গ্রামের কৃষকরা হত না, অন্যান্য বৃত্তিজীবী যেমন কুট্টক (ছুতোর), কর্মার (কামার), মোদক (মাটি কাটার শ্রমিক), কুম্ভকার, রজ্জুবর্তব (দড়ি শ্রমিক)-রাও উৎপীড়িত হত। বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত মহাজনদে ঋণের বোঝা তো ছিলই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পাচ্ছি, মৌর্য সাম্রাজ্যে সুদের হার ছিল শতকরা বার্ষিক ২৪০ মুদ্রা। পরে তা অর্ধেক করা হয়েছিল।

এই সামাজিক পরিস্থিতিতে দেখা যেত, কোনও ঋণগ্রহীতা যদি বুঝতে পারতো, তার পক্ষে ঋণ শোধ করা অসম্ভব, তখন ক্রীতদাস জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে যেতো। এর ফলে শ্রেষ্ঠী ও মহাজনদের মধ্যে বুদ্ধের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমে ওঠে। অবস্থা সামাল দিতে বুদ্ধ ঘোষণা করেন, "ঋণী ব্যক্তিকে প্রবজ্যা (ভিক্ষু হতে দীক্ষা) দেওয়া অনুচিত।" (মহাবগ্‌গ ১৩/৪/৮ ও বিনয়পিটক)

ক্রীতদাসরা তাদের দাসত্ব জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা এড়াতে ভিক্ষু হতে শুরু করেন। দাস মালিকরা বুদ্ধের উপর ক্ষুব্ধ হলেন। দাস-মালিকদের রাগ থামাতে বুদ্ধ আবার ঘোষণা করলেন "ক্রীতদাসদের জন্য প্রবজ্যা অনুচিত।" (মহাবগ্‌গ ১/৩/৪/৯) জেনে রাখা ভালো, বৌদ্ধ সংঘে ক্রীতদাসরা শ্রম বিনিয়োগ করতো খাবারের বিনিময়ে।

মগধ সম্রাট বিম্বিসারের বহু সেনা যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করে বৌদ্ধ ভিক্ষু হতে শুরু করে। বিম্বিসারের রাজশক্তি সেনা নির্ভর। সুতরাং বুদ্ধ ধর্মের অনুগামী বিম্বিসারের বুদ্ধের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা গেল উবে। তিনি রাজসভায় মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শের পর ঘোষণা করলেন, সেনাদের ভিক্ষু হিসেবে দীক্ষা দিলে বৌদ্ধ গণ বা সংঘ অবিলম্বে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হবে। বৌদ্ধ ধর্মগুরুর শিরোচ্ছেদ করা হবে। বিম্বিসারের ক্রোধ থেকে বাঁচতে ও সংঘকে বাঁচাতে বুদ্ধ আর এক দফা ঘোষণায় জানালেন, "রাজসৈনিকদের প্রবজ্যা অনুচিত।" (মহবগ্‌গ ১/৩/৪/২, বিনয়পিটক)

শ্রেণীগতভাবে বুদ্ধ গোষ্ঠীপতি ধনী পরিবারের সন্তান। সেভাবেই বড় হয়েছেন।

গরীবদের বাস্তব জীবনের চরম দারিদ্র ও দুঃখের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। দুঃখকে তিনি অনুভব করেছিলেন বৃদ্ধ, অসুস্থ ও মৃত্যু দেখে। এই দেখে তিনি মানসিক আঘাত পেয়েছেন। দুঃখের কারণ খুঁজতে গিয়ে তিনি তৃষ্ণা ও অবিদ্যাকে দায়ী করেছেন। এ সব-ই পুরোন কথা। দুঃখকে জয় করতে কিছু শীল বা নীতি পালনের উপদেশ দিয়েছেন। এ'নিয়েও আমরা আগে আলোচনা করেছি। কিন্তু যে'কথা গভীর ভাবে বলা দরকার, সেটা বোধহয় কিছুটা অ-বলাই থেকে গেছে।

শ্রমজীবী বা ক্রীতদাস পরিবারে জন্মালে বুদ্ধ উচ্চবর্ণের শোষণ ও অত্যাচার প্রতিটি দিক অনুভব করতে পারতেন। অত্যাচারের কারণগুলো, দুঃখের কারণগুলো তাঁর কাছে অন্যভাবে ধরা পড়তো। তৃষ্ণা ও অবিদ্যার সঙ্গে অত্যন্ত শোষণ ও উৎপীড়নকেও দায়ী করতেন।

কিন্তু ধরা পড়েনি। অথবা পরিব্রাজক জীবনে ও ধর্মগুরু হয়ে যখন সাধারণের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেলেন, তখন দুঃখের প্রকৃত কারণ তাঁর কাছে ধরা পড়েছে। কিন্তু রাজতন্ত্র ও সামন্ত্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে করার বা বলার মত কোনও বাস্তব অবস্থা ছিল না। শোষক-শাসক-রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতা করার চিন্তা ছিল আত্মহননের নামান্তর। ফলে তাঁকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপস করতে হয়েছিল।

বুদ্ধের যুগে-ই বণিকশ্রেণী জাতে ওঠে। তাদের রমরমা বাড়ে। বৈদিক যুগে বা ব্রাহ্মণদের বোলবোলাওয়ের যুগে বণিক বা শ্রেষ্ঠী শ্রেণীকে 'বৈশ্য' বলা হ'ত। তারা ছিল উচ্চবর্ণের সমাজে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক। বুদ্ধ এই উঠে আসা নতুন শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে যে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ মেলে 'বৌদ্ধ সুত্তনিপাত' গ্রন্থে। গ্রন্থটিতে একটি নিষেধের তালিকা আছে। এই তালিকা অনুসারে দেখা যাচ্ছে, ক্রীতদাস প্রথা, সুদ আদায়ের নামে ক্রীতদাস তৈরির ফাঁদ, বণিকশ্রেণীর চিত্ত বিনোদনের জন্য গণিকাবৃত্তি নিন্দিত হয়নি। বণিক সমাজের স্বার্থেই নিন্দিত হয়নি, বরং ঋণ শোধ না করা, দাসত্ব থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে পালিয়ে যাওয়াকে অন্যায় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বুদ্ধের পশু হত্যার বিরোধিতা বণিকশ্রেণীর স্বার্থকেই রক্ষা করেছিল, কারণ ওই সময় সম্পদ হিসেবে পশুকে গণ্য করা হত।

সব মিলিয়ে বৌদ্ধ ধর্মকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক, বণিক-মহাজন, রাজশক্তি তাদের সহায়ক শক্তি বলে মনে করেছিল। ফলে শ্রেষ্ঠী থেকে সম্রাট প্রত্যেকেই উদার হতে স্বর্ণ মুদ্রার ঢের লাগিয়ে দিয়েছিল, উদ্যান দিয়েছিল, সংঘ তৈরি করে দিয়েছিল, উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছিল প্রচুর ক্রীতদাস। বৌদ্ধ ধর্ম হয়ে পড়েছিল রাজধর্ম, উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্তের ধর্ম। যদিও এ'কথাও ঠিক যে, শোষিত শূদ্ররাও

বৌদ্ধ ধর্মকে গ্রহণ করে ঘৃণ্য জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

উচ্চবর্ণের ভারতীয় দার্শনিক ও ঐতিহাসিকরা বুদ্ধকে উপজাতীয় থেকে ক্ষত্রিয় বানিয়ে ছেড়েছেন। শুদ্ধোদনকে বানালেন রাজা। অথচ বুদ্ধের সময়কার ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের মানুষদের কাছে বুদ্ধ ছিলেন নীচবংশীয় মানুষ।

বিভিন্ন পালি গ্রন্থে বুদ্ধকে 'বৃষল' বা 'নীচজাতীয়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজা থেকে বণিকরা যখন বুদ্ধকে ধর্ম-গুরু হিসেবে গ্রহণ করলো, তখন তাদের আত্মসম্মানের স্বার্থে বুদ্ধকে রাজা বলে ঘোষণা করেন।

পরের পর্যায়ে তাঁকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার, তারপর ভগবানেরও ভগবান বানানো হল। নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধ ঈশ্বর হয়ে গেলেন। আমরা ভারতীয়রা ব্রাহ্মণ্যবাদী দার্শনিকদের চেপে যাওয়া তথ্য ও ছাপা তথ্যের দ্বারা বুদ্ধকে ততটাই জানলাম, যতটা তাঁরা জানালেন আমাদের বুদ্ধ বানাতে।

সময় বিশ্লেষণ এড়িয়ে বুদ্ধের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ করলে তা হবে অবাস্তব, অসার। কোন সময়ে বুদ্ধ এসেছিলেন? একটু ফিরে দেখা যাক। সে সময় রাজশক্তি ছিল ভয়ংকর নিষ্ঠুর, উশৃঙ্খল, খামখেয়ালী চেহারার। কোশল রাজশক্তি বুদ্ধের চোখের সামনেই তাঁর জাতিগোষ্ঠী শাক্যদের নির্বিশেষে হত্যা করেছে। শিশু-নারী-বৃদ্ধ কেউই রেহাই পায়নি।

বুদ্ধের চোখের সামনেই মগধরাজ অজাতশত্রুর আক্রমণে বিদেহ, জ্ঞাতৃক, লিচ্ছবি ও বৃজি উপজাতিরা ধ্বংস হয়ে গেল। বৃজি সাধারণতন্ত্রের সভাপতি চেটক (মহাবীর জৈন-এর মামা) পরাজিত হয়ে আত্মহত্যা করলেন। হত্যা তখন বীরত্বের প্রতীক। পরাজিত রাজ্যে লুণ্ঠন ও ধর্ষণ ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। তখন পাপ-পুণ্য, উচিত-অনুচিত বিচার করা, বা এই বিষয়ে কিছু বলা পাগলামো ছাড়া কিছু নয়। রাজার কথায় ঘাড় নেড়ে সায় না দিলে ঘাড়ে মাথা থাকা সম্ভব নয়। এমন এক ভয়ংকর, ভয়াবহ সময়ে গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর জৈনের আবির্ভাব। সেই সময়কার হত্যা, রক্তপাত, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগের ব্যাপকতায় অনেক চিন্তাবিদ হতবুদ্ধি ও বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। জৈন চিন্তাবিদ গোশাল মংখলিপুত্ত এত বর্বর হিংস্রতা দেখে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। সমসাময়িক চিন্তানায়ক ও ধর্মগুরু পূরণ কস্সপ, পকুধ কচ্চায়ন, অজিত কেশকম্বলী, সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত সেই সময়কার রক্তক্ষয়ী অবস্থা দেখে নিরাশ হয়েছিলেন, স্তম্ভিত হয়েছিলেন। তাঁদের মনে হয়েছিল, সমাজে ন্যায়বোধ ও অহিংসার প্রতিষ্ঠা, লোভের অবসান ঘটানো বাস্তবে সাধ্যাতীত। রাজশক্তির অনিবার্য লোভ, ক্রোধ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, ভোগতৃষ্ণা রোধ করা অসম্ভব। মত্তশক্তিধর, খামখেয়ালি রাজশক্তির বিরুদ্ধে কথা বলার অর্থ নিজের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করা।

এমন এক সময়ে দাঁড়িয়ে বুদ্ধের পক্ষে রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতা করার অর্থ অনিবার্য মৃত্যুকে ডেকে আনা। তাই তিনি রাজশক্তির রোষ থেকে বাঁচতে ঋণগ্রহীতা দাস ও সেনাদের ভিক্ষু করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। চেতনার ও যুক্তিবাদের বিপ্লব ঘটিয়ে ছিলেন যে মানুষটি, তাঁর বেঁচে থাকাটা সংস্কৃতির প্রগতির জন্যেই অত্যন্ত জরুরি ছিল। অতি-বিপ্লবীপনা দেখাতে গিয়ে তিনি যে কোনও হঠকারি সিদ্ধান্ত নেননি, রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে প্রয়োজনীয় আপস করে কৌশলগত ভাবে ঠিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন—এ বিষয়ে সন্দেহর কোনও অবকাশ নেই।

অনেক আগুন খাওয়া বুদ্ধিজীবীদের ডিগবাজি খাওয়ার খেলা দেখার সুযোগ আমাদের এনে দিল ২০০২ সাল। 'নকশাল' বলে কয়েকজনকে ধরে একটা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের হাল্কা বাতাবরণ তৈরি করতেই গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্রের সংকেত পাঠোদ্ধার করে যে যার খোপে ফিরে গেছেন। গণতন্ত্রেই এই! ভয়ংকর রাজতন্ত্রের যুগে তাঁদের তবে ভূমিকা কী হত? এইসব ভণ্ড, ডরপুক বুদ্ধিজীবীরা যখন বুদ্ধের শ্রেণীবদ্ধতার কথা বলেন, তাঁর আপোসকামীতার কথা বলেন, তখন এইসব নোংরা চরিত্রগুলোকে দেখে ঘৃণায় গা গুলিয়ে বমি আসে। সত্যিই আসে।

ক্রীতদাস প্রথা খারাপ—এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তারপরও এই ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশে ক্রীতদাস প্রথা এখনও প্রচলিত রয়েছে। এ'সব ক্রীতদাসরা পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় কাজ করে পাথরের খাদান থেকে চাষের জমিতে। এরা ঋণ শোধ করতে পারেনি। অথবা বাবা ঋণ শোধ না করে মারা যাওয়ায় ক্রীতদাস জীবনের যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে। দিনে এক বেলা খাওয়া, আঠারো ঘণ্টা কাজ। কাজ শেষে খোঁয়াড়ে ফিরে যাওয়া। এ'ছবি আমরা টিভিতে অনেকবার দেখেছি। নামী ইংরেজি সাপ্তাহিকে পড়েছি। পাতা-জোড়া ঝকঝকে ছবি দেখেছি—শিকল বাঁধা দাস কাজ করছে। সরকার-প্রশাসন-পুলিশ সব জেনেও আশ্চর্য নীরব! নীরব আমরা প্রত্যেকে, এমন কী বুদ্ধের সমালোচকরাও। সত্যিই কী বিচিত্র এই দেশ!

আমাদের বাড়িতে দাস-দাসী থাকে। বড়লোকদের বাড়িতে আরও বেশি বেশি করে থাকে। হাজার বছর পরে এ'জন্য আমরা নিন্দিত হবো না তো? দাস-দাসীদের কাজ নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে বুদ্ধের সমালোচনা করলে সেটা অনেক আন্তরিক হত।

গণিকাবৃত্তির বিপক্ষে বুদ্ধ মুখ খোলেননি। বণিকদের স্বার্থেই খোলেননি। কথাটা সত্যি। আরও একটা সত্যি কথা শোনাই আপনাদের। বর্তমানে এ'দেশে গণিকাবৃত্তিকে আইনি করার পক্ষে সোচ্চার হওয়া সংগঠন ও ব্যক্তির অভাব নেই। অজস্র 'প্রগতিশীল' সংগঠন, বিদেশি অর্থপুষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, 'বিপ্লবী' রাজনৈতিক পার্টি গণিকাবৃত্তিকে আইনি করার আন্দোলনে শামিল। দেহ-ব্যবসাকে আইনি করতে চাওয়ার পিছনের কারণটি হল—মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বিদেশি কর্তারা যেন

আইনি ভাবে এ'দেশের মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি করতে পারে। গণিকাবৃত্তি প্রসঙ্গে বুদ্ধ নীরব ছিলেন। তবু তিনি ধিকৃত হচ্ছেন। ধিকৃত হচ্ছেন না গণিকাবৃত্তির পক্ষে দাঁড়ানো বুদ্ধিজীবী, পার্টি, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন! কেন? কেন?

বুদ্ধ তাঁর সময়ে দাঁড়িয়ে যা করতে পারতেন, তাই করেছেন। তিনি নতুন নতুন যুক্তি, হাজার হাজার বছরের এগিয়ে থাকা যুক্তির কথা আমাদের শুনিয়েছেন। যুক্তি চর্চার সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। বুদ্ধের মূল চারটি সিদ্ধান্ত কী অসাধারণ রকমের আধুনিক— ভাবাই যায় না।

নিরীশ্বরবাদও কোনও ধর্মগ্রন্থকে স্বতঃপ্রমাণ হিসেবে না মানতে বুদ্ধই প্রথম শেখালেন। বুদ্ধ-ই প্রথম বললেন প্রতিটি ঘটনার পিছনে কারণ রয়েছে। আড়াই হাজার বছর পরে আজ সারা ভারতে চিরুনি তল্লাশি চালালেও বুদ্ধের মত যুক্তিবাদী মানুষ এক'শো ছাড়াবে কিনা সন্দেহ আছে। যুক্তিবাদী আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে কম তো ঘোরা হলো না, বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদের হাতে গ্রহরত্ন, আর জামার হাতার আড়ালে লুকোন তাগা-তাবিজও কম দেখা হল না। ধর্মে ও যুক্তিবাদে বিচরণকারী ভণ্ড দেখতে দেখতে মনে হয়, কাকে বলবো 'কালের সীমাবদ্ধতা', কাকে বলবো 'শ্রেণীর সীমাবদ্ধতা', কাকে বলবো 'ভণ্ডামী'? ভাষাতত্ত্ববিদ অসিত চক্রবর্তী বুদ্ধের কালবদ্ধতার জন্য তাঁর গায়ে, প্রতিবিপ্লবীর তক্‌মা মেরে দিয়েছেন। অসিত চক্রবর্তী মশাইকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে—আঙুলে গ্রহরত্নের আংটি পরে, নিয়তিবাদের কাছে নতজানু হয়ে আপনি কোন বিপ্লবটা করতে চাইছেন? শুধু 'চোখে আঙুল দাদা' হয়ে থাকলে চলবে?

বৌদ্ধ যুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চারুকলা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, যৌনবিজ্ঞান সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিশাল রকমের উন্নতি ঘটিয়েছিল। এই উন্নতির মান এতটাই 'ক্লাসিকাল' ছিল যে, পরবর্তী সময়ে সুদীর্ঘ কাল ধরে তা আদর্শ ও অনুসরণযোগ্য বলে গৃহীত হয়েছিল। চরক, সুশ্রুত, নাগার্জুন, ভাস্করাচার্য, বাৎসায়ন, কৌটিল্য, পাণিনি, অশ্বঘোষ প্রমুখ মননশীল পণ্ডিতরা বৌদ্ধ বা বৌদ্ধভাবাশ্রয়ী। বৌদ্ধ যুগে একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল।

গ্রিক, কুষাণ, শক রাজাদের সমর্থন কেন

বৌদ্ধ ধর্ম বিভিন্ন রাজাদের সমর্থন ও আর্থিক সাহায্য পেয়েছিল। এমন সাহায্য পাওয়ার জন্য কেউ কেউ বৌদ্ধধর্মকে 'প্রতিক্রিয়াশীল ধর্ম' 'রাজশক্তির ধর্ম' বলে চিহ্নিত করে থাকেন। সত্যিই এটা একটা জরুরি প্রশ্ন — কেন গ্রিক, কুষাণ, শক রাজারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন?

হিন্দু উপাসনা-ধর্মে ধর্মান্তর ছিল অত্যন্ত কঠিন। সাধারণত জন্মগত ভাবেই একজন হিন্দু হয়। হিন্দু ধর্মের বর্ণ প্রথা এতটাই প্রবল ছিল যে, বর্ণপ্রথা বাদ দিয়ে হিন্দু ধর্মকে ভাবাই যেত না। কোনও পুরুষ নিচু বর্ণের কোনও নারীকে বিয়ে করলেই নারী উঁচু বর্ণে স্থান পেত না। এমনকী, তার সন্তানরাও মনুর ধর্মীয় আইন অনুসারে বহুভাবে বঞ্চিত হত। স্ত্রী রক্ষিতার বেশি মর্যাদা পেত না।

বিদেশ থেকে যে'সব রাজারা এ'দেশে প্রবেশ করেছিলেন, রাজ্য শাসন করেছিলেন, তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছে ছিল এ'দেশেরই একজন হওয়ার। এ'দেশের মেয়েদের বিয়ে করে ঘর বসাবার। হিন্দু ধর্মের ছড়ি যাদের হাতে, তাদের একটা সমস্যা ছিল। এইসব বিদেশি রাজা আর তাদের সেনাদের কোন বর্ণের খোপে ঢোকাবে? কারণ বর্ণ তো জন্মগত ব্যাপার!

ভারতবর্ষে তখন বৌদ্ধ ধর্ম রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম উদার। জাত- পাত-বর্ণ নেই। সবাইকে গ্রহণ করতে হাত বাড়িয়েই রয়েছে। এই অবস্থায় বিদেশ থেকে আগত রাজশক্তি বৌদ্ধ ধর্মকে গ্রহণ করাকেই সম্মানজনক মনে করেছিলেন। এই কারণেই গ্রিক, শক, কুষাণ প্রভৃতি রাজশক্তি ও তাদের সঙ্গে আসা সৈন্য-সামন্ত বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই বৌদ্ধ ধর্ম রাজশক্তির সহযোগিতায় তুঙ্গে উঠেছিল।

বিদেশি রাজারা বৌদ্ধধর্মকে সমস্ত রকমভাবে সাহায্য করছেন দেখে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাদের গোঁড়ামি কিছুটা কমালো। বা বলতে পারি—বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান ঠেকাতে কিছুটা কৌশল গ্রহণ করলো। তারা গ্রিক, শক, কুষাণদের 'পতিত ক্ষত্রিয়' বলে আখ্যা দিল। এতে দুটি ঘটনা ঘটলো। (১) ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বর্ণপ্রথা বড় ধরনের একটা ধাক্কা খেলো। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের একটা বড় অংশই বর্ণের নতুন সমীকরণ মেনে নিল না। (২) সমাজের বহু নিচু বর্ণের মানুষ বিদেশিদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে সমাজের দু-এক ধাপ উপরে উঠতে চেষ্টা করলো।

এরপর একটা প্রশ্ন উঠে আসতেই পারে, অশোক তো বিদেশি ছিলেন না, তিনি কেন বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন? অশোক তাঁর রাজত্বকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। এই বিস্তৃতির পিছনে সামরিক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়েছে। যুদ্ধ, হত্যা, লুণ্ঠন, রক্তপাত, ইত্যাদি দেখে এক সময় হিংসার প্রতি তাঁর বিরাগ জন্মেছিল। তারই পরিণতিতে অহিংস বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সাম্রাজ্য জুড়ে বহু ধম্মলিপি খোদিত করিয়ে ছিলেন।

অশোক, কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে এতটাই জড়িয়ে পড়েছিলেন যে, বৌদ্ধ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন।

বুদ্ধের মৃত্যুর অল্প কিছুকালের মধ্যে রাজগৃহে প্রথম 'বৌদ্ধ সঙ্গীতি' বা মহাসম্মেলন হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাসম্মেলন হয়েছিল বৈশালীতে বুদ্ধের মৃত্যুর একশো বছর পরে। এই সম্মেলনে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দশটি কাজকে সংঘবিরোধী বলে ঘোষণা করেন কঠোর বুদ্ধপন্থীরা। তখন আর একটি পৃথক মহাসম্মেলন করে

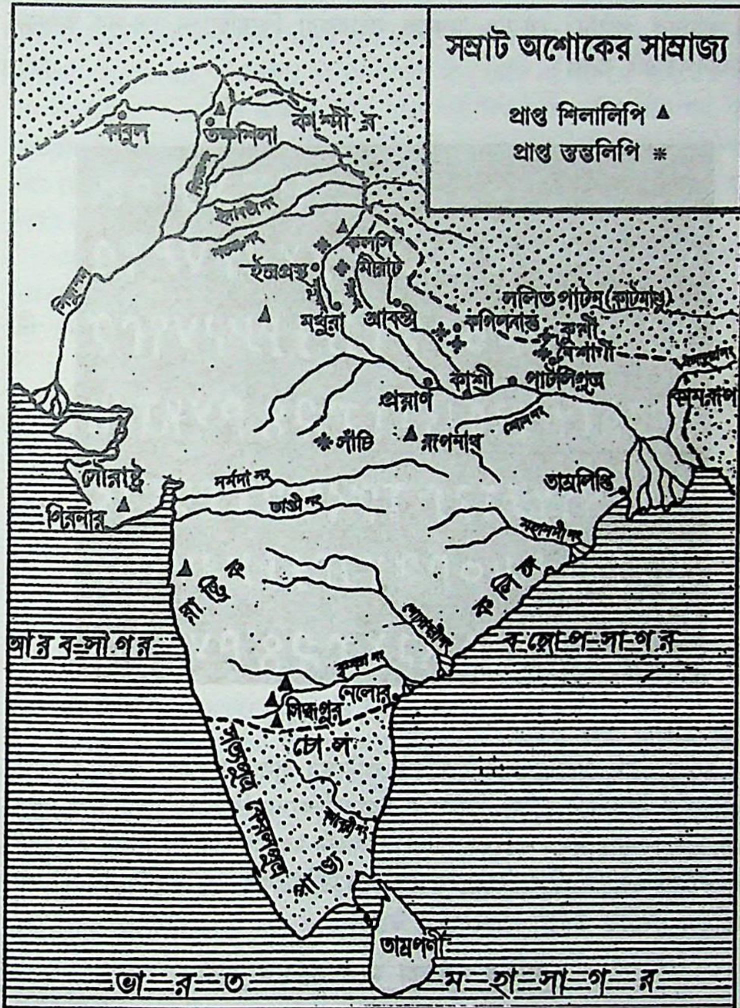

নব্যপন্থীরা দশটি বিষয়কেই নিয়মসিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। তাঁরা নিজেদের 'মহাসংঘিক' ও প্রাচীনপন্থীদের 'স্থবিরবাদী' বলে পরিচয় দেন। এই মহাসংঘিকরাই পরবর্তীতে মহাযানপন্থী ও স্থবিরবাদীরা হীনযানপন্থীতে রূপান্তরিত হন।

সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন হয়েছিল,

এটা ছিল স্থবিরবাদীদের সম্মেলন। এই সম্মেলনে ন'মাস পরিশ্রমে স্থবিরপন্থী বৌদ্ধ পণ্ডিতরা 'স্থবিরবাদী ত্রিপিটক' রচনা করেন। এরপর অশোক দেশ-বিদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারক পাঠান। যে-সব অঞ্চলে প্রচারকরা গিয়েছিলেন সে-সব অঞ্চলে হীনযানপন্থীরাই প্রবল।

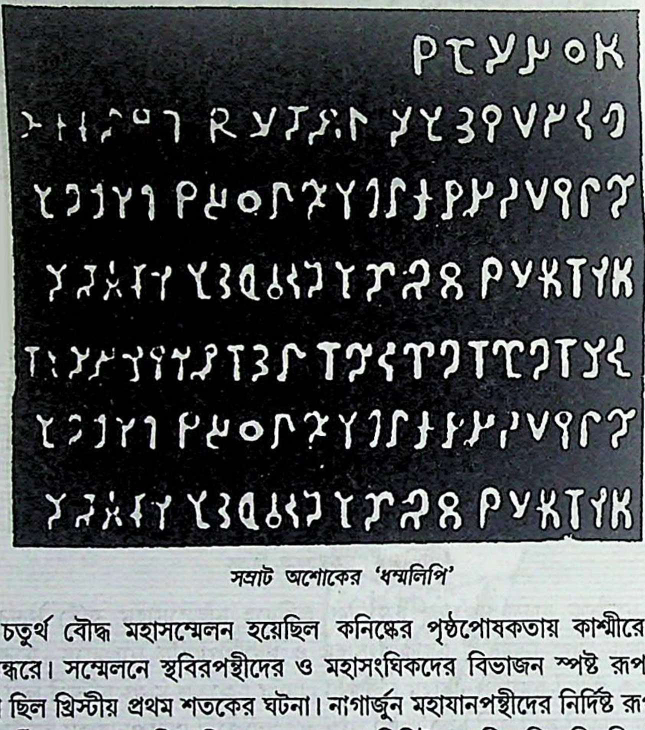

সম্রাট অশোকের 'ধম্মলিপি'

চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসম্মেলন হয়েছিল কনিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় কাশ্মীরে অথবা জলন্ধরে। সম্মেলনে স্থবিরপন্থীদের ও মহাসংঘিকদের বিভাজন স্পষ্ট রূপ পেল। এটা ছিল খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের ঘটনা। নাগার্জুন মহাযানপন্থীদের নির্দিষ্ট রূপ দেন। পরবর্তীতে মহাযানপন্থীরা নিজেদের মত করে ত্রিপিটকের কিছু কিছু বিকৃতি ঘটালো। মহাযান থেকেই তান্ত্রিক-বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব।

বৈদিক সাহিত্য মতে নাস্তিক যারা

সাহিত্য সংসদের 'বাংলা ভাষার অভিধান' বাংলা শব্দের আকর গ্রন্থ। অভিধানটিতে বলা হয়েছে বৈদিক সাহিত্য মতে নাস্তিক ছয় শ্রেণীর। (১) মাধ্যমিক, (২) যোগাচার (৩) সৌত্রান্তিক (৪) বৈভাষিক (৫) চার্বাক (৬) দিগম্বর।

বৈদিক সাহিত্যে প্রাচীন আমলের যে ছ'টি নাস্তিক্যবাদের কথা বলেছে, আমরা সেগুলো নিয়ে ছোট্ট করে একটু আলোচনা সেরে নিচ্ছি।

মাধ্যমিক

নাগার্জুন 'মাধ্যমিক' মতবাদের প্রবক্তা। মাধ্যমিক মতে —আমরা যা দেখি, যা অনুভব করি, সবই আপেক্ষিক ভাবে মনে হওয়া, অনুভব করা। আলোয় যে প্রকৃতিকে আমরা দেখতে পাই, অন্ধকারে তা দেখা যায় না। চোখ না থাকলে জগতের বস্তু, রং সবই মিথ্যা। যে দ্রব্য একজন দুর্বল দ্বারা পরীক্ষিত হলে কঠিন মনে হয়, তাই একজন সবলের কাছে কম কঠিন মনে হয়। গুণাবলী স্বয়ং অস্তিত্ববান হতে পারে না। যে খাদ্যবস্তুর স্বাদ একজনের কাছে উপাদেয়, অপরের কাছে খারাপ মনে হতে পারে। সুতরাং বস্তুর বাস্তব গুণ নেই। বস্তুগুণ আপেক্ষিক।

একটি বস্তুর মধ্যে একই সঙ্গে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় থাকতে পারে না। জগতের প্রকৃত কোনও অস্তিত্ব নেই। বস্তুসমূহ চিরস্থায়ীও নয়, ক্ষণস্থায়ীও নয়। বস্তু উৎপন্ন হয় না, বিলুপ্তও হয় না। আমরা যে সব বস্তু দেখছি তা আসলে অলীক।

মাধ্যমিক দর্শন কিছু যুক্তি ও কিছু যুক্তিহীনতায় ভরা 'দর্শন'। বৈদিক যুগের উপাসনা- ধর্মীরা মাধ্যমিক দর্শনের যুক্তিমনস্কতাকে ভয় পেয়েছিলেন। তারই পরিণতিতে মাধ্যমিকদের একঘরে করার চেষ্টায় মেতেছিলেন। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এমন কিছু গভীর ও সূক্ষ্ম চিন্তার মানুষ ছিলেন — ভাবলে বিস্ময় জাগে। তবে মাধ্যমিকে মতবাদকে আমরা 'দর্শন' বলে মেনে নিতে পারি না।

যোগাচার

'যোগাচার' বা 'বিজ্ঞানবাদ'-এর মতে—চৈতন্য, চেতনা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান নিজে থেকেই ক্রিয়াশীল। বাইরের কোনও শক্তির দ্বারাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি।

যোগাচার দর্শনে এমন বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তার পাশাপাশি কিছু ভ্রান্তিও ছিল। যোগাচারীরা মাধ্যমিকদের মতই মনে করতেন—যেহেতু চৈতন্য ছাড়া আমরা কোনও কিছুই দেখতে পাই না, জানতে হতে পারি না, তাই দৃশ্যমান কোনও বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব নেই।

মাধ্যমিক ও যোগাচার দর্শন দু'টি মহাযানপন্থী বৌদ্ধ দর্শন। এক-ই কারণে যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ কখন-ই খাঁটি দর্শন নয়।

সৌত্রান্তিক

সৌত্রান্তিকপন্থীরা নিরিশ্বরবাদী। তাঁরা মনে করেন, ঈশ্বর নেই। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃতির কোনও কিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়। সব কাজের পিছনেই থাকে কারণের বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া। মাটিতে বীজ পুঁতলে অংকুর হয়। অংকুর থেকে শিশু গাছ, কাণ্ড-শাখা-প্রশাখা-পাতা-ফুল-ফল সবই একটা কারণের বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া। সৃষ্টি স্থান-কাল নির্ভর। একটা বীজকে মাটিতে বপন না করে মাটি বা ধাতুর পাত্রে রেখে

দিলে, মাটি ও জলের অভাবে বীজ থেকে অংকুর সৃষ্টি হবে না। মৈথুনের এক পক্ষের মধ্যে জন্ম নেবে না একজন সবল শিশু। নারী-পুরুষের মিলন থেকে সবল শিশুর জন্মানোর যে বিবর্তন প্রক্রিয়া, তার জন্য একটা নির্দিষ্ট কালের প্রয়োজন। ঈশ্বর এই স্থান-কালের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সৃষ্টি করতে পারে না। সৌত্রান্তিকরা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণকে গ্রহণ করতেন না। অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রত্যক্ষপ্রমাণকে মিলিয়ে বিচার করলে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় বলে মনে করতেন। হীনযানী বৌদ্ধদেরই একটি সম্প্রদায়ের নাম হল সৌত্রান্তিক।

কিছু তথাকথিত দার্শনিক সৌত্রান্তিক মতবাদকে 'দর্শন' বলে উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু এই মতবাদ যে'হেতু একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন হয়ে উঠতে পারেনি, তাই আমরা 'দর্শন' বলে চিহ্নিত করতে পারি না।

বৈভাষিক

হীনযানী বৌদ্ধদেরই আরও একটি শাখা বৈভাষিক। বৈভাষিকদের মতে গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর যে'সব উপদেশ দিয়েছিলেন, সে'গুলি নিয়েই তৈরি সাতটি অভিধর্ম গ্রন্থ। এই অভিধর্ম গ্রন্থই বৌদ্ধদর্শনের প্রামাণ্য উৎসগ্রন্থ।

বৈভাষিকরা প্রত্যক্ষ প্রমাণকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। মনে করেন সমস্ত বস্তু চারটি ভূত দ্বারা গঠিত। এরা হল, পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু। বৈভাষিকরা 'ন্যায় বৈশাষিকদের' পারমাণবিক তত্ত্বকে স্বীকার করতেন।

বৈভাষিক দর্শনে বলা হয়েছে, পরমাণুর ছয়টি কোণ আছে। বস্তুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, অবিভাজ্য বিশ্লেষণ অযোগ্য ও অস্থির চরিত্র হল পরমাণুর গুণ। এককভাবে অদৃশ্য হলেও সমষ্টিগতভাবে দৃশ্যমান।

বৈভাষিকরা নিরীশ্বরবাদী। এমন নিরীশ্বরবাদীদের পরবর্তী জন্ম শেয়াল যোনিতে হবে বলে বৈদিক পূজারীরা গাল পাড়লে, সেটা আদৌ অস্বাভাবিক ঠেকে না। বাঁচোয়া—শকুনের শাপে গরু মরে না।

বৈভাষিক দর্শনও কোন অর্থেই সম্পূর্ণ দর্শন নয়।

চার্বাক

চার্বাক মতবাদ একই সঙ্গে নিরীশ্বরবাদী, অনাত্মাবাদী ও ভূতবাদী। ভারতের প্রথম বস্তুবাদী চিন্তার প্রতিফলন হয়েছিল চার্বাক মতবাদে। এই দর্শনের আরও একটা নাম বস্তুবাদী দর্শন। প্রাচীন বস্তুবাদী মতবাদের নামটা নিয়ে একটু আলোচনা স্বল্প পরিসরে সেরে নেওয়া যাক।

'চার্বাক' কথাটা কোথা থেকে এলো? অনেক দার্শনিকের মতে 'চারু + বাক্' থেকে চার্বাক কথাটা এসেছে। মানুষের স্বাভাবিক ভোগ প্রবৃত্তির কথা যে মতবাদ 'চারু' বা সুন্দর করে বলে, তাই চার্বাক মতবাদ। চার্বাক মতে, ইহ জগতেই সব কিছুর শেষ। মৃত্যুর পরে অন্য জগৎ বলে কিছু নেই। অতএব ভোগ কর।

অন্য মতে 'চর্ব' (অর্থাৎ চর্বণ) করে যে—এই অর্থে চার্বাক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধরনের ব্যাখ্যায় তাঁরা বলতে চান—চর্ব-চোষ্য খানা-পিনার মধ্যেই জীবনের চরমতম সার্থকতা যে মতবাদ খুঁজে পায়, তার-ই নাম চার্বাক দর্শন।

ব্যাকরণ মানতে গেলে দুটো মতকেই বাতিল করতে হয়। 'চারু + বাক্' থেকে 'চারুবাক্' অথবা 'চার্বাক্' বা 'চার্বাক'-এর 'ক'-এ হসন্ত বাদ দেওয়া হয়েছে। আবারে 'চর্বণ করে যে' সে চার্বাক' নয় চার্বক', অর্থাৎ 'ব'-এ আ-কার হবে না।

পালি সাহিত্য বিষয়ে সুপণ্ডিত রিস ডেভিডস (Rhys Davids)-এর মতে মহাভারতের এক কুচরিত্র রাক্ষস চার্বাক-এর নাম থেকেই ভাববাদীরা বস্তুবাদী মতবাদটির নাম রাখেন চার্বাক দর্শন। মহাভারতে আছে—চার্বাক ছিল দুর্যোধনের বন্ধু আর এক দুরাত্মা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-বিজয়ী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশধারী চার্বাক জ্ঞাতিঘাতী হিসেবে ধিক্কার জানিয়ে আত্মঘাতী হতে প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ তাঁদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় চার্বাক-এর আসল পরিচয় জেনে ফেলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করেন।

প্রাচীন ভাববাদীরা বস্তুবাদী মতবদেটির প্রতি সাধারণ মানুষের অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা সৃষ্টির জন্যই এমন এক ঘৃণ্য রাক্ষস চরিত্রের নামে মতবাদটির নাম রেখেছিলেন।

সে'যুগের কিছু ভাববাদী, চার্বাক বা লোকায়ত মতবাদকে দেবগুরু বৃহস্পতি প্রণীত বলে উল্লেখ করেছেন। পুরাণে আছে—অসুরদের পরাক্রমে বিধ্বস্ত দেবকুলকে রক্ষা করতে এক কৌশল অবলম্বন করলেন বৃহস্পতি। অসুরদের ধ্বংসের জন্য, অধঃপাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ভ্রান্ত মতবাদ রচনা করলেন। তারপর অসুরের ছদ্মবেশে অসুরদের মধ্যে বস্তুবাদী দর্শনটি প্রচার করলেন। ফলে নীতিভ্রষ্ট, ভ্রান্ত অসুররা দেবতাদের কাছে পরাজিত হল।

এখানেও দেখতে পাই—বস্তুবাদী চার্বাক মতবাদ-ই অসুরদের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল—এই রকম প্রচারের মধ্য দিয়ে বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি আতঙ্ক এবং বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা স্পষ্ট।

শঙ্করাচার্য প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকেরা এই বস্তুবাদী মতবাদকে 'লোকায়ত' নামে অবহিত করার কারণ হিসেবে জানিয়েছেন—দর্শনটি ইতর লোকের দর্শন, তাই 'লোকায়ত' দর্শন। এখানে ভাববাদী দার্শনিকদের লোকায়ত মতবাদের প্রতি অশ্রদ্ধা স্পষ্ট।

অনেক পাঠক-পাঠিকার মনেই এ-চিন্তা নিশ্চয়ই উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে, চার্বাক বা

লোকায়ত মতবাদে কী এমন কথা বলা হয়েছে, যা অবহেলায় পাশে সরিয়ে দেওয়ার সাধ্য সে যুগের রথী-মহারথী দর্শনিকদের ছিল না (যদিও প্রকৃত অর্থে তাঁরা কেউ-ই 'দার্শনিক' ছিলেন না।) যার ফলে ভাববাদী রথী-মহারথীরা বস্তুবাদী এই খন্ডিত দর্শনটিকে লক্ষ করে তীক্ষ্ণ আক্রমণ হেনেছেন? সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষদের দর্শনটি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে নানাভাবে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন?

সাধারণ মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে 'রামায়ণ', 'মহাভারত'-এর মতো মহাকাব্যগুলোতে ঢুকে পড়েছে অনেক কাহিনী, অনেক নীতিকথা। রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডের দিকে তাকান। রামচন্দ্র তখন চিত্রকূটে। ভরত এলেন। রামচন্দ্র ভরতকে রাজ্য-পরিচালন বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন,

ক্বচিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।।

অর্থাৎ "আশা করি তুমি লোকায়তিক ব্রাহ্মণদের সেবা করছ না। ওরা অনর্থ ঘটাতে খুবই পটু।"

মহাভারতের শান্তিপর্ব। এক ধনী বণিক রথে যাওয়ার সময় এক ব্রাহ্মণকে ধাক্কা মারে। ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ অপমানের জ্বালা ভুলতে আত্মহত্যা কথা চিন্তা করে। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের আত্মহত্যার মধ্যে সর্বনাশের সংকেত দেখতে পেয়ে শিয়াল সেজে হাজির হলেন। ব্রাহ্মণকে পশুজীবনের বহু কষ্টের কথা বলে মানবজীবনের জয়গান গাইলেন। জানালেন, অনেক জন্মের পুণ্যের ফল সঞ্চল করে এই মানবজন্ম পাওয়া। এমন মহার্ঘতম মানবজীবন, বিশেষত শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মলাভের পরেও কেউ কি পারে সে-জীবন ধ্বংস করতে? অভিমানে আত্মহত্যা করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। শিয়াল, সে নিজেও আগের জন্মে ব্রাহ্মণ হয়েই জন্মেছিল। কিন্তু সে-জন্মে চূড়ান্ত মূর্খের মতো এক মহাপাতকের কাজ করেছিল বলেই আজ এই শিয়াল জন্ম।

চূড়ান্ত মূর্খের মত মহাপাতকের কাজটা কী? এ-বারই বেরিয়ে এলো নীতিকথা—

অহমাংস পণ্ডিতকো হৈতুকো দেবনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যম্ অনুরক্তো নিরার্থিকাম।।
হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সুংসৎসু হেতুমৎ।
আক্রোষ্টা চ অভিবক্তা চ ব্রাহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্।।
নাস্তিকঃ সর্বশঙ্কী চ মূর্খঃ পণ্ডিতমানিকঃ।
ভাস্য ইয়ং ফলনিবৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ।।

(শান্তিপূর্ব ১৮০/৪৭-৪৯)

অর্থাৎ, আমি ছিলাম এক বেদ-সমালোচক তার্কিক পণ্ডিত। নিরর্থক তর্কবিদ্যায় ছিলাম অনুরক্ত। বিচারসভায় ছিলাম তর্কবিদ্যার প্রবক্তা। যুক্তিবলে দ্বিজদের ব্রহ্মবিদ্যার বিরুদ্ধে আক্রোশ মেটাতাম। ছিলাম জিজ্ঞাসু মনের নাস্তিক, অর্থাৎ কিনা

পণ্ডিত্যভিমানী মূর্খ। হে ব্রাহ্মণ, তারই ফলস্বরূপ আমার এই শিয়ালজন্ম।

ভারতবর্ষে অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদী দর্শনের সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাই আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে 'উপনিষদ' সাহিত্যে। চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন বা বস্তুবাদী যুক্তিবাদের সূচনা সঠিক কবে হয়েছিল বলা সম্ভব নয়। অনুমানিক অষ্টম শতকে রচিত বৌদ্ধ দার্শনিক কমলশীলের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'পঞ্জিকা'তে বস্তুবাদী চার্বাক মতবাদের উল্লেখ রয়েছে দেখতে পাই।

কমলশীলের গুরু শান্তরক্ষিত নিজের মতের সমর্থনে 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামে একটি দর্শনগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচনায় দেখতে পাই বস্তুবাদী যুক্তি-তর্ক নির্ভর মতবাদকে তিনি 'চার্বাক' না বলে 'লোকায়ত' বলে বর্ণনা করেছিলেন।

শান্তরক্ষিত থেকে শঙ্করাচার্য পর্যন্ত বেশ কয়েকজন বিখ্যাত অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদী দার্শনিকের রচনায় 'লোকায়ত' বা 'চার্বাক' নামের যুক্তি-তর্ক নির্ভর মতবাদটির উল্লেখ আছে। সে-সময় ভারতীয় দর্শনের প্রথামত পরমত খণ্ডন করে নিজের মত স্থাপন করা হতো। পরমত হিসেবেই এইসব ভাববাদী দার্শনিকেরা চার্বাক বা লোকায়ত মতবাদের বিভিন্ন মতের উল্লেখ করেছেন। আর সেই উল্লেখ থেকেই আমরা চার্বাক দর্শন বিষয়ে কিছু তথ্য জানতে পারি। চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন ছিল সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দর্শন, যা ছড়া হিসেবে প্রচলিত ছিল মানুষের মুখে মুখে। অলিখিত এই ছড়াই লোকগাথার রূপ পেয়েছিল।

আত্মা অবিনশ্বর হলে তবেই মৃত্যুর পর আসে স্বর্গ বা নরক ভোগের প্রশ্ন, জন্মান্তর পূর্বজন্মের কর্মফল ইত্যাদি প্রশ্ন। আত্মা নশ্বর হলে এইসব প্রশ্ন-ই অর্থহীন হয়ে যায়।

চার্বাক বা লোকায়ত-দর্শনে আত্মার বিষয়ে এমন কিছু যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল যেগুলো ইতরজন বা সাধারণের কাছেও গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল।

চার্বাক দর্শনে আত্মা বা চৈতন্যকে দেহধর্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই বক্তব্যই ভাববাদী দার্শনিকদের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বস্তুবাদী চার্বাক দর্শনের সঙ্গে ভাববাদী দর্শনের? সুদীর্ঘ লড়াই চলেছিল শুধুমাত্র আত্মা 'অমর' কি 'মরণশীল'—এই নিয়ে।

লোকায়ত দর্শন মতে—কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য প্রমাণের প্রয়োজন। বিশ্বাস-নির্ভর অনুমানের সাহায্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। অনুমান-নির্ভর, একান্ত বিশ্বাস-নির্ভর অমর আত্মা, ইহলোক, পরলোক ইত্যাদি ধারণাগুলো লোক ঠকানোর জন্য একদল ধূর্ত লোকের সৃষ্টি।

প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণই শ্রেষ্ঠ বলে চার্বাক দর্শন মনে করলেও প্রত্যক্ষ-

অনুগামী জ্ঞানকেও মর্যাদা দিয়েছিলেন। অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রতিটি অনুমানের মূল শর্ত অবশ্যই হবে 'পূর্ব প্রত্যক্ষ' অর্থাৎ প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করে অনুমান। যেমন ধোঁয়া দেখলে আগুনের অনুমান, গর্ভ দেখে অতীত মৈথুনের অনুমান ইত্যাদি।

ভাববাদীদের চোখে প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানের গুরুত্ব ছিল সামান্য অথবা অবান্তর। তাঁরা অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন, 'ঋষি' নামধারী ধর্মগুরুদের মুখের কথাকে, ধর্মগুরুদের অন্ধ-বিশ্বাসকে—যার ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল আত্মা সংক্রান্ত মতবাদ বা অধ্যাত্মবিদ্যা।

আজও যাঁরা বলেন, "বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম এবং অধ্যাত্মবাদের কোন দ্বন্দ্ব নেই, বরং অধ্যাত্মতত্ত্বই 'পরম বিজ্ঞান', তাঁরা এটা ভুলে যান— প্রত্যক্ষল জ্ঞান বা অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া প্রকৃত বিজ্ঞানের প্রথম ধাপটিতে পা রাখাই সম্ভব নয়। আরা 'অধ্যাত্মতত্ত্ব' দাঁড়িয়ে আছে 'আত্মা অমর' এই বিশ্বাসের উপর, যা বিজ্ঞান-বিরোধী বিশ্বাস।

লোকায়ত দর্শন প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে দ্বিধাহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিল—চৈতন্য দেহেরই গুণ বা দেহেরই ধর্ম। দেহ ধ্বংস হওয়ার পর চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অস্তিত্ব অজ্ঞান ও ধূর্তদের কল্পনা মাত্র। আর 'আধ্যাত্মত্ত্ব' বা আত্মার অবিনশ্বরতার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা তত্ত্ব বিজ্ঞানের লক্ষণ নয়; অজ্ঞানের লক্ষ্মণ।

লোকায়ত দর্শনের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে শঙ্করাচার্য যে যুক্তি রেখেছিলেন তা হল— লোকায়তদের মতে দেহের মূল উপাদান, জল, মাটি, আগুন, বায়ু ইত্যাদি ভূত-পদার্থ। এই প্রতিটি ভূত-পদার্থই জড় বা অচেতন পদার্থ। তাহলে এই অচেতন পদার্থে গড়া মানুষের মধ্যে চেতনা আসছে কোথা থেকে? আসছে নিশ্চয়ই এই সব অচেতন পদার্থের বাইরে থেকেই। অতএব স্বীকার করে নেওয়া উচিত—চৈতন্য বা আত্মা দেহের অতিরিক্ত একটা কিছু। আত্মা বিষয়ে অন্যান্য বহু অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক যে-সব তর্কের ঝড় তুলেছেন, তাঁদের অনেকের বক্তব্যেই শঙ্করাচার্যের এই যুক্তির সুর লক্ষ করা যায়। তাঁরাও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন—জড় বা অচেতন পদার্থে গড়া দেহ তো সরল যুক্তিতে অচেতনই হবার কথা। তবে মানুষের চৈতন্য আসছে কোথা থেকে?

লোকায়ত দর্শন এই যুক্তির বিরুদ্ধে পালটা যুক্তিও হাজির করেছে—মদ তৈরির উপকরণগুলোতে আলাদা করে কোন মদশক্তি নেই। কিন্তু সেই উপকরণগুলোকেই এক ধরনের বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিলন ঘটানোর পর সম্পূর্ণ নতুন এক গুণ পাওয়া যাচ্ছে, যাকে বলছি মদ। আত্মা বা চৈতন্যও একই জাতীয় ঘটনা।

লোকায়তিকদের চৈতন্যের সঙ্গে মদশক্তির তুলনা নিয়ে কোন বিপক্ষ দার্শনিকই কূটতর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেননি। তবে, তাঁরা দৃষ্টান্ত হিসেবে এনেছেন মৃতদেহের তুলনা। চৈতন্য যদি দেহেরই লক্ষণ বা ধর্ম হয়, তবে মৃতদেহেও তো চৈতন্য থাকার কথা, থাকে না কেন?

লোকায়ত দর্শনের আত্মা বা চৈতন্যতত্ত্বের বিরুদ্ধে ভাববাদীদের এটাই সবচেয়ে জোরালতম যুক্তি।

চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন এর বিপক্ষে জোরাল কোনও যুক্তি হাজির করতে পারেনি। প্রাচীনকালের পটভূমিতে শারীরবিদ্যার অনগ্রসরতার যুগে এই ধরনের যুক্তির কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না। আজ বিজ্ঞানের তথা শারীর-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক কিছু জেনেছি। পরবর্তীকালে নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছুই জানব। যেটুকু জেনেছি, তারই ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি দেহ ও মৃতদেহের ধর্ম সমান নয়। চিন্তা, চেতনা বা চৈতন্য মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের ক্রিয়া।

মৃতদেহের ক্ষেত্রে মৃতদেহেরই অংশ মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষেরও যেহেতু মৃত্যু ঘটে তাই স্নায়ুকোষের ক্রিয়াও ঘটে না, ফলে মৃতদেহের ক্ষেত্রে চৈতন্য বা চিন্তা থাকে অনুপস্থিত।

লোকায়ত দর্শনে আত্মা, পরলোক এবং পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ে এমন অনেক যুক্তি দেখানো হয়েছে, যে'সব যুক্তি এ যুগের যুক্তিবাদীদেরও ঈর্ষা জাগাবার মত। দু-একটা উদাহরণ তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। মূল শ্লোক থেকে বংলা তর্জমা করলে এমনটা দাঁড়ায়—

উদাহরণ ১ : ব্রাহ্মণ জীবিকা হেতু তৈরি শ্রাদ্ধাদি বিহিত।
এ-ছাড়া কিছুই নয় জেনো গো নিশ্চিত।।

উদাহরণ ২ : যদি, শ্রাদ্ধকর্ম হয় মৃতের তৃপ্তির কারণ।
তবে, নেভা প্রদীপে দিলে তেল উচিত জ্বলন।।

উদাহরণ ৩ : পৃথিবী ছেড়ে যে ভূতপদার্থে ফেরে
তার পাথেয় দিতে পিণ্ডদান বৃথা।
যেমন, ঘর ছেড়ে যে গ্রামান্তরে
তার পাথেয় (খাদ্যবস্তু) ঘরে দেওয়া বৃথা।।

উদাহরণ ৪ : চৈতন্যরূপ আত্মার পাকযন্ত্র কোথা?
তবে তো পিণ্ডদান নেহাতই বৃথা।।

উদাহরণ ৫ : যদি, জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে
বলি দিলে পশু যায় স্বর্গে।
তবে, পিতাকে পাঠাতে স্বর্গে
ধরে-বেঁধে বলি দাও যজ্ঞে।।

উদাহরণ ৬ : ভণ্ডরা পশুর মাংস খেতে অজুহাত চান।
তাই তাঁরা দিয়েছেন বলির বিধান।।

বুদ্ধের যুগের পর চার্বাক দর্শনের বিকাশের কোনও খবর আমরা পাইনি। তার কারণ হতে পারে, (১) বৌদ্ধ দর্শন চার্বাক দর্শনের তুলনায় অনেক উন্নততর, সংঘবদ্ধ, সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য দর্শন ছিল, (২) বৌদ্ধ দর্শনের আবির্ভাব ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বৌদ্ধ অনুরাগীদের অগ্রগমন, পিছিয়ে থাকা চার্বাক দর্শনকে আরও পিছিয়ে দিয়েছিল, (৩) চার্বাক দর্শনের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মগজ ধোলাই। ফলে আমরা দেখতে পেলাম, যে শোষিত সাধারণ মানুষদের উপকারের জন্য চার্বাক দর্শন আত্মাবাদ ও ঈশ্বরবাদকে শানিত যুক্তিতে খণ্ডন করেছিল, সেই শোষিত সাধারণ মানুষই একসময় চার্বাক দর্শনকে এক নীতিহীন দর্শন বলে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। এমনকি 'চার্বাক' শব্দটিকে লোকে গালাগাল বলেই ভাবতে শুরু করেছিল।

উপাসনা-ধর্মে বিশ্বাসীরা চার্বাকদের আরও নানা নামে চিহ্নিত করেছিল—লোকায়ত, বৃহস্পত্য, স্বাভাবিক, ভূতবাদী ইত্যাদি। চার্বাকরা মনে করতেন, জগৎ স্বভাবগতভাবেই বৈচিত্রময় ও বৈচিত্র্যের কারণ। অতএব ঈশ্বরকে বৈচিত্র্যের স্রষ্টা ভাবাটা ভুল। ভূতবাদী হিসেবে ওঁরা মনে করতেন—ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ (জল), তেজ (আগুন) ও মরুৎ (বায়ু), এই চারটি মৌল পদার্থ থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি। ধ্বংসে সবই আবার এই চার ভূতেই বিলীন হয়।

চার্বাক দর্শনও সঠিক অর্থে 'দর্শন' নয়, সামগ্রিক জীবনদর্শন হয়ে উঠতে না পারার কারণে। তৃতীয় অধ্যায়ে 'দর্শন' নিয়ে যখন বিস্তৃত আলোচনায় ঢুকবো, তখন বিষয়টা পরিষ্কার হবে।

'ভূতবাদ' একটি বিপ্লবাত্মক চিন্তা

'ভূতবাদ' মনে করে পৃথিবীতে মৌল পদার্থের পরিমাণ পাঁচ। আবার কিছু ভূতবাদীদের মতে পৃথিবীতে মৌল পদার্থের পরিমাণ চার। এই মৌল পদার্থ থেকেই পৃথিবীর বস্তু ও প্রাণী, সবেরই সৃষ্টি। ধ্বংসে সব-ই আবার পঞ্চভূতে বা চারভূতে বিলীন হয়। এই মৌল পদার্থগুলো কী কী, তা নিয়ে একটু আগেই আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু এই চারটি বা পাঁচটি মৌল পদার্থের তত্ত্ব মেনে নিতে আমাদের অসুবিধে আছে। এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি,

প্রকৃতিতে মোট মৌলপদার্থের সংখ্যা ১০৫টি। ১০টি মৌল পদার্থ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে কৃত্রিম উপায়ে। অর্থাৎ এই ১০টি গবেষণাগারে তৈরি। সংখ্যা তত্ত্ব ছেড়ে ভূত তত্ত্বে ফিরলে স্বীকার করতেই হয়, দু'আড়াই হাজার বছর আগের কিছু চিন্তাবিদ কী অসাধারণ বিপ্লবাত্মক চিন্তায় পৌঁছেছিলেন—মৃত্যুর পর মৃতদেহ মৌল পদার্থে বিলীন হয়ে যায়।

সব শেষ হয়ে যায়। দেহাতীত আত্মা বলে কিছু নেই। এমন চিন্তা মানুষের মাথায়

এসেছিল সম্ভবত মৃত্যুর পর দেহের পরিণতি দেখে, অস্ত্র ও তৈজসপত্রের ভঙ্গুরতা দেখে। মৃতদেহকে পচে-গলে মাটিতে মিশতে দেখেছে। পুড়ে শেষ হতে দেখেছে। দেখেছে আগুনের শিখাকে বাতাসে লাফিয়ে উঠতে। দেখেছে ধোঁয়াকে বাতাসবাহী হয়ে আকাশে মিলিয়ে যেতে। নদীতে ভাসমান দেহকে জলেই বিলীন হতে। ভাঙা হাঁড়ি-কুড়ি, মরা গাছকে দেখেছে এক সময় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে। অনুমান করা যেতে পারে, তাদের এসব প্রত্যক্ষ প্রমাণ চতুর্ভূত বা পঞ্চভূত তত্ত্বে পৌঁছে দিয়েছিল।

সে সময়ের প্রেক্ষিতে চতুর্ভূত বা পঞ্চভূত তত্ত্বকে অবশ্যই অসাধারণ বলতেই হয়। দুঃখ এই, আজকের যুগে মৌল পদার্থ নিয়ে বিজ্ঞান গবেষণা যখন বিশাল রকম এগিয়ে গেছে, এগিয়েছে শরীর বিজ্ঞান, তখনও এ'দেশের বেশির ভাগ মানুষ বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পর দেহ মাটিতে পুঁতে ফেলার পর বা আগুনে পুড়িয়ে দেবার পরও সব শেষ হয় না। বেঁচে থাকে আত্মা, অর্থাৎ চিন্তা, চেতনা, চৈতন্য বা মন।

আড়াই হাজার বছরে বিজ্ঞান অনেক এগোলো, কিন্তু আমাদের চেতনা এগোল কই! আমরা তো যুক্তিহীনতার আবর্তে তলিয়ে যাচ্ছি। এই অধঃপাতকেই কি মেনে নেবো আমরা?

দিগম্বর

জৈন উপাসনা ধর্মের দু'টি ভাগ। একটি শ্বেতাম্বর, দ্বিতীয়টি দিগম্বর। জৈন মত অনুসারে চব্বিশজন তীর্থংকর জৈন উপাসনা ধর্মের বিকাশ ঘটিয়েছিল। প্রথম তীর্থংকরের নাম ঋষভ বা আদিনাথ। পরবর্তী তীর্থংকররা হলেন : অর্জিত, সম্ভব, অভিনন্দ, সুমতি, পদ্মপ্রভ, সুপার্শ্ব, চন্দ্রপ্রভ, সুবিধি, শীতল, শ্রেয়াংশ, বসুপূজ্য, বিমল, অনন্ত, ধর্ম, শান্তি, কুন্‌থ, আর, মল্লি, মুনিসুব্রত, নমি, অরিষ্টনেমি, পার্শ্ব বা পার্শ্বনাথ অথবা পরেশনাথ ও মহাবীর। মহাবীর হলেন চব্বিশতম তীর্থংকর।

এক থেকে বাইশতম তীর্থংকরকে নিয়ে এত বেশি অতিরঞ্জন ও অলৌকিক ঘটনার ছড়াছড়ি যে, ঐতিহাসিকদের ধারণা এ'গুলো কল্পকাহিনী। এতে এমনটা মনে হতেই পারে যে, এইসব তীর্থংকরদের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু ভক্তির প্রাবল্যে এঁদের চরিত্রগুলোকে ভক্তরা বেশি রকম বড় করতে গিয়ে অবাস্তব করে তুলেছেন।

তীর্থংকর হিসেবে পার্শ্ব বা পার্শ্বনাথই প্রথম, যাঁর অস্তিত্ব নিয়ে ঐতিহাসিকদের কোনও সন্দেহ নেই। জৈন মত অনুসারে পার্শ্বনাথের জন্ম আনুমানিক ৮১৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। পিতা অশ্বসেন ছিলেন গোষ্ঠীপতি। এক গোষ্ঠীপতির কন্যার সঙ্গে পার্শ্বনাথের বিয়ে হয়।

মানুষের জীবনের নানা দুঃখ দেখে তা থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে তিরিশ

বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। এদিক থেকে পার্শ্বনাথের সঙ্গে বুদ্ধের কিছু মিল আমরা পাই। পার্শ্বনাথের দুঃখ চেতনা ছিল জাগতিক, বুদ্ধেরই মত।

সত্যকে জানতে, দুঃখের কারণ জানতে তিরিশ দিন ধরে নিজেকে সমাজ-সংসার থেকে দূরে রেখে গভীর চিন্তায় ডুবিয়ে রাখেন। শেষে দুঃখের কারণ ও তার থেকে অব্যাহতির উপায় খুঁজে পান। সত্তর বছর ধরে তাঁর মতাদর্শ প্রচার করেন। একশো বছর বয়সে মৃত্যু।

পার্শ্বনাথের চার নীতি বা চতুর্যাম

পার্শ্বনাথ তাঁর প্রচারিত উপাসনা-ধর্মে 'চতুর্যাম' অর্থাৎ চারটি নীতি বা ব্রতর কথা বলেছিলেন। (১) অহিংসা —কারও জীবননাশ করবে না। (২) অনৃত — মিথ্যে বলবে না। কারও বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ আনবে না। (৩) অস্তেয় — চুরি করবে না। চোরদের কাছ থেকে কোনও জিনিস কিনবে না। ক্রেতাকে মিথ্যে ওজনে জিনিস বিক্রি করবে না। দ্রব্যে ভেজাল দেবে না। (৪) অপরিগ্রহ — ব্যক্তিগত জমিজমা - ভূসম্পত্তির অধিকারী হবে না।

মহাবীর

চব্বিশতম তীর্থংকর মহাবীর জৈনদের 'দিগম্বর' সম্প্রদায়ের স্রষ্টা। নগ্নতাবাদী মহাবীরের জন্ম আনুমানিক ৫৯৯ বা ৫৬৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। জন্ম বৈশালীর বসুকুণ্ড গ্রামে (মজঃফরপুর, বিহার)। পিতা সিদ্ধার্থ ছিলেন একটি উপজাতির গোষ্ঠীপতি। জৈন শ্বেতাম্বরপন্থীদের মতে মহাবীরের বিয়ে হয়েছিল কৌণ্ডিল্য উপজাতির মেয়ে যশোদার সঙ্গে। মহাবীরের একটিই মেয়ে—অনুজা।

দিগম্বর মতে মহাবীর ছিলেন চিরকুমার ও কঠোর ব্রহ্মচারী। তিরিশ বছর বয়সে তাঁর বিপুল সম্পত্তি দান করে দিয়ে গৃহত্যাগ করেন ও পরিব্রাজক বৃত্তি গ্রহণ করেন। তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে চেয়েছিলেন দুঃখের কারণ ও দুঃখময় জগৎ থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে বের করতে।

পরিব্রাজক জীবনে তিনি কোনও গ্রামে এক রাতের বেশি থাকতেন না। এ'ভাবে তের মাস কেটে যাওয়ার পর কাপড় পরিধান করা ছেড়ে দেন। মহাবীর দিগম্বর থাকার কারণে নানা জায়গায় খারাপ ব্যবহার পেয়েছেন।

পরিব্রাজক জীবনের তৃতীয় বছরে তিনি আর এক চিন্তাবিদ গোশাল মংখলিপুত্তের সঙ্গে পরিচিত হন। দু'জনে মত বিনিময় ও চিন্তা বিনিময়ের মধ্যে ছয় বছর কাটিয়ে দেন। তারপর মত পার্থক্যের কারণে দু'জনের বিচ্ছেদ হয়। গোশাল নিজেকে তীর্থংকর ঘোষণা করেন এবং তীর্থংকর মহাবীরকে ত্যাগ করেন।

দীর্ঘ বারো বছরের পরিব্রাজক জীবনে তিনি নগ্ন হয়ে শীত-গ্রীষ্মের তাপের কষ্ট

পেয়েছেন। নগ্নতার কারণে ভিক্ষেও জোটেনি। দীর্ঘ দিন কেটেছে অনশনে, মানুষের ও কুকুরের তাড়া খেয়ে। শরীরকে এমনভাবে কষ্ট দেওয়ার কারণ, মহাবীর এই সময় মনে করতেন দুঃখভোগই পাপস্খালন এবং মুক্তির উপায়।

ঋজুপালিকা নদীর তীরে জৃম্ভিকা গ্রামে একটা শালগাছের নীচে বসে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকাকালীন তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উপলব্ধিতে পৌঁছোন বা জ্ঞান লাভ করেন। এরপর উপাসনা ধর্ম প্রচারে বের হন। মহাবীরের মামা বৃজি উপজাতির গোষ্ঠীর প্রধান চেটক ছিলেন মহাবীরের পৃষ্ঠপোষক। মগধরাজ অজাতশত্রু থেকে কৌশাম্বীর রাজা স্থানক মহাবীরকে সম্মান ও সমাদরের সঙ্গে স্বাগত জানান।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে উপদেশ প্রচার করে বেরিয়েছেন। ৮৪ বছর বয়সে অন্য মতে ৭২ বছর বয়সে তিনি পাবা'য় (বর্তমান গোরক্ষপুর) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মহাবীর ছিলেন বুদ্ধের সমসাময়িক। ছিলেন অত্যন্ত ভাল সংগঠক। জৈন সংঘকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মহাবীর বৈদিক যুগের সমসাময়িক ছিলেন। বেদকে অভ্রান্ত মনে করতেন না। তিনি ছিলেন নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক, অলৌকিকে অবিশ্বাসী, নিয়তিবাদে অবিশ্বাসী। আপেক্ষিক গুণবাদ বা 'স্যাদ্‌বাদ'-এ বিশ্বাসী ছিলেন।

পঞ্চব্রত

মহাবীর চতুর্যামের পরিবর্তে 'পঞ্চব্রত' বা পাঁচটি নীতির কথা বলেছিলেন। পার্শ্বনাথের নীতিগুলো সরিয়ে তিনি নতুন কিছু নীতির প্রবর্তন করেননি। চতুর্যামের চারটি নীতির সঙ্গে একটি নতুন নীতি যুক্ত করেছিলেন। নীতিটি হল ব্রহ্মচর্য। 'ব্রহ্মচর্য' বলতে শুধু সহবাস থেকে বিরত থাকা বোঝায় না, সমস্ত ইন্দ্রিয়ভোগ থেকে বিরত থাকা বোঝায়।

এই পঞ্চব্রতকে আবার মহাবীর দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন। (১) অনুব্রত, (২) মহাব্রত। গৃহী জৈনদের জন্য নরম করে তৈরি হয়েছিল 'অনুব্রত'। গৃহীদের পক্ষে 'অহিংসা' বলতে বলা হয়েছে—উদ্ভিদজাতীয় প্রাণীর ঊর্ধ্বতন যে'সব প্রাণী, তাদের প্রতি অহিংসা ব্রত পালন করতে হবে। 'ব্রহ্মচর্য' বলতে বলেছেন, গৃহীদের একপত্নী ব্রত পালনের কথা।

শ্রমণদের বেলায় 'ব্রহ্মচর্য' আবশ্যিক শর্ত। দিগম্বরপন্থীরা মনে করেন শ্রমণ বা জৈন সন্ন্যাসীদের অবশ্যই সমস্ত পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে হবে, নগ্ন থাকতে হবে। দিগম্বরপন্থীরাও আরও মনে করেন, তীর্থংকররা প্রত্যেকেই পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েই জ্ঞানের সাধনা করেছিলেন। জ্ঞান লাভ করেছিলেন। সুতরাং তীর্থংকরদের

ছবি আঁকতে হলে নগ্নই আঁকতে হবে, মূর্তি-খোদিত করতে হলে, তা হবে নগ্ন। কাপড়ে পরিয়ে সভ্য সাজাবার প্রয়াস মিথ্যাকে সত্যি বলে প্রচার ছাড়া কিছু নয়। এই ধরনের মিথ্যাচারিতা 'অনৃত' যা সত্য নীতিকে লঙ্ঘন করা।

জৈন দার্শনিকদের মধ্যে পরমাণু সম্পর্কে ধারণা ছিল। উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতির ক্ষেত্রে জৈন দার্শনিকদের অবদান অনস্বীকার্য।

জৈন ধর্মের প্রধান সংগঠক ছিলেন দিগম্বরবাদী মহাবীর। তাই বৈদিক যুগের পুরোহিত সম্প্রদায়ের তীব্র ক্ষোভ দিগম্বরদের উপর ছিল। ঈশ্বর নেই, মানে ঈশ্বর উপাসনা, যাগ-যজ্ঞ, হোম, বলি, পুরোহিতদের প্রণামী দেওয়া সবই অর্থহীন। এতো দস্তুরমতো বৈদিক পুরোহিতদের অস্তিত্বের সংকট! এই সংকট কাটাতে পুরোহিতরা নিরীশ্বরবাদীদের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। এমনকী নিরীশ্বরবাদীদের ঝাড়ে-বংশে নির্মূল করতে আক্ষরিক অর্থেই অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন হাতে।

দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর-এর বিরোধ

জৈন উপাসনা-ধর্ম প্রধানত নীতি-ধর্ম। জৈন ধর্ম মহাবীরের সময় দুটি শাখায় ভাগ হয়ে যায়। (১) দিগম্বর, (২) শ্বেতাম্বর। দিগম্বররা শরীরে কোনও কাপড় রাখেন না। তাঁরা নগ্নতাবাদী ও প্রকৃতিবাদী। শ্বেতাম্বররা সাদা কাপড় পরেন। শ্বেতাম্বররা মনে করেন জৈন ধর্মের বারোটি প্রাচীন 'অঙ্গ' গ্রন্থ আছে। এই বারোটি 'অঙ্গ' নামের ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও 'উপাঙ্গ' নামে আরও বারোটি ধর্মগ্রন্থ আছে। অঙ্গ ও উপাঙ্গ ছাড়াও আরও কিছু গ্রন্থকে শ্বেতাম্বররা জৈন ধর্মের অন্তর্গত বলে মনে করেন।

দিগম্বরপন্থীরা মহাবীরের সময়ের আগে লেখা কোনও জৈন-গ্রন্থকেই প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে না। দিগম্বরপন্থীদের কিছু ধর্মীয়গ্রন্থ আছে, যেগুলো চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত। সে'সব গ্রন্থ মহাবীরের সময়ে ও পরবর্তীকালে লেখা।

পার্শ্বনাথের চতুর্যাম শ্বেতাম্বররা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেন। দিগম্বররা মানেন মহাবীরের পঞ্চব্রত। দিগম্বররা কিছুটা কট্টরপন্থী। তাঁরা মনে করেন, (১) নারীরা মোক্ষলাভের অধিকারী নয়। (২) চিত্রে বা মূর্তিতে তীর্থঙ্করদের নগ্ন রাখতে হবে, চোখ থাকবে মুদ্রিত। (৩) জৈন শ্রমণ অর্থাৎ জৈন সাধুদের নগ্ন থাকতে হবে। (৪) প্রকৃত জ্ঞানীদের কোনও খাদ্যগ্রহণের প্রয়োজন হয় না, যেমন হয়নি মহাবীরের। (৫) মহাবীরই শেষ প্রকৃতজ্ঞানী বা তীর্থঙ্কর। (৬) সব শাস্ত্র ও ধর্মীয় গ্রন্থই মানুষের লেখা, তাই চিরন্তন বা শাশ্বত নয়। এই শেষ বক্তব্যের মধ্যে বেদকে অস্বীকার করা হয়েছে স্পষ্ট ভাবে।

জৈনদের এই দুটি ভাগ আবার পরবর্তীকালে আরও কিছু উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। শ্বেতাম্বররা তিনটি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত—মূর্তিপূজক, তেরপন্থী ও স্থানকবাসী।

উত্তরভারতে শ্বেতাম্বরদের প্রাধান্য রয়েছে। দিগম্বররা পাঁচটি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত। এরা হলো — বীসপন্থী, তেরপন্থী, তোতাপন্থী, তারণপন্থী এবং গুনামপন্থী। দক্ষিণভারতে এদেরই প্রাধান্য। ভারতে সামগ্রিকভাবে শ্বেতাম্বরপন্থীদের-ই স্পষ্ট প্রাধান্য রয়েছে।

স্যাদ্‌বাদ বা আপেক্ষিক গুণবাদ

জৈনরাই প্রথম 'আপেক্ষিক গুণবাদ' বা স্যাদ্‌বাদের কথা বললো। এই মতবাদের মূল কথা—কেউ যখন কোনও বস্তুর বর্ণনা দেয়, তখন সে তার ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান থেকে দেয়। বস্তুর এই বর্ণনা তখনকার মত সত্য হলেও নিত্য সত্য নয়। স্যাদ্‌বাদে ছয় অন্ধের হাতি দেখার কাহিনী বলা হয়েছে। একই হাতি কারও কাছে দড়ির মতো, কারও কাছে গুঁড়ির মতো, কারও কাছে বা সাপের মতো। এ'সবই আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নয়।

ভোরের সূর্য ও গোধূলির সূর্য লাল টুকটুকে। দুপুরের সূর্য যখন মধ্য আকাশে, তখন সে আগুনের গোলা। এ'সবই সত্যি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সত্যিটা পাল্টে যায়, যাকে বলে 'আপেক্ষিক গুণ'। আপেক্ষিক গুণ সংক্রান্ত মতবাদই 'স্যাদ্‌বাদ'।

যুক্তিবাদের একটি সিদ্ধান্তের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই স্যাদ্‌বাদে।

মোক্ষ

জৈন মাত্রেই নিরীশ্বরবাদী। জৈন ধর্মগ্রন্থের লেখকরা ঈশ্বর ধারণাকে খণ্ডন করেছিলেন।

জৈনরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না বটে, কিন্তু দেবতায় বিশ্বাস করে। জৈন ধর্মে দেবতা ও ঈশ্বরের সংজ্ঞায় যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। জৈনরা গুণের প্রতীককে 'দেবতা' বলে। দেবতার কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নেই। পার্থিব কোনও কিছু দেবার ক্ষমতা নেই। মানুষ সাধনার দ্বারা গুণ অর্জনের মধ্য দিয়ে দেবতা হতে পারে।

বৌদ্ধদের একাধিক সম্প্রদায় মনে করে, যে কেউ সাধনার দ্বারা বৌদ্ধত্ব লাভ করতে পারে, বুদ্ধ হতে পারে। জৈনদের 'দেবতা' ধারণা অনেকটা এইরকম। তারা মনে করে, সাধনা ও জ্ঞানার্জনের ফল হিসেবে পরজন্মে দেবতা হওয়া যায়। এই দেবতারা জন্ম-মৃত্যুর অধীন। দেবতা জন্মে খারাপ কাজ করলে পরজন্মে কীট হয়ে জন্মাতে পারে। অর্থাৎ জৈনরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী।

দেবতা হওয়ার উপায় কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি। মুক্তির জন্য জরুরি (১) সম্যক জ্ঞান, (২) সম্যক দর্শন, (৩) সম্যক চরিত্র। দেবত্ব লাভ বা মোক্ষ লাভের এই

তিন আবশিক শর্তকে বলে 'রত্নত্রয়'।

'সম্যক জ্ঞান' বলতে জৈন ধর্ম বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞান ও স্বচ্ছ বা স্পষ্ট জ্ঞানকে নির্দেশ করা হয়েছে।

'সম্যক দর্শন' অর্থে জৈন ধর্মের নীতিতে অবিচল থাকার কথা বলা হয়েছে।

'সম্যক চরিত্র' বলতে জৈন ধর্মের নীতি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে।

জৈন সংঘ

জৈন সংঘ ও বৌদ্ধ সংঘের আদর্শ মোটামুটি একই। আদিম উপজাতি সম্প্রদায়ের মত জৈন সংঘেও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু ছিল না। শ্রমণদের সমস্ত রকমের জাগতিক ইন্দ্রিয় সুখকে বর্জন করত হত। আহার ও শয্যা বিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশ ধর্ম-চ্যুতি হিসেবে গণ্য হত।

জৈন ধর্মের বিকাশ ভারতের বাইরে কোথাও হয়নি। ভারতের গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে জৈন ধর্মের মানুষরা সংখ্যায় যথেষ্ট। ১৯৬০-এর জনগণনা অনুসারে ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার জৈন ধর্মের মানুষ বসবাস করতো।

অণু-পরমাণু বা 'পুদ্‌গল'

জৈন দাশনিকদের মধ্যে পরমাণু সম্পর্কে ধারণা ছিল। জৈন দার্শনিকরা বললেন, স্থূল জড়বস্তুকে ভাঙা যায়। ভাঙতে ভাঙতে এমন একটা ক্ষুদ্রতম অংশে পৌঁছায়, যখন আর ভাঙা সম্ভব নয়। জড়ের বা 'পুদ্‌গল'-এর এই অবিভাজ্য সূক্ষ্ম কণাকে 'অণু' বলে। অণুই জড় জগতের মৌলিক উপাদান।

জৈন পরমাণুবাদের সঙ্গে ন্যায়বৈশেষিকদের পরমাণুবাদের গুণগত পার্থক্য আছে। ন্যায়বৈশেষিক মতে পরমাণুদের মধ্যে আবার গুণগত পার্থক্য আছে। জৈন মতে পরমাণুদের মধ্যে গুণগত কোনও পার্থক্য নেই। প্রতিটি পরমাণু সমগুণসম্পন্ন। উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতির ক্ষেত্রে জৈন দার্শনিকদের অবদান অনস্বীকার্য।

জৈন ও বণিক সম্প্রদায়

জৈন ধর্ম মূলত নীতিমূলক ধর্ম। এই উপাসনা ধর্মে অহিংসাকে বেশি রকম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অজ্ঞাতসারে একটি পোকাকে হত্যা করলেও তা পাপ। জৈনদের অনেকেই এক টুকরা সাদা কাপড় দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে রাখে, যাতে কোনও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী নাকে-মুখে ঢুকে গিয়ে মারা না যায়।

ভারতের বাইরে জৈন ধর্ম পা রাখতে না পারলেও ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে জৈন উপাসনা-ধর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল। এর পিছনেও কার্য-কারণ সম্পর্ক

ছিল। জৈন ধর্ম অহিংসার উপর এত বেশি জোর দিয়েছিল যে, কৃষিজীবীদের পক্ষে এই ধর্ম গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কারণ চাষের সময় গাছে পোকা লাগলে তা না মেরে হাতগুটিয়ে বসে থাকলে নিজেদের মরতে হয়। গাছে পোকা লাগা ও পোকাদের মেরে ফসল বাঁচানো কৃষিরই অঙ্গ।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি-জমিজমা কেনা জৈন ধর্মে নিষিদ্ধ। জমিজমা কিনে শ্রমজীবীদের দিয়ে চাষবাস করে আয়ের পথও ছিল বন্ধ। ফলে জৈন উপাসনা-ধর্মে দীক্ষিতরা ব্যবসার দিকে আকর্ষিত হয়েছিল। এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিল। গুজরাট মহারাষ্ট্রের উপকূলে নৌ-বাণিজ্যের সুবিধে ছিল। জৈন ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ পণ্যদ্রব্য নিয়ে জাহাজ ভাসিয়ে দিলেন। ব্যবসা যে ভালই চলছিল, সে খবর জানতে পারি বিভিন্ন শিলালিপি থেকে। এইসব শিলালিপিতে ব্যবসায়ীদের নানা দান-ধ্যানের খবর থাকতো।

সংঘগুলো ব্যাঙ্কের কাজও করতো। বণিকরা সংঘের মারফত সুদে টাকা ধার দিত। মহারাষ্ট্রের নাসিকে পাওয়া একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়, সুদের টাকায় একটি সংঘের কাজ পরিচালিত হত। বিজ্ঞানের উন্নতির পাশাপাশি ব্যবসার উন্নতির ক্ষেত্রেও জৈনদের অবদান স্বীকার করতেই হয়। জৈন ধর্ম-গ্রন্থগুলো থেকে আমরা জানতে পারি যে, আদিতে জৈনরা বাস করতেন প্রধানত কোসল, বিদেহ, মগধ ও অঙ্গ অঞ্চলে। তারপর আমরা জানতে পাচ্ছি কলিঙ্গ দেশে জৈনদের ছড়িয়ে পড়ার কথা। সেখানকার রাজা খারবেল জৈনধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর আমলে খণ্ডগিরি ও কুমারী পর্বতে কয়েকটি জৈন গুহা তৈরি হয়েছিল। পাবা'য় গড়ে উঠেছিল একটি মঠ।

জৈন ধর্ম তারপর ছড়িয়ে পড়ে মথুরায়। এই সময়টা হল প্রথম ও দ্বিতীয় শতক। এরপর জৈনদের প্রভাব ছড়ায় মালব ও উজ্জয়িনীতে। গুপ্তযুগের বিভিন্ন পুরাতত্ত্ব নিদর্শন থেকে জানা যায় সে সময় জৈন ধর্মের প্রভাব ছিল।

পাহারপুর, তক্ষশীলা ও গুজরাটে জৈন ধর্ম প্রভাব বিস্তার করে।

সপ্তম থেকে দশম শতকে জৈন ধর্মে দেখা দেয় ভাটার টান। শেষ পর্যন্ত জৈন ধর্ম টিকে রইলো কিছু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে, যাদের সিংহভাগই গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশবাসী।

প্রাচীন ভারতে নাস্তিক্যবাদ-ই ছিল মূলস্রোত

মনে হয় এতক্ষণের আলোচনায় এটা স্পষ্টতর হয়েছে যে, প্রাচীন ভারতে নাস্তিক্যবাদ-ই ছিল মূল স্রোত। ভারতের নাস্তিক্যবাদের ঐতিহ্য বলতে আমরা শিক্ষিত বাঙালিদের অনেকেই শুধু চার্বাক মতবাদকে-ই বুঝি। এবং কেউ কেউ আরও একটু এগিয়ে চার্বাক মতবাদকে প্রাচীন ভারতের একমাত্র নাস্তিক্য মতবাদ বলে ধরে নিয়েছি। যেহেতু চার্বাক দর্শন নিয়ে বাংলা ভাষায় একাধিক ভাল বই আছে, তাই আমরা

আলোকিত চার্বাককেই শুধু দেখেছি।

আমরা বঙ্গভাষীরা ভারতের নাস্তিক্য ঐতিহ্য যে'ভাবে দেখছি, সেটা আসল সত্য নয়। প্রাচীন ভারতে বেশ কিছু নাস্তিক্য মতবাদ ছিল। এইসব মতবাদের মধ্যে বৌদ্ধ, মীমাংসা'র মত আরও কিছু নাস্তিক্য মতবাদ ছিল, যে'গুলো সন্দেহাতীতভাবে চার্বাক নাস্তিক্যবাদের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে থাকা, অনেক বেশি প্রগতিশীল।

আধুনিক নাস্তিক্যবাদ 'মার্কসবাদ'

কার্ল মার্কস পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানীদের অন্যতম। জন্ম ১৮১৫ সালের ৫ মে, জার্মানির ট্রায়ার শহরে।

প্রথম যৌবনে জার্মানির অত্যন্ত নামী দার্শনিক জর্জ হেগেল-এর মতবাদে অনুপ্রাণিত হন। সমাজ বিষয়ে মার্কস যে নিজস্ব মতবাদ গড়ে তুলেছিলেন, তাতে স্পষ্টতই হেগেলের প্রভাব ছিল। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, রাষ্ট্র, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মার্কস হেগেলের চিন্তার ছায়ায় বিচরণ করেছেন।

হেগেলের চিন্তাতেই সর্বপ্রথম গোটা মানব সমাজের পরিবর্তনের একটা বিস্তৃত রূপ ফুটে ওঠে। কিন্তু একই সঙ্গে হেগেল ছিলেন একজন ভাববাদী। তাঁর মতামত 'Hegel's Absolute Idealism' নামে বিখ্যাত।

আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্তে ভাবানুবাদ করে আমরা বলতে পারি 'হেগেলীয় পরম ভাববাদ'। হেগেল তাঁর মতবাদে বলেছিলেন, মন (mind) ও জড় পদার্থ (matter) পরস্পর বিরোধী মনে হলেও আসলে দু'য়ের মধ্যেই পরমচৈতন্যের (absolute consciousness) প্রকাশ ঘটে। এই যে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব, তা আসলে দুয়ের সমন্বয়েরই প্রকাশ।

একটা সময় এলো যখন হেগেলের ভাববাদী মতবাদকে ভুল বলে মার্কস খণ্ডন করলেন। এই সময়ে জার্মানির অন্যতম দার্শনিক ছিলেন লুডউইগ ফায়ারবাখ। ফায়ারবাখের মতামতের প্রতি মার্কস আকৃষ্ট হলেন।

ফায়ারবাখের মতামত ছিল বড় বেশিরকমের বস্তু (matter) নির্ভর। মানুষের চিন্তা-ভাবনা-যুক্তি তাঁর কাছে ছিল একেবারেই মূল্যহীন। মানুষের কর্মময় জীবন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনার সামান্যতম অবদান আছে বলে তিনি মনে করতেন না। মনে করতেন সময়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন চরিত্রের জন্ম। সময়ের প্রয়োজনেই বিভিন্ন প্রতিভার আবির্ভাব। আলেকজান্ডার থেকে শেক্সপিয়ার সবারই আবির্ভাব সময়ের প্রয়োজন মেটাতে। যেন, যা ঘটে চলেছে, তা ঘটতোই। সব-ই অনিবার্য। এও এক নিয়তিবাদ। সবই বড় বেশি রকমের যান্ত্রিক।

এক সময় ফায়ারবাখের মতবাদকে মার্কস 'যান্ত্রিক বস্তুবাদ' হিসেবে চিহ্নিত

করেন। মানব সমাজকে চিনতে-জানতে মার্কস বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে পড়াশুনো শুরু করেন। তারই পরিণতিতে পৃথিবী পেলো মার্কসের প্রয়োগ দর্শন 'Philosophy of Practice', যা সত্যই অমূল্য।

মার্কস তাঁর সমাজতত্ত্বে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করে আদিম মানব সমাজ থেকে আগামী কালের আর্থ-সামাজিক বিন্যাস ও বিবর্তনের কথা বললেন। মানুষের দ্বারা মানুষকে শোষণ করার যে প্রক্রিয়া চলছে, তার অবসান ঘটানোর দিশা দেখাতে চাইলেন। মানুষের চিন্তা-বুদ্ধি-যুক্তির ওপর গুরুত্ব দিলেন। তিনি বললেন, মানুষ যখন যুক্তির প্রয়োগ করে তখন একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই করে। যুক্তি মেনে চললে বস্তুবাদী হতেই হয়।

মার্কসের মতবাদ নিরীশ্বরবাদী, নিয়তিবাদ বিরোধী, আত্মার অমরত্ব তত্ত্বের বিরোধী। বস্তুবাদী মার্কসের মতামতে অলৌকিত্বের কোনও জায়গা নেই।

মার্কস ছিলেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী। তিনিই প্রথম স্বপ্ন দেখিয়ে ছিলেন শোষণহীন সমাজের। মার্কস মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, মার্কসবাদ সমাজ বিজ্ঞান, মার্কসবাদ কোনও সামগ্রিক দর্শন নয়।

১৮৮৩ সালে মার্কসের মৃত্যু 'দাস ক্যাপিটেল' গ্রন্থের কাজ শেষ না করেই। শেষ করলেন মার্কসের সহযোদ্ধা এ্যঙ্গেলস। ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে ঘটলো রুশ বিপ্লব। মার্কসবাদকে দেশোপযোগী, কালোপযোগী করতে লেনিন লিখলেন চৌত্রিশ খণ্ডের গ্রন্থ। এই গ্রন্থে উৎসারিত মতবাদই 'লেনিনবাদ' নামে খ্যাত।

এখনকার কিছু 'অতি বিপ্লবী' লেনিনকে 'শোধনবাদী' বলেন। মার্কসবাদে গতিশীল করতে গিয়ে সেইসব বালখিল্যের খোঁচা লেনিনকে সহ্য করতে হয়েছিল, যারা স্থবিরপন্থী। কিন্তু এরপরও 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ' শব্দটি একই সঙ্গে উচ্চারিত হয় প্রায় সর্বত্র। মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে দেশোপযোগী ও কালোপযোগী করে চিন ও ভিয়েতনামে সার্থক প্রয়োগ করেছিলেন মাও জে দং এবং হো চি মিন।

'বস্তুবাদ' বা 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ' এতই বিশাল এক তাত্ত্বিক মতবাদ যে, তার থেকে অতি সংক্ষেপে কিছু জরুরি মতামত তুলে দেওয়াটা আমার পক্ষে হয়তো বড় রকমের ধৃষ্টতা হয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজনের তাগিদে এমন একটা ধৃষ্ট কাজে বাধ্য হচ্ছি বলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। লেখার এই অংশটা একটু বেশি অ্যাকাডেমিক। কারও কারও কাছে বিরক্তিকর মনে হতে পারে জেনেও লেখার প্রয়োজন অনুভব করছি।

নির্যাসে বস্তুবাদ, মার্কসবাদ - লেনিনবাদ

মার্কসবাদে বিশ্বাসীরা বস্তুবাদী। বস্তুবাদীদের চিন্তায়—বস্তুময় পৃথিবীর সৃষ্টি চৈতন্যময় মানুষের আগে। তারপর পরিবেশগত নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক সময় এমন একটা অনুকূল অবস্থা এসেছে, যখন প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে। এক কোষী প্রাণী থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। বিবর্তনের মধ্য দিয়েই আধুনিক মানুষের উৎপত্তি।

● বস্তুর সৃষ্টি নেই, ধ্বংস নেই। চিরন্তন। মানুষের দেহ বস্তু দিয়েই তৈরি। বস্তুই মুখ্য। চৈতন্য বস্তুরই পরিবর্তিত রূপ।

(What is Philosophy? by G. Kirilenko, L. Korshunova, Progress Publishers, Moscow, 1985-এর নির্যাস)।

● মার্কসবাদ চায় শ্রেণীহীন একটা সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে। এই সমাজ 'শোষক' ও 'শোষিত' এই দুটি শ্রেণী থাকবে না। থাকবে না কোনও শোষণ ব্যবস্থা। প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব।

● মার্কসীয় চিন্তায় 'রাষ্ট্র' হল শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ার। রাষ্ট্রের মূল নীতি হল, অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারীদের একনায়কত্ব।

● 'প্রলেতারিয়েত' শব্দের অর্থ হল শ্রমিক শ্রেণী। শ্রমিকরা পুঁজিপতিদের কাছে শ্রম বিক্রি করে পুঁজিপতি দ্বারা শোষিত হয়। শোষিত এই শ্রমিক শ্রেণীই জনগণের সংগ্রামকে পরিচালনা করে এবং শেষ পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অবসান ঘটে শোষণের।

● মার্কসবাদের মতে, বস্তুবাদ নির্ভর করে যুক্তি, বিজ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞানের উপরে। একজন বস্তুবাদীর মধ্যে থাকবে জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসাই তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও যাচাই করতে উদ্দীপ্ত করবে। যুক্তির প্রয়োগ করবে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এগুলোই হল দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য।

'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ' সমাজবিদ্যার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য হল :

● সমাজে এই তত্ত্ব প্রয়োগের আগে যে অঞ্চলে প্রয়োগ করা হবে সেই অঞ্চলের মানুষদের বিষয়ে নানা রকমের তথ্য সংগ্রহ জরুরি। তথ্য সংগ্রহ করতে হবে সরাসরি মানুষের কাছে গিয়ে প্রশ্নমালার ভিত্তিতে। প্রশ্নমালা এমন হবে যাতে এর সাহায্যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর, গোষ্ঠীর ও পেশার মানুষদের আর্থিক অবস্থা, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, কুসংস্কার, শিক্ষা, সাধারণ জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানা যায়।'

● এই সমীক্ষার ওপর ভিত্তি করে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি, কীভাবে এই জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক চেতনা বৃদ্ধি করবো।

● দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ওপর নির্ভর করে মার্কস মানুষের বিবর্তনের যে বিশ্লেষণ করেছেন, তাকে বলা হয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

● মানব সমাজের বিবর্তন বা পরিবর্তনের ক্রমপর্যায়গুলো হল—আদিম গোষ্ঠীতান্ত্রিক, দাসপ্রথাধীন, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক, সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম।

● প্রত্যেক দেশের সামাজিক ও প্রাকৃতিক কিছু নিজস্বতা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই এক দেশের বিপ্লবের প্রয়োগ কৌশল আর এক দেশে যান্ত্রিক ভাবে প্রয়োগ করলে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। (হো চি মিন বলতেন, একজন সাচ্চা কমিউনিস্টকে প্রাথমিকভাবে একজন জাতীয়বাদী হতে হবে। তারপর নিজেকে একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। নিজের দেশের মানুষ, দেশের প্রকৃতিকে ঠিক-ঠাক মতো চিনে না নিতে পারলে, বিপ্লব পরিস্থিতি গড়ে তোলা সম্ভব নয়)।

● 'উৎপাদন সম্পর্ক' মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগের প্রক্রিয়ার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক-ই হল উৎপাদন সম্পর্ক।

● উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস।

● 'সমাজ' হল একটা ব্যবস্থা এবং জনগণ তার মূল উপাদান।

● সমাজের 'বনিয়াদ' বা কাঠামো হল উৎপাদন সম্পর্কের প্রণালী। 'উপরিকাঠামো' হল রাজনীতি অর্থনীতি থেকে নন্দনতত্ত্ব, কুসংস্কার, উপাসনা-ধর্ম ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সমস্ত কিছু।

● 'বনিয়াদ' 'উপরিকাঠামো'কে প্রভাবিত করে। আবার উপরিকাঠামো বনিয়াদকে প্রভাবিত করে।

● পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন সমাজ জীবনের সমগ্র পরিমণ্ডলের মৌলিক গুণগত পরিবর্তন। কী মালিকানা সম্পর্কের, কী সাংস্কৃতিক জগতের—সর্বত্রই এই গুণগত পরিবর্তন জরুরি।

● সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল—ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে সমাজের সকলের মালিকানার প্রতিষ্ঠা। তারপর যা সব চেয়ে জরুরি তা হল, পরিকল্পিত অর্থনীতি গ্রহণ করে শোষণের অবসান ঘটানো।

● সমাজতন্ত্রের নীতি — প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ অনুসারে কাজ নেওয়া ও প্রত্যেককে তার কাজ অনুসারে পারিশ্রমিক দেওয়া। একজন ডাক্তার ও একজন অদক্ষ কর্মী একই সুযোগ-সুবিধে ও পারিশ্রমিক পাবে না। সবার সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব নেওয়া হবে। কেউ সামর্থ থাকা সত্ত্বেও শ্রম দিতে না চাইলে তাকে নির্বাসনে পাঠানো হবে। কেউ অক্ষম হয়ে পড়লে তার দায়িত্ব দেশ নেবে।

● জাতিভেদ প্রথা ও কুসংস্কার উৎখাত করা ছাড়া সমাজবিকাশ অসম্ভব। (What Is Historical Materialism? Progress Publihers, Mowcow 1985., Page 96)

● লেনিন অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছিলেন—কোনও পার্টি ঠিক পথে চলছে কি না—সেটা বিচার করতে হবে সেই পার্টির কাজ-কর্ম বিশ্লেষণ করে। পার্টির গাল ভরা বিপ্লবী নাম ও কর্মসূচীর ঘোষণা দেখে নয়। (V.I.Lenin 'The Grand Total', Collected Works, Vol 17, Page 294)

● বুর্জোয়া গণতন্ত্র (যে গণতন্ত্র ভারত সহ বহু দেশে প্রচলিত) আসলে শ্রমজীবী ও শোষিত মানুষদের ওপর সংখ্যালঘু ধনী শোষকদের একনায়কত্ব।

● মার্কসবাদ একটি নিরীশ্বরবাদী মতবাদ। এই মতবাদে আত্মার অমরতা, নিয়তিবাদ, অলৌকিক বিশ্বাসকে অস্বীকার করা হয়েছে। মার্কসবাদী হওয়ার আবশ্যিক শর্তের মধ্যে পড়ে—তাকে নিরীশ্বরবাদী হতে হবে, আত্মাকে অবিনশ্বর মনে করা ও নিয়তিবাদে বিশ্বাস করা ছাড়তে হবে।

● আদিম মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিতে ভয় থেকে পুজো করতো। আধুনিক যুগের অজ্ঞ মানুষও নিজের অসহায় শোষিত অবস্থা থেকে মুক্তির কামনায় উপাসনা-ধর্মে ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। ধর্ম (religion) শোষণ ব্যবস্থাকে আড়াল করতে সাহায্য করে। এ'ভাবেই ধর্ম শোষণ ব্যবস্থাকে টিকে থাকতে সাহায্য করে। ধর্ম শেষিতদের শিক্ষা দেয় সহনশীলতা।

এই হল খুব সংক্ষেপে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, যা একই সঙ্গে নিরীশ্বরবাদী ও শোষণহীন সমাজ তৈরি করতে প্রত্যয়ী একটি সমাজ বিজ্ঞান।

মার্কসবাদের সেই সময়, এই সময়

কার্ল মার্কস পৃথিবীর প্রথম চিন্তাবিদ, দার্শনিক, যিনি শোষণহীন এক সমাজ ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। তাঁর আগে শোষণকে মানুষ স্বাভাবিক সামাজিক নিয়ম বলেই মনে করতো। পৃথিবীতে রাজা-প্রজা থাকবে, ধনী-গরিব থাকবে, কেউ খাটবে কেউ খাটাবে—এমনটাই তো নিয়ম। শোষিত মানুষদের মধ্যে নতুন ভাবনা এনে দিলেন মার্কস। মার্কসকে শুধু সমাজবিজ্ঞানী ভাবলে ভুল হবে। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

একশো বছরের বেশি সময় আগে মার্কস যা লিখে গিয়েছিলেন, তা হয়তো সেই সময়ে প্রয়োগ করার অবস্থায় ছিল। মার্কস তাঁর জীবনকালে ধনতন্ত্রের যে রূপ, কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য দেখেছিলেন তা ছিল ধনতন্ত্রের 'হাটি-হাটি পা-পা' অবস্থা। ধনতন্ত্র এখন যে চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছে, তাতে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র শক্তির সমস্ত রকম ক্ষমতাই বিশালতা পেয়েছে। ধনতান্ত্রিক রাষ্টগুলোর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আজ বহুজাতিক সংস্থাগুলোর হাতে। বহুজাতিক সংস্থাই ঠিক করে দিচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি, বিদেশনীতি, দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিষয় থেকে কৃষিনীতি পর্যন্ত।

কোন সরকারকে ফেলতে হবে, কোথায় সেনা অভ্যুত্থান ঘটাতে হবে, কোন রাষ্ট্র-নায়ককে হত্যা করতে হবে—সবই ঠিক-ঠাক মতো করে চলেছে ধনতান্ত্রিক শক্তি। 'পেপসি-কোকাকোলা' নিজেদের স্পনসরকারী ক্রিকেট টিমকে জেতাতে 'ম্যাচ ফিক্স' করতে নেমে পড়েছে।

বিশ্বকাপ ফুটবলেও কালো ছায়া পড়েছে ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক কোম্পানি 'নাইক', 'রিবক'-এর। এ'হল দুই ধনী সংস্থার নিজেদের মধ্যেকার লড়াইকে খেলার জগতে নিয়ে আসার পরিণতি।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ইনফরমার ছড়িয়ে রয়েছে রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক জগতের বিভিন্ন স্তরে। এ'ছাড়াও নজরদারি করার জন্য অর্থ সাহায্যের নামে এক ধরনের দালাল তৈরি করা হয়েছে, যাদের বলা হয় এন. জি. ও বা বে-সরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। দেশের কোনও প্রান্তে শোষিতদের চেতনার জাগরণের কোনও প্রয়াস হলেই ধনতন্ত্রের তান্ত্রিকদের কাছে সে খবর মুহূর্তে পৌঁছে দিচ্ছে দালালরা। শত্রুকে অঙ্কুরে বিনাশ করাই ধনতন্ত্রের বর্তমান নীতি। যে দেশে এমন 'ধনতন্ত্র বিরোধী ষড়যন্ত্র' হচ্ছে, সে দেশের সরকারকে এ'বিষয়ে ওয়াকিবহাল করা হচ্ছে। সরকার তার সেনা-পুলিশ-প্রশাসন নিয়ে এমন সন্ত্রাস তৈরি করছে, যাতে শোষিতদের চেতনাকে জাগাবার কথা চিন্তা করতে গেলে ভয়ে শরীর হিম হয়ে যায়, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এশিয়া, পাকিস্তান থেকে ভারত—সর্বত্র একই অবস্থা।

এই পরিবর্তিত অবস্থাতেও মার্কসবাদকে অপরিবর্তিত রেখে প্রয়োগ সম্ভব বলে অনেক মার্কসভক্তরাই মনে করেন। এইসব গোঁড়া মার্কসভক্তরা তাঁদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে, সমাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখে যেমনটা ভাবেন, সমাজের বাস্তব চিত্র আদৌ তেমনটা নয়।

মার্কসের পর মার্কসবাদকে বিকশিত করার জন্য কোনও ইতিবাচক চেষ্টা না হলে মার্কসবাদ শুধু ইতিহাস হয়েই থেকে যাবে।

মার্কস মনে করেছিলেন শ্রমিক শ্রেণীই সবচেয়ে শোষিত শ্রেণী। সুতরাং ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে এই সর্বহারা শ্রমিকরা। মার্কস যখন এই উপলব্ধিতে গিয়েছিলেন, তখন হয় তো শ্রমিকদের অবস্থাটা তেমনই ছিল। কিন্তু আজকের শ্রমিকশ্রেণীকে সবচেয়ে শোষিত, সর্বহারা-শ্রেণী বলে চিহ্নিত করলে ভুল হবে। এখন শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা অনেক পাল্টেছে। আজ বড় শিল্পপতিদের অধীন শ্রমিকদের ফ্রিজ, টিভি, টু-হুইলার বা কার থাকাটা সাধারণ ব্যাপার। তুলনায় ক্ষেতমজুরদের

শোষণ এ'দেশে অনেক বেশি। ক্ষেত মজুরদের হাতে নগদ টাকা নেই, যা দিয়ে লজ্জা ঢাকতে কাপড় কিনতে পারে, রোগ হলে ওষুধ কিনতে পারে। দু-বেলা খাবার খাওয়াটাই যেন বিলাসিতা।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকরা নিশ্চিত জীবনের যে স্বাদ পাচ্ছে, তাতে তারা ধনতন্ত্রের উচ্ছেদে নেতৃত্ব দেবে—ভাবনাটার মধ্যে একটা বড় রকমের ভুল রয়েছে। বরং সর্বহারা শ্রেণী বলতে আমরা শোষিত, বঞ্চনার শিকার অসংগঠিত ক্ষেত মজুরদের চিহ্নিত করতে পারি। মার্কসবাদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থেই পারি।

মার্কসবাদ বলে, উৎপাদন সম্পর্কের উপর শ্রেণীগত অবস্থান গড়ে ওঠে। পুঁজির মালিক-ই উৎপাদন ব্যবস্থার অধিকারী বা বুর্জোয়া। পারিশ্রমিক দিয়ে শ্রমিকের শ্রম কেনে। শ্রম থেকে উৎপাদিত জিনিস বিক্রি করে সে অর্থের পাহাড় গড়ে। শ্রমিককে ঠকিয়েই মালিক মুনাফা করে। এই সর্বহারা শ্রমিকরা হল 'প্রোলিতারিয়েত'। বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতদের মাঝখানে রয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা 'পেটি-বুর্জোয়া'। বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় পেটি-বুর্জোয়ার অবস্থান প্রায় শূন্য। অর্থাৎ মধ্যবিত্তদের সমাজে অবস্থানও প্রায় শূন্য।

মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ফেলেছিলেন কৃষক, হস্তশিল্পী, ক্ষুদ্র উৎপাদক, সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, সুপারভাইজার ইত্যাদি পেশার মানুষদের। মার্কস এই মধ্যবিত্তদের রক্ষণশীল শ্রেণীর মানুষ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। বর্তমানে মধ্যবিত্তরা আর মার্কসের জমানায় নেই। বলতে কী, মার্কসীয় যুগের শ্রেণী-কাঠামোর চেহারা অনেকটাই পাল্টে গেছে। এখন আর বংশ পরম্পরায় কোম্পানির মালিকানা বর্তাচ্ছে না। মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে উঠে আসা পেশাদার কোম্পানি পরিচালকদের হাতে কোম্পানি পরিচালনার ভার চলে যাচ্ছে। এই পেশাদার পরিচালকরা অনেকেই পাচ্ছেন মাইনের সঙ্গে মালিকানারও অংশ।

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাও আমূল পাল্টে গেছে। এখন কোনও ব্যক্তি মালিকের খামখেয়ালিপনায় ব্যাঙ্ক চলে না। ব্যাঙ্কের কাজ-কর্ম দেখ-ভালের দায়িত্ব এখন মোটা মাইনের ডিরেকটর, ম্যানেজিং-ডিরেক্টর ও প্রফেশনাল ম্যানেজমেন্টের হাতে। এই কর্মচারীদের মার্কসীয় ধারণার মধ্যবিত্তশ্রেণীতে ফেলা যায় না।

ভারতের সর্বহারাদের রাজনৈতিক পার্টিগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, সেখানে সর্বহারাদের হারিয়ে মধ্যবিত্তদেরই রমরমা। সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, থেকে বিজ্ঞানী—সর্বত্রই একই চিত্র। মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই সবচেয়ে বেশি করে এঁরা উঠে আসছেন।

ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বহারাদের লড়াইতে এই নতুন গড়ে ওঠা মধ্যবিত্তশ্রেণী যে সর্বহারাদের হয়ে সর্বস্বপণ করে লড়াইতে নামবে না—এই বাস্তব অবস্থাকে বুঝতে হবে। অথচ ১৮৪৮-এর

'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তে বলা হয়েছে—পৃথিবীর এ'যাবৎকালের ইতিহাস
হলশ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। এই শ্রেণীসংগ্রাম সমাজের পুঁজিপতি
বিত্তবানদের সঙ্গে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার সংগ্রাম।
সমাজের এই দুই শ্রেণী হল প্রধান দুই প্রতিপক্ষ।
এই দুই শ্রেণীর বাইরে বা এর মধ্যবর্তী স্তরে
যে সব শ্রেণী রয়েছে, তারা বিপ্লবী পরিস্থিতি
সৃষ্টি হলেই সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে
মিশে যেতে বাধ্য হবে।

হয়তো সে'সময়কার মধ্যবিত্তদের শ্রেণী অবস্থান এমনই ছিল। কিন্তু আজ মধ্যবিত্তদের মূলস্রোত-ই ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামার মতো মানসিক অবস্থাতেই নেই। তারা বরং বর্তমানের স্থিতাবস্থায় সুখী।

চিন ও মাওবাদ

মার্কসের মূল লক্ষ—মানুষের ওপর মানুষের শোষণের অবসান। এই লক্ষকে সামনে রেখে মাও মার্কসবাদকে সময়োপযোগী, স্থানোপযোগী করে চিনে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে অসাধারণ সাফল্য আনলেন। চিন কৃষিপ্রধান দেশ। শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ কৃষিনির্ভর। শিল্প নেই। শ্রমিকের সংখ্যা অতি নগণ্য। মার্কস যদিও শ্রমিকদের বিপ্লবী শ্রেণীর ও কৃষকদের 'গ্রামীণ জড়বুদ্ধি মানুষ' (Village idiot) বলে মনে করতেন, কিন্তু মাও তাঁর দেশের কৃষকদের শোষিত ও সংগ্রামী বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি 'জনগণতান্ত্রিক' বিপ্লবের ডাক দিলেন। কৃষকদের নেতৃত্বে শুরু হল লড়াই। এই লড়াই ছিল জমিদার-জোতদার-সামন্তপ্রভু এবং ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে। বিপ্লবের মস্তিষ্ক মাও এই লড়াইতে ধনী কৃষকদেরও সঙ্গে নিয়েছিলেন। জমিদার ও সামন্তপ্রভুদের সঙ্গে ধনী কৃষকদের একটা বিরোধ ছিল। তাই তিনি এদের মিত্রশক্তি হিসেবে সঙ্গে নিয়েছিলেন। একই সঙ্গে সহযোগী ব্যক্তি হিসাবে লড়াইতে শামিল করেছিলেন শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী থেকে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের পর্যন্ত। তবে মূল বিপ্লবী শক্তি হিসেবে কৃষকশ্রেণীর সন্দেহাতীত প্রাধান্য ছিল। মাও পৃথিবীর প্রথম কৃষি সাম্যবাদের রূপকার। তিনি নিজের দেশের উপযুক্ত করে বিপ্লবের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন, নেতৃত্ব দিলেন এবং সফল হলেন।

ভারত ও চিনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয় প্রায় একই সময়ে। চিনা কমিউনিস্ট পার্টি পঁচিশ বছরের মধ্যে দেশে বিপ্লব ঘটিয়ে দিল। আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টি পঁচাত্তর বছর ধরে শুধু কৌশল, মিছিল, বন্‌ধ আর নির্বাচনের গোলকধাঁধাতেই ঘুরপাক খাচ্ছে।

ভারতে মাও চিন্তার প্রভাব

'নকশালবাড়ি' উত্তরবঙ্গের নেপাল সীমান্তে ছোট একটা গ্রাম। গ্রামবাসীদের মধ্যে আদিবাসীর সংখ্যাই বেশি। ছ'এর দশকের মাঝামাঝি। জঙ্গল সাঁওতাল ওই সময় নকশালবাড়ির কৃষক নেতা। সি.পি.আই (এম) করেন। দার্জিলিং জেলার সি.পি.আই (এম) নেতা বলতে তখন চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, সৌরেন বসু।

১৯৬৭-র এপ্রিলের শেষ দিকে দার্জিলিং জেলা ও শিলিগুড়ি মহকুমার কৃষক সভার নেতা ও কর্মীরা 'সিলিং' বহির্ভূত অর্থাৎ আইন মাফিক বেঁধে দেওয়া জমি রাখার সর্বোচ্চ-সীমা বহির্ভূত বে-আইনি জমি উদ্ধারের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ২০ থেকে ২২ মে নকশালবাড়ির প্রসাদ জোতের বেনামী জমি স্থানীয় কৃষকরা দখলে রাখে। ২২ থেকে ২৫ মে চলে সংগ্রামী কৃষকদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট পুলিশ বাহিনীর লড়াই। ১০ জন আদিবাসী কৃষকের মৃত্যু হয়।

এই ঘটনার খবর সারা ভারতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সি. পি. আই. (এম) রাজ্য নেতৃত্ব চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, সৌরেন বসু ও জঙ্গল সাঁওতালকে পার্টি থেকে বের করে দেয়। '৬৭-র শেষ দিকে সি.পি.আই (এম) পার্টিতে ভাঙন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত নকশালবাড়ির সংগ্রাম ব্যাপকতা লাভ করে।

১৯৭১-এ বাংলাদেশকে যুদ্ধে সাহায্য করতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি সেনা নামালেন। সেনা নামলো দুই বাংলাতেই। এ'পার বাংলায় আতঙ্ক, অত্যাচার ও গণহত্যার মধ্য দিয়ে নকশাল আন্দোলনের একটা অধ্যায়কে শেষ করা হয়েছিল।

১৯৬৫ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত চারু মজুমদার তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য আটটি প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই আটটি প্রবন্ধ আটটি দলিল হিসেবে পরিচিত হয়। প্রথম দলিলেই চারু মজুমদার জানিয়েছিলেন—ভারতীয় বিপ্লবের প্রধান স্তম্ভ কৃষি বিপ্লব।

১৯৬৭-র মে'তে যে 'কৃষি সাম্যবাদ' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রামের শুরু হয়েছিল এবং দ্রুত ব্যাপকতা পেয়েছিল—তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন মাও। '৬৭-র ২৬ জুলাই, ২ ও ১৭ আগস্ট এবং ১৬ ডিসেম্বর চিন থেকে প্রকাশিত 'শিনহুয়া নিউজ এজেন্সি'-র প্রতিবেদনে নকশালবাড়ির আন্দোলন সম্পর্কে মাও-এর বক্তব্য প্রকাশিত হল। মাও এই লড়াইকে নিপীড়িত শোষিত মানুষদের যথার্থ লড়াই বলে ঘোষণা করলেন।

নকশালবাড়ির ঐতিহাসিক ঘটনা ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। বহু শিল্পী-সাহিত্যিক-গীতিকার-চিন্তাবিদ তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে এই সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছিলেন। এঁদের সংঘবদ্ধ করে একটা শক্তিশালী সাংস্কৃতিক বাহিনী গড়ে তোলার জরুরি প্রয়োজন ছিল।

প্রয়োজন ছিল বিপ্লবের আগে একটা সাংস্কৃতিক বাহিনীর সাহায্যে নিয়ে জনসাধারণের সমর্থন আদায়ের। মিত্রশক্তি হিসেবে চিন্তাবিদদের সঙ্গে পাওয়ার প্রয়োজনীয়তার যে কথা ইয়েনানে মাও বলেছিলেন। নকশাল নেতৃত্ব সে'কথায় তেমন আমল দিলেন না।

বিপ্লবের আগে, বিপ্লবের সময়, বিপ্লবের পরে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যে কোনও বিকল্প নেই—তাই প্রমাণিত হয়েছে। পৃথিবী জুড়ে সমাজতান্ত্রিক দেশের নেতারা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বে-হাজিরায় নিজেদের দুর্নীতি ও স্বজনপোষণে এতই ব্যস্ত রেখেছেন যে, বুর্জোয়া নেতার সঙ্গে কমিউনিস্ট নেতার পার্থক্য গিয়েছিল মুছে।

অনিবার্য ফল— দেশের মানুষের সমাজতন্ত্রের উপরে বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা প্রবল হয়েছে। তারপর শুরু হয়েছিল পতনের কাউন্ট ডাউন।

নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তির পর বিশ্লেষণে নেমেছেন অনেকেই। কী কী কারণে সংগ্রামের বিকাশ না ঘটে এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়ালো? কেন এই ব্যর্থতা?

ব্যর্থতার কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হল সাংস্কৃতিক আন্দোলন, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অনুপস্থিতি। জনচেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অনুপস্থিতি।

আশির দশকে বিপ্লবের অগ্রবাহিনী হিসেবে উঠে এল সমকালীন যুক্তিবাদী আন্দোলন। যে যুক্তিবাদ সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চির আধুনিক যুক্তিবাদ এবং একই সঙ্গে একটি সম্পূর্ণ দর্শন এবং একটি সার্বিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

সে আর এক ইতিহাস।

অধ্যায় ঃ তিন

'সমকালীন যুক্তিবাদ' নাস্তিক্যবাদের সঙ্গে বাড়তি কিছু

'সমকালীন যুক্তিবাদ' চির নতুন

'সমকালীন যুক্তিবাদ' (Contempory Rationalism) একটি বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতি, একটি সম্পূর্ণ দর্শন ও একটি সার্বিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নাম।

কথা হচ্ছিল স্বপ্নময় চক্রবর্তীর সঙ্গে। স্বপ্নময় ভাল গল্প লেখেন, উপন্যাসও। কলকাতা বেতার কেন্দ্রের বিজ্ঞান বিভাগের প্রযোজক ছিলেন। এখন চাইবাসার স্টেশন ডিরেক্টর।

বেতারের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর উপর কিছু দায়িত্ব বর্তেছিল এই নিয়ে 'পেপার' তৈরি করার। সেই স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমাকে বলছিলেন, ''আমি আমার তৈরি 'পেপার'এ লিখলাম, ৭৫ বছরের সেরা 'টক শো' ছিল আপনার জ্যোতিষের বিরুদ্ধে করা প্রোগ্রামটা। ১৯৮৫ তে প্রোগ্রামটা ব্রডকাস্ট হয়েছিল। সেই সময় আপনি প্রায়ই নতুন নতুন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব নিয়ে আসতেন। তাতে আমাদের বেতারের জনপ্রিয়তা বেড়েছিল।

''এই কথাগুলো আমি লিখলাম। সত্যি মনে হয়েছিল বলেই লিখলাম। কিন্তু সত্যি কথাগুলোর প্রচার বন্ধ করতে লড়ে গেলেন '৮৫-র বিজ্ঞান বিভাগের প্রোডিউসার। আমি জানি, গোটা পরিকল্পনাটাই ছিল আপনার। কিন্তু .... বাবু কৃতিত্বটা পুরোপুরি নিজে নিতে কোথায় নামলেন, ভাবা যায় না।

''এ দেশের যুক্তিবাদী আন্দোলনের শুরুরও একটা ইতিহাস আছে। নকশাল আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা মানুষগুলো। তাঁরাই গড়ে তুললেন যুক্তিবাদী আন্দোলন। সে আন্দোলন যে আপনারই 'ব্রেন-চাইল্ড', আপনিই যে পথিকৃৎ—এটাকে অস্বীকার করা মানে ইতিহাসকে অস্বীকার করা।''

স্বপ্নময়ের অনুভবে—যুক্তিবাদী আন্দোলন একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন। বিপ্লব

পরিস্থিতি তৈরিতে যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রয়োজন আছে। তাঁর অনুভব মিথ্যে নয়।

'বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র প্রকাশিত ২০০২ এর ২১ ফেব্রুয়ারির প্রথম 'দলিল'-এর সুরুটা এ'রকম ঃ ''আমরা মনে করি আধুনিক 'দর্শন' 'সমকালীন যুক্তিবাদ'-এর স্রষ্টা প্রবীর ঘোষ। ....'সমকালীন যুক্তিবাদ' শুধু বিচার বিশ্লেষণের কিছু পদ্ধতিগত কায়দা-কানুন নয়, এই 'যুক্তিবাদ' একটি সামগ্রিক জীবন-দর্শন, একটি বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতি, একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি।''

'বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র এই দলিলের কোনও কথাই মিথ্যে নয়। বহু বিবর্তনের পথ ধরে আজ 'সমকালীন যুক্তিবাদ' একটা সম্পূর্ণ দর্শন হয়ে উঠেছে। এই দর্শন চির আধুনিক। কারণ 'সমকালীন যুক্তিবাদী' দর্শন শিখতে শিখতে পাল্টায়, পাল্টাতে পাল্টাতে শেখে।

'সমকালীন যুক্তিবাদ' যখন ছিল না, তখনও যুক্তি ছিল, যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া ছিল, যুক্তিকে 'দর্শন' হিসেবে দাঁড় করাবার প্রয়াসও ছিল। স্থান ও কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জগতকে দেখার সামগ্রীক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায়। পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি, পুরনো মতাদর্শ, মূল্যবোধকে ত্যাগ করার একটা বড় বাধা প্রাচীনপন্থী সমাজ। চিন্তায় এগিয়ে থাকা মানুষই পারে যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে ভালোকে গ্রহণ করতে ও খারাপকে ফেলে দিতে। এই যে চিন্তার সঙ্গে নিজের জীবনে তার প্রয়োগের মেলবন্ধন—এটাই সমাজকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সমাজ ততটাই এগোয় যতটা আমরা এগিয়ে নিয়ে যাই।

সমাজ-প্রগতির অর্থ সমাজের মুষ্টিমেয় শ্রেণীর প্রগতি হতে পারে না। শোষণের অবসান ছাড়া গোটা সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। ধনী-গরিব থাকলে শোষণ থাকবে। সমাজ-প্রগতির স্বার্থে, মানব প্রজাতির প্রগতির স্বার্থে যুক্তিবাদীরা শোষণের অবসান চায়। শুধু চাইলে তো হবে না, চাওয়াটাকে সফল করে তোলাটাই বড় কথা। যতক্ষণ আপনি শুধু চাইছেন, ততক্ষণ ধনীদের এ'নিয়ে মাথাব্যাথা নেই। আপনি সার্থক প্রয়োগের চেষ্টা করলে সংঘর্ষ অনিবার্য।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধনীরা নিত্য-নতুন কৌশল নিচ্ছে গরিবদের পায়ের তলায় রাখতে। পুঁজিবাদীদের কৌশলের সঙ্গে সার্থক মোকাবিলা করতে হলে যুক্তিবাদীদেরও নতুন নতুন কৌশল বের করতেই হবে। পুঁজিবাদের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিবাদকেও নতুন ভাবে সাজাতে হবে। পাল্টাতে হবে। যুক্তিবাদ'কে স্থবির মতবাদ করে রাখলে তা হবে যুক্তিবাদেরই মৃত্যু।

'যুক্তিবাদ' হঠাৎ করে আকাশ থেকে এসে পড়েনি। এই মতবাদের পরিপূর্ণ দর্শন হয়ে ওঠার একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। বুদ্ধ, মহাবীর, চার্বাক থেকে দেকার্ত, স্পিনোজা, হেগেল, কান্ট, মার্কস, লেনিন,

মাও—প্রত্যেকেরই অবদানের পরিণতিতে আজ 'যুক্তিবাদ' একটা
সম্পূর্ণ দর্শনের রূপপেয়েছে। 'যুক্তিবাদ' ও 'নব্য-যুক্তিবাদ-
এর পথ পরিক্রমা শেষে 'সমকালীন যুক্তিবাদ'-
এ এসে পৌঁচেছে। 'সমকালীন যুক্তিবাদ'
চিরকাল-ই সমকালীন থাকবে—
এমন-ই এক যুক্তিবাদ।

আমরা আগে যা আলোচনা করেছি, পরে যা আলোচনা করবো, তাতে আশা করি যুক্তিবাদের ইতিহাস ও আধুনিক যুক্তিবাদের স্বরূপ কিছুটা স্পষ্ট হবে।

যুক্তিবাদ ও যুক্তিবাদী সমিতি

'যুক্তিবাদ'কে সম্পূর্ণ দর্শন হিসেবে গড়ে তুলতে 'সমকালীন যুক্তিবাদ', চির আধুনিক যুক্তিবাদকে সম্পূর্ণ একটা রূপ দিতে এবং 'যুক্তিবাদী আন্দোলন'কে সার্বিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে প্রয়োগ করার চিন্তা থেকে 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র জন্ম। জন্মের সময় ১ মার্চ ১৯৮৫। সে সময় অবশ্য নাম ছিল 'ভারতের যুক্তিবাদী সমিতি'। লোকে সংক্ষেপে 'যুক্তিবাদী সমিতি' বলেন।

যুক্তিবাদী সমিতি গড়ে তোলার আগে ছিল একটা প্রস্তুতি পর্ব। সে সময়কার জনপ্রিয়তম বাংলা সাপ্তাহিক ছিল 'পরিবর্তন'। কয়েক বছর ধরে পরিবর্তনে 'লৌকিক, অলৌকিক' শিরোনামে বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরিবর্তনের ব্যাপক প্রচারের কল্যাণে আমার লেখাগুলো বেশ কিছু সংখ্যক পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরার সুযোগ পাই। সে'সব লেখাকে ভালোবাসার মানুষ পেয়েছিলাম প্রচুর। লেখার মূল সুরের সঙ্গে সহমত মানুষদের একটা নিবিড় সম্পর্কে গড়ে তুলি। গ্রামে-গঞ্জে-শহরে কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান করা শুরু করি। এক সময় মনে হল, এ'বার সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার সময় হয়েছে। তারপর এলো ১ মার্চ ১৯৮৫।

সমিতির একটা উদ্দেশ্যসূচী বা manifesto-র প্রয়োজন আমরা অনুভব করলাম। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই লেখা হলো 'সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ' গ্রন্থটি। প্রকাশিত হল '৯৩-এর ১ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বইমেলায়। গ্রন্থটিতে একই সঙ্গে দুটি বিষয়কে স্পষ্ট করা হল। (১) যুক্তিবাদ একটি সম্পূর্ণ দর্শন। (২) যুক্তিবাদ একটি সার্বিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মী, সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মী, সাম্যের স্বপ্ন দেখা রাজনীতিক এবং চিন্তাবিদদের অনেকের কাছেই গ্রন্থটি অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা পেল। দেখা গেল একটা বই বাম রাজনৈতিক দলের কর্মী ও নেতৃত্বের মধ্যে স্পষ্ট Polarization আনলো। অর্থাৎ বইটা এইসব রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃত্বকে সরাসরি দুই শিবিরে বিভক্ত করলো। একদল গ্রন্থটির বক্তব্যের পক্ষে, একদল বিপক্ষে।

বি.বি.সি-র প্রোডিউসর ইনচার্জ রবার্ট ঈগল ভারতে এলে ১৯৯৪-এ। উদ্দেশ্য ভারতের যুক্তিবাদী আন্দোলনের উপর এক ঘণ্টার একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করা।

'গুরু বাস্টার্স' নামের তথ্যচিত্রটির শেষ অংশে বিশেষজ্ঞের মতামতে বিশিষ্ট সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্ত জানালেন—ভারতের বাম রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই সরাসরি বিভাজন আছে, প্রবীর ঘোষের পক্ষে অথবা বিপক্ষে। ভারতের রাজনীতিতে প্রবীর ঘোষ এবং 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' একটা 'ফ্যাক্টর'।

তথ্যচিত্রটির বক্তব্য শুনে ও গোয়েন্দা দপ্তরের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করে রাষ্ট্রশক্তি যথেষ্ট শঙ্কিত হল। যুক্তিবাদী আন্দোলন ধ্বংস করতে দালালদের অনুপ্রবেশ ঘটলো যুক্তিবাদী সমিতিতে। নকশাল আন্দোলন ধ্বংসের জন্য যে সব কৌশল রাষ্ট্র গ্রহণ করেছিল, তার একটা ছিল, নকশালদের মধ্যে নিজেদের ইনফরমার বা দালাল ঢুকিয়ে দেওয়া।

গোটা যুক্তিবাদী সমিতি ও তার শাখা হিউম্যানিস্ট অ্যাসোশিয়েশনকে সরকারি ও বেসরকারি অর্থসাহায্যপুষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় রূপান্তরের পরিকল্পনা নিল রাষ্ট্র। পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রকে সার্থক করতে নেমে পড়লো অনুপ্রবেশকারী দালালরা।

রাষ্ট্রের সহায়ক শক্তি এবং জ্যোতিষী, অলৌকিক বাবাজী-মাতাজীরা দালালদের ক্ষমতা দখলের কাজে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল।

এত করেও রাষ্ট্র যুক্তিবাদী আন্দোলনকে শেষ করতে পারেনি। দালালরা পারেনি সমিতির দখল নিতে, সমিতিকে তৃণভোজী বানাতে।

যুক্তিবাদীরা পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছুই শিখেছিল। শিখেছিল 'মস্তিষ্ক যুদ্ধ'-এর পাল্টা 'মস্তিষ্ক যুদ্ধ' প্রয়োগ করতে। শিখেছিল—মানুষের থেকে বিচ্ছিন্নতার অর্থ—ধ্বংস। শিখেছিল লড়াইতে জনগণকে কাছে টানতে। ফলে যুক্তিবাদী আন্দোলনে শামিল করতে পেরেছে সাধারণ থেকে অসাধারণ মানুষেদের। তাঁরাই ছিলেন এই ভাঙার চেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যুক্তিবাদী সমিতির সহায়ক শক্তি। তাই আগুন থেকে ফিনিক্স পাখির মতই উঠে এসে আবারও ডানা মেলেছে যুক্তিবাদী আন্দোলন।

দীর্ঘকাল ধরেই বিভিন্ন দার্শনিক 'দর্শন' বা সামগ্রিকভাবে বিশ্বকে দেখার প্রজ্ঞা

নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, সমাজের হিত নির্ধারণ ও তার প্রয়োগ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। এখানেই প্রয়োজন ছিল এক মানবতাবাদী নীতিশাস্ত্রের। তাই সমকালীন যুক্তিবাদের প্রয়োজনে ১৯৯৩-এর ১১ সেপ্টেম্বর জন্ম নিল 'হিউম্যানিস্টস' অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া'। তারপর অনেক ঐতিহাসিক জয় এনেছে 'হিউম্যানিস্টস' অ্যাসোসিয়েশন।

১০ অক্টোবর ১৯৯৩ একটি ঐতিহাসিক দিন। এ'দিন 'Religion' কলামে 'মানবতাবাদী' লেখার আইনি অধিকার এনে দিল অ্যাসোসিয়েশন। ১৯৯৪-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফর্ম' থেকে 'Religion' কলাম বিদায় নিল।

১৯৯৯-এর ১০ ডিসেম্বর প্রকাশিত হল একটি বই, 'কাশ্মীর সমস্যা : একটি ঐতিহাসিক দলিল'। প্রকাশক হিউম্যানিস্টস' অ্যাসোসিয়েশন। দলিলটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মুখপাত্রে, বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে তা প্রকাশিত হল। এরপর কাশ্মীর প্রসঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও কেন্দ্রীয় সরকারের মতবাদ-ই গেল পাল্টে।

দেহ ব্যবসাকে আইনি করার একটা চক্রান্ত চলছিল গত কয়েক বছর ধরে। ২০০০ সালের আগস্টে বিলটা সংসদে ওঠার কথা ছিল। প্রচারের বদলে পাল্টা প্রচারে নামতে হয়েছিল। টিভি-তে বেশ কিছু এপিসোডে হিউম্যানিস্টস' অ্যাসোসিয়েশন এই চক্রান্তের স্বরূপ বে-আব্রু করেছে। সঙ্গে পেয়েছে বহু লেখক-সাংবাদিক-সমাজবিজ্ঞানীসহ অনেক বিশিষ্টদের এবং বিভিন্ন রাজনীতিকদের। ফলে শেষ পর্যন্ত চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে।

এমনই প্রায় অসম্ভব জয়ের তালিকা বড়-ই দীর্ঘ।

যুক্তিবাদ দর্শনের সাত-সতেরো

"বরং দ্বিমত হও, আস্থা রাখো দ্বিতীয় বিদ্যায়।
বরং বিক্ষত হও প্রশ্নের পাথরে।
বরং বুদ্ধির নখে শান দাও, প্রতিবাদ করো।
অন্তত আর-যাই করো, সমস্ত কথায়
অনায়াসে সম্মতি দিও না।
কেননা, সমস্ত কথা যারা অনায়াসে মেনে নেয়,
তারা আর কিছুই করে না,
তারা আত্মবিনাশের পথ
পরিষ্কার করে।"

—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কাঁথির একটি সংস্থা 'মুক্তায়ন'। মুক্তায়ন নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করে বছরে একবার। প্রচ্ছদেই ঘোষণা—একটি যুক্তিবাদী, মানববাদী সংস্থা। ভিতরে বিদ্যাসাগরের কথার চেয়ে বিবেকানন্দের বাণীর ভিড় বেশি। মুক্তায়নের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে মঞ্চে বসে পত্রিকাটিতে চোখ বোলাতে বোলাতে শিক্ষাবিদ সম্পাদক মশাইয়ের বক্তব্য শুনছিলাম মনে হল তিনি প্রতিজ্ঞা করে নেমেছেন, শ্রোতাদের বুঝিয়েই ছাড়বেন—বিবেকানন্দ বড় মাপের যুক্তিবাদী ছিলেন, তিনি আমাদের আদর্শ। তারপরেই আর এক ধাক্কা! তিনি বলতে লাগলেন, বিদ্যাসাগর আমাদের জেলার গর্ব। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি আমাদের আদর্শ।

বিবেকানন্দ আর বিদ্যাসাগর দু'জনের মূল নীতির অবস্থান দুই মেরুতে। বিবেকানন্দ বিধবা বিবাহের বিপক্ষে, বিদ্যাসাগর পক্ষে। বিবেকানন্দ সতীদাহ প্রথার সমর্থক, বিদ্যাসাগর চরম বিরোধী। বিবেকানন্দ বেদান্তবাদী, বিদ্যাসাগর বেদান্ত বিরোধী। দু'জনের বিরোধ এতই ব্যাপক যে ফর্দ বাড়াতে থাকলে একটা বই হয়ে যাবে। তারপরও দু'জনেই কোন যুক্তিতে 'আদর্শ' হন? মাথায় ঢোকে না। একজন ঈশ্বর বিশ্বাসী হিন্দুধর্মের প্রচারককে যুক্তিবাদী বলে চালাবার এই প্রবণতা শুধু কাঁথিতে আটকে নেই, ভারত জুড়েই সংক্রামিত হয়েছে? কেন?

'যুক্তি দিয়ে কি সব কিছুর ব্যাখ্যা দিতে পারেন?' প্রশ্নটা পেয়েছিলাম শিলচরের একটি অনুষ্ঠানে। উত্তর দিতে হল, "না পারি না। আজও আমরা ক্যানসারের উৎপত্তির কারণ খুঁজে পাইনি। কিন্তু খোঁজ চলছে। যুক্তির পথ ধরেই খোঁজ চলছে। যে ভাবে এইডস প্রতিরোধ করতে গবেষণা চলছে। পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের কাছে হাজারো বিষয়ের ব্যাখ্যা জানা ছিল না যুক্তি-বুদ্ধির পথ ধরে এগিয়েই আমরা তা জেনেছি, ভবিষ্যতেও জানবো।"

২০০২। ভারত তেতে আছে। সংঘ পরিবারের সদস্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, ভারতীয় জনতা পার্টি প্রায়ই হুংকার দিচ্ছে—এ'দেশে থাকতে হলে ভারতীয় দর্শনকে সম্মান দিতে হবে। বৈদিক ধর্ম অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের মানুষদের চাওয়াকে সম্মান জানাতে হবে। মোদ্দা কথায় বোঝাতে চাইছিল, বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির বানাতে চাওয়াকে মেনে নিতে হবে।

এ'সব খবর পত্রিকায় বেরোচ্ছে। আবহাওয়া গরম হচ্ছে। এক রবিবার সকালে জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটে গেছি। জ্যোতিদা সংঘ পরিবারের কথা টেনে তেতে উঠে বললেন, "কী ইডিয়টের মত কথা বলে চলেছে দেখেছো? ওরা দেশের ইতিহাসকেই পাল্টে দিতে চায়। 'ভারতীয় দর্শন' মানে শুধু 'বৈদিক দর্শন' বা 'হিন্দু দর্শন'—এই মিথ্যেটাকে ওরা এসটাবলিশ করতে চাইছে। বৌদ্ধ, জৈন, মুসলিম, খ্রিষ্টান, শিখ, ব্রাহ্ম—ইডিওলজি এ'দেশে আছে। এই সব ইডিওলজির অস্তিত্বকে

অস্বীকার স্পষ্টতই মিথ্যাচারিতা। ভারতের হিন্দু দার্শনিকরাও সংঘ পরিবারের এই মিথ্যাকে সত্যি করে তুলতে গোয়েবেলের ভূমিকা পালন করে চলেছে।"

দার্শনিক ধ্রুবজ্যোতি মজুমদারও ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কাটোয়ার একটি অনুষ্ঠানে মুখোমুখি হতেই,

"এদেশে সৎ দার্শনিকের সংখ্যা আঙুলে গোনা। বাকি সব্বাই হিন্দুত্ববাদের প্রচারক। এটা অনেক দিনের পুরোন রোগ। স্যার এস রাধাকৃষ্ণণের কথাই ধরুন। তিনি অনাত্মাবাদী বুদ্ধকে আত্মাবাদী বানিয়ে ছাড়লেন।

সৎ ইমেজের আড়ালে এঁরা কী ভয়ংকর রকমের অসৎ মানুষ—ভাবা যায়? স্যার এস রাধাকৃষ্ণণের লেখা Indian Philosophy, Vol-1, Page 355 খুললেই দেখতে পাবেন। ভারতে নিরীশ্বরবাদী দর্শনের রমরমার ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, মীমাংসার মত নিরীশ্ববাদী দর্শনকে 'খুব খারাপ দর্শন' বলে মিথ্যে প্রচারে শামিল so called দার্শনিকরা। যাঁরা জানেন এক রকম, জানান আর এক রকম, তাঁরা আবার দার্শনিক?"

বিপাশা চ্যাটার্জি দর্শনে এম.এ., ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিল। বিপাশা দুঃখ করছিল, "কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি—ভারতীয় দর্শন মানে বৈদিক দর্শন, মানে আস্তিক্য দর্শন, অধ্যাত্মবাদী দর্শন। কিন্তু এতো সত্যি নয়, ভারতে আরও বহু দর্শন ছিল, নাস্তিক্যবাদী দর্শন প্রবলভাবে ছিল। আমার ভাবনা জেনে প্রফেসররা স্পেশালি আমাকে পই-পই করে বলতেন, ভালো রেজাল্ট করতে হলে সত্যি বলে যা জেনেছো, তা লিখো না। বইয়ে যা আছে, তাই লিখো। রাষ্ট্র এবং সরকার শিক্ষাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে—ভাবলে ডিগ্রির জন্য মিথ্যে লিখতে ঘেন্না হয়।"

এ'গুলো কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ'সবই আমাদের অবিচ্ছিন্ন সমাজচিত্র। সত্যি বলতে কী—এ হল হিমশৈলের জেগে থাকা চুড়ো।

ভারতের এক সময়ের মূল চিন্তাধারা কি শুকিয়ে যাচ্ছে?

ভারতীয় দর্শনের মূল চিন্তাধারা বা আদি চিন্তাধারা ছিল নিরীশ্বরবাদী—এ'কথা আগেই বলেছি। সেই নিরীশ্বরবাদী চিন্তার ঐতিহ্যের সূত্র ধরে 'সমকালীন যুক্তিবাদ'-এর উৎপত্তি এই ভারতেই। 'সমকালীন যুক্তিবাদ' নাস্তিক্যবাদ বা নিরীশ্বরবাদের সঙ্গে বাড়তি কিছু।

সমকালীন যুক্তিবাদীরা মনে করেন না যে, একজন মানুষ নাস্তিক হলেই সে সুন্দর এক অসাম্যের সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে আদর্শ ভূমিকা পালন করবে। মানবিক গুণের আধার হবে।

নাস্তিক যদি স্বার্থপর ও অসৎ হয়, সে সমাজকে শুধু বিষই দিতে পারে। একজন নাস্তিক মানবিক গুণে ঋদ্ধ হলে তিনি আমাদের উদীপ্ত করেন, আদর্শ হয়ে ওঠেন।

ঈশ্বর, অলৌকিকতা, নিয়তি, জন্মান্তর, কর্মফল, মন্ত্র-তন্ত্র, তাগা-তাবিজ ইত্যাদি স্থূল কুসংস্কারের উর্ধ্বে থাকাটা 'যুক্তিবাদী' হওয়ার পূর্বশর্ত। কিন্তু শেষ কথা নয়। শেষ কথাটি হল—অবশ্যই তাকে মানবতাবাদী হতে হবে। অর্থাৎ 'মানবতাবাদী' হয়ে ওঠার পূর্বশর্ত, যুক্তিবাদী হতে হবে। আমরা বোধহয় বলতে পারি, 'যুক্তিবাদ' ও 'মানবতাবাদ' পরিপূরক একটা মতবাদ।

জীবনে এমন মোড় অনেক আসে, যখন স্পষ্ট করে 'না' বলতে হয়। ব্যক্তিত্বের অভাবে আমরা অনেক সময় 'না' বলতে পারি না। এর ফল হয় সুদূরপ্রসারী। কিন্তু একটা মতবাদ বা ism-এর ক্ষেত্রে নেতিবাচক শব্দের মানসিক প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক শব্দের তুলনায় খারাপ হতে বাধ্য।

'নাস্তিক্যবাদ' বা 'নিরীশ্বরবাদ' নেতিবাচক শব্দ। তাকে ইতিবাচক শব্দে পরিবর্তিত করে আমরা বলতে পারি 'যুক্তিবাদ'। যা পারি, তা করতে অসুবিধে কোথায়?

একটা সময়, সময়টা ধরুন আড়াই হাজার বছর আগের। সেই সময় থেকে আমাদের অভিজ্ঞতা (intellect) এবং আমাদের বুদ্ধি (reason) আমাদের মতামত (opinion) তৈরিতে সাহায্য করেছে। যতই সময় এগিয়েছে ততই আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতা থেকে ঋদ্ধ হয়েছি। এভাবেই মানুষ শিল্প-সাহিত্য-সংগীত-ক্রীড়া-বিজ্ঞান প্রতিটি বিভাগে এগিয়ে চলেছে। যে জয় গোস্বামীর অক্ষর জ্ঞানের শুরু হয়েছিল বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় দিয়ে, তারপর তিনি মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নীরেন্দ্রনাথ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পড়ে প্রতিনিয়ত পরিশীলিত হতে হতে আজকের শক্তিমান কবি জয় গোস্বামী হয়েছেন। তিনি যদি দু'শো বছর আগে জন্মাতেন, তবে তাঁর কবিতা দু'শো বছর পিছিয়েই থাকতো। এটাই নিয়ম।

তবে সবাই যে পূর্বসূরিদের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নিজের জ্ঞানকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধ প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌রা যে যুক্তি-বুদ্ধি-বিচার শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, আড়াই হাজার বছর পরেও এদেশের বহু আই এ এস, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ বুদ্ধের যুক্তি-বুদ্ধিকে আত্মস্থ করতে পারেননি। তাঁরা মানসিক ভাবে পড়ে আছেন আদিম সমাজের ম্যাজিক বিলিফের সময়ে।

এটা আমাদের মত পিছিয়ে পড়া দেশের আবেগপ্রবণ মানুষদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আবেগ সব সময় যুক্তির সবচেয়ে বড় শত্রু। শ্রীচৈতন্য নারী-পুরুষ ও জাত-পাতের

ভেদাভেদ ঘুচিয়ে নারী ও নিম্নবর্গীয়দের 'মানুষ' পরিচয়ে বাঁচার অধিকার দিয়েছিলেন। এর জন্য তাঁর অবশ্যই প্রশংসা প্রাপ্য। কিন্তু তিনিই এই বাংলার মানুষদের ভক্তি রসের আবেগে এমনই ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, বাংলার যুক্তি চর্চা, মুক্তচিন্তার চর্চা, তাতে খড়-কুটোর মতই ভেসে গিয়েছিল। তিনি যুক্তি চর্চার যে সর্বনাশ করেছিলেন, তার জন্য নিন্দাও তাঁর প্রাপ্য।

মানুষের ইতিহাসের দিকে চোখ রাখলে দেখতে পাবো—নানা উত্থান-পতন, অগ্রগামীতা-পশ্চাৎগামীতার পরও শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রগতির ধারা বজায় রয়েছে।

আমরা দেখেছি, শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীদের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বও বাতিল হয়েছে, নতুন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। তাই তো বিজ্ঞানী বলেন, "এখনও পর্যন্ত জানা তথ্যের ও তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে...।" হ্যাঁ, বিজ্ঞানী এ'ভাবেই বলেন। নতুন তত্ত্ব এসে পুরোন তত্ত্বকে বাতিল করে জায়গা করে নিতে পারে, এই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই এ'ভাবে বলেন। জিজ্ঞাসাই বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রশ্নাতীত আনুগত্য স্থবিরতা আনে, "আত্মবিনাশের পথ পরিষ্কার করে।"

বুদ্ধ কোনও গ্রন্থকেই স্বতঃপ্রমাণ, চির-সত্য বা absolute বলে মনে করতেন না। তিনি মনে করতেন, আজকের জানা ও ভবিষ্যতের জানা এক নাও হতে পারে; কারণ পূর্ব অভিজ্ঞতা জ্ঞানকে আরও পরিণত করে।

বুদ্ধের এক বৈপ্লবিক অনিত্য মতামতকে শ্রদ্ধা করেন অনেক মার্কসবাদী চিন্তাবিদ। আবার মার্কসবাদীদেরই অনেকে বলেন, 'মার্কসবাদ সর্বশক্তিমান, কারণ ইহা বিজ্ঞান'। এ'সব দেখে-শুনে শঙ্কিত হই—ওঁরা কি মার্কসবাদকে বেদ-কোরান-বাইবেল বানাতে চাইছেন? চির-সত্য বলে মনে করেন?

এই শঙ্কারই প্রতিফলন দেখেছি চিন্তাবিদ ও মার্কসবাদী জ্যোতি ভট্টাচার্যের লেখায়। 'জীবন, ধর্ম, রাজনীতি' প্রবন্ধে তিনি বলছেন, "মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে প্রায় আরেকটা প্রতিষ্ঠানিক ধর্মে রূপান্তর করার যে প্রচেষ্টা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে করা হয়েছে, সেটা অ-মার্কসীয়, অ-ধার্মিক (মানবধর্ম বিরোধী) এবং বিপজ্জনক। ঈশ্বরে যিনি বিশ্বাস করেন না, তিনি যদি ঈশ্বরের জায়গায় একজন বা কয়েকজন মানুষকে বসিয়ে সেই মানুষদের অলৌকিক ক্ষমতা বা দিব্যদৃষ্টিতে বিশ্বাস করতে থাকেন, নেতা বা পার্টিকে সর্বজ্ঞ, সদা অভ্রান্ত এবং পূজনীয় বলে ভাবতে থাকেন, তাহলে বিপদ কিছু কম হয় না। ভগবানের জায়গায় একজন মানুষকে বসিয়ে তাঁর পুজো করার চেয়ে ভগবানে বিশ্বাস ভালো—ভগবানে সেই বিশ্বাস যতক্ষণ একান্ত নিভৃতে আপন ব্যক্তিগত চর্চায় থাকে।" *('যুক্তিবাদীর চোখে ধর্ম' গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধ সম্পাদক : প্রবীর ঘোষ)*

জ্যোতি ভট্টাচার্যের এমন বক্তব্য তুলে ধরার জন্য কেউ কেউ আমার ওপর যথেষ্ট রাগ করতে পারেন, কারণ আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা এমনটাই। তাঁদের জন্য এবার লেনিনের একটি বক্তব্য তুলে ধরছি।

লেনিন লিখেছেন, "মার্কসের তত্ত্বকে আমরা সম্পূর্ণকৃত
ও অলঙ্ঘনীয় একটা কিছু
বলে মনে করি না;

বরঞ্চ আমরা প্রত্যয়শীল যে তা সেই বিজ্ঞানটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে সমাজতন্ত্রীদের যাকে অবশ্যই সকল দিকে বিকশিত করতে হবে, যদি তারা জীবনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে চায়।" (V.I.Lenin, Our Programe, Collected Works, Vol-4, Progress Publishers, Moscow, Page 211)

এরপরও একজন মার্কসের ভক্ত-পূজারী বিশ্বাসী কি বলতে পারেন—'মার্কসবা সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সদা অভ্রান্ত,অলঙ্ঘনীয়' ইত্যাদি বাতুল ও চটুল কথা? ভাবাবে ভেসে যাওয়া মার্কস-ভক্তের তো আর মার্কসবাদী হওয়ার দায় নেই।

যাঁরা মনে করেন মার্কসবাদ কার্ল মার্কসের কোনও পূর্ব-অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের প্রকাশ নয়, মার্কসের চিন্তায় হঠাৎ করেই এমন মতবাদের উদ্ভব—তাঁরা আর যাই হোন, মার্কসবাদী বা যুক্তিবাদী নন।

কার্ল মার্কসও তাঁর মতামতে পৌঁছোবার আগে ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন, উপাসনা-ধর্মের উদ্ভব ও বিবর্তন, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন। এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর যুক্তিবোধকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অবস্থাকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং একটি সমাজ বিজ্ঞানের তত্ত্বকে দাঁড় করিয়েছেন।

"'কমিউনিজম' শব্দটা মার্কস উদ্ভাবন করেননি। কমিউনিজমের অস্পষ্ট কাল্পনিক চিন্তাদর্শ মার্কসের বহু পূর্ব থেকে য়ুরোপের জনগণের অন্তরে ফল্গুস্রোতের মতো চলে আসছিল। মার্কসের পূর্ববর্তী কমিউনিস্টরা অনেকেই যিশু খ্রিস্টের প্রথম শিষ্যদের দ্বারা আচরিত কমিউনিজম-এর কথা বলতেন। এঁদের চিন্তাদর্শে কমিউনিজম আর খ্রিষ্টধর্ম প্রায় অভিন্ন ছিল। মার্কস কমিউনিজম-কে অলৌকিক বিশ্বাসের কাঠামো থেকে মুক্ত করে বিজ্ঞান-ভিত্তিক বাস্তব বিপ্লব-প্রচেষ্টার বিষয়ে পরিণত করেছিলেন।" *('জীবন, ধর্ম, রাজনীতি', জ্যোতি ভট্টাচার্য)*

যুক্তিবাদী হেগেল দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় সমাজ বিকাশের ব্যাখ্যায় পৌঁছেছিলেন। মার্কস তাকেই বাস্তব দুনিয়ার শক্ত জমির ওপর দাঁড় করিয়ে ছিলেন।

মার্কস তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা বা অর্জিত জ্ঞানকে আত্মস্থকরণের পর যুক্তির পথ ধরেই তাঁর মতামতে (যা মার্কসবাদ নামে পরিচিত) পৌঁছেছিলেন।

কিছু মার্কস পূজারী এই বলে গর্ব অনুভব করেন যে, মার্কসবাদের-ই অংশ যুক্তিবাদ। অর্থাৎ সমস্ত রকম যুক্তিকে তুচ্ছ করে, পাত্তা না দিয়ে মার্কস হঠাৎ করে তাঁর মতামতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আর মার্কস এলেন, তাই প্রকৃতির নিয়মে যুক্তি দেখা দিল। যেন মার্কসের আগে মেঘ ছাড়াই বৃষ্টি হত।

কারও কারও মনে হতে পারে মার্কসবাদীদের ভক্তিবাদে গা ভাসানো নিয়ে আলোচনা, যেন—ধান ভানতে শিবের গান। আমার কিন্তু মনে হয়নি। আমার মনে হয়েছিল, মার্কসবাদীরা ভক্তিরসে আপ্লুত হলে যুক্তিবাদ বড় রকমের ধাক্কা খাবেই। কারণ হিসেবে আবারও বলি ভক্তির আবেগ বা ভক্তিবাদ যুক্তিবাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। আর, যুক্তিমনস্কতা মার্কসবাদের পূর্ব শর্ত।

গত কয়েক দশক ধরে এদেশের কিছু চিন্তাবিদ প্রত্যাশা রেখেছিলেন মার্কসবাদীদের ওপর। ভেবেছিলেন, পার্টি অফিসগুলোতে স্টাডি ক্লাস হবে। মার্কস-লেনিনের রচনাবলীর সঙ্গে যাঁদের কিছুটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে, তাঁরা ক্লাস নেবেন। মার্কসবাদের পাঠ নিতে আসা আদর্শবাদী, আন্তরিক মানুষ বুঝবেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গুরুত্ব। বুঝবেন, বিপ্লবের আগে, বিপ্লবের সময় ও বিপ্লবের পরে যুক্তিবাদ নির্ভর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কোনও বিকল্প নেই। যুক্তিবাদী, সাংস্কৃতিক আন্দোলনকারীরাই বিপ্লবের অগ্রবাহিনী। এরাই তো মানুষের চেতনায় ঢুকে থাকা কুসংস্কারকে ঝেঁটিয়ে পরিষ্কারের দায়িত্ব নেবে। এরাই আন্তরিকতার সঙ্গে বঞ্চিত মানুষদের সত্যিকে বোঝাবে। মানুষ বুঝবে, তার বঞ্চনার কারণ ভাগ্য, পূর্বজন্মের কর্মফল বা ঈশ্বরের কৃপা পাওয়া না পাওয়া নয়। দায়ী সমাজের এই কাঠামো। বোঝাতে হবে গণতন্ত্রের আসল চেহারা। এই সমাজ কাঠামোয় নির্বাচনে জিতে কেন্দ্রের বা রাজ্যের শাসন ক্ষমতা দখল করতে হয়। নির্বাচনে জিততে যে বিপুল পরিমাণ টাকার দরকার হয়, তার প্রায় পুরোটাই তোলা হয় ধনী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। শিল্পপতি ধনীরা সেইসব রাজনৈতিক দলকেই টাকা দেয়, যাদের নির্বাচনে জেতার মত দলীয় পরিকাঠামো আছে। সৎ হলেই নির্বাচনে জেতা যায় না। প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্রে এজেন্ট দিতে হয়। নির্বাচন কেন্দ্রের বাইরে নির্বাচনী অফিস করতে হয়। ভোটার তালিকায় কারচুপি করতে হয়। জাল ভোট দেবার ক্যাডার রাখতে হয়। বিরোধী নির্বাচন কর্মীকে নির্বাচন কেন্দ্র থেকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে হয়। বিরোধী দলের ভোটারদের গৃহবন্দি, ফ্ল্যাটবন্দি বা গ্রামবন্দি করে রাখতে হয় অস্ত্রের জোরে। রিগিং নিশ্চিত করতে নির্বাচন কেন্দ্রে ব্যাপক বোমাবাজি করতে

হয়, প্রয়োজনে গুলিও চালাতে হয়। বুথ দখল করতে আরও ব্যাপক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও আছে প্রচারের জন্য গাড়ি-পোস্টার-ব্যানার-হোর্ডিং-কাটআউট-ক্যাডর ও গুন্ডা, আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদির বিপুল খরচ। সব মিলিয়ে এক একটা কেন্দ্রের নির্বাচনী খরচ কয়েক কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ খরচের টাকা যে'সব ধনীরা দেয়, তারা উশুল করতে পারার প্রতিশ্রুতি নিয়েই দেয়। নির্বাচনের পরও অনেক সময় ত্রিশঙ্কু অবস্থাকে স্থিতি দিতে বিধায়ক ও সাংসদ বেচা-কেনা হয়।

যারাই সরকার তৈরি করুক, আর যারাই বিরোধী আসনে বসুক—সব্বাই ধনীদের ধনের দৌলতেই করে খায়। ফলে শেষ পর্যন্ত দেশের আইন এমনভাবে তৈরি হয়, যাতে ধনীরা মসৃণগতিতে শোষণ চালিয়ে যেতে পারে। সরকার যেখানে পুতুল নাচের পুতুল, সেখানে পুলিশ-প্রশাসন-আমলাদের তুড়ি বাজিয়ে নাচানো যায়।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মীদের-ই সমাজের এই কাঠামো ও তার সঙ্গে শোষণের সম্পর্ককে বোঝাতে হবে। বোঝাতে হবে, নাগরিক হিসেবে সংবিধান আমাদের কিছু অধিকার দিয়েছে। আমরা প্রতিটি দেশবাসী শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জল, বেঁচে থাকার মত খাদ্য পাবার অধিকারী। আমাদের এইসব অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের। সংবিধান স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় পরিষেবার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। বোঝাতে হবে বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা। বোঝাতে হবে 'দেশপ্রেম' মানে দেশের মাটির প্রতি প্রেম নয়। 'দেশপ্রেম' মানে দেশের সংখ্যাগুরু শোষিতে মানুষের প্রতি প্রেম। 'জাতিয়তাবাদ', 'বিচ্ছিন্নতাবাদ', 'স্বাধীনতা সংগ্রাম', 'উপাসনা-ধর্ম', 'নিয়তিবাদ' ইত্যাদি সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণের মধ্যে একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন কখনই সদস্য বাড়িয়ে দল ভারী করার হুজুগ নয়। এই আন্দোলন কিছু আগিয়ে থাকা চিন্তাকে বহু মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার আন্দোলন।

রাজনীতিক থেকে আমলার দুর্নীতির, শিল্পপতি থেকে প্রচার মাধ্যমের দুর্নীতির ওপর নজরদারি করবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকারীরাই। দুর্নীতিকে চিহ্নিত করে জনসাধারণের সাহায্য নিয়েই তাদের ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলতে হবে।

বিপ্লব এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, কুসংস্কার, শোষণ, দুর্নীতি সব—এমনটা মনে করা মার্কসবাদীদের সংখ্যা কম নয়। তাঁরা এ'জাতীয় বক্তব্যের পিছনে যে যুক্তি দেন, তা হল—বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজ কাঠামো (structure) পাল্টে দিতে পারলে

সমাজের উপরিকাঠামো (super structure) এমনি-ই পাল্টে যাবে। উপরিকাঠামো মানে 'ভাবাদর্শগত সম্পর্ক'; যার মধ্যে পড়ে রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, রাজনীতি, মূল্যবোধ, নীতি-দুর্নীতি ইত্যাদি। তাঁদের মতে—সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনে উপরিকাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। সমাজ-কাঠামো হল উপরিকাঠামোর নিয়ন্তা-শক্তি। ফলে যুক্তিবাদী আন্দোলন বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মত উপরিকাঠামোর আন্দোলন শেষ পর্যন্ত একটি নিষ্ফলা ও অপ্রয়োজনীয় আন্দোলনে পরিণত হতে বাধ্য।

মার্কসবাদ কিন্তু এইসব মার্কসবাদীদের সঙ্গে একমত না হয়ে অন্য কথা বলছে।

"কাঠামোর উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও উপরিকাঠামো কাঠামোকে প্রভাবিত করে। সমাজ জীবনে ধ্যান-ধারণা, সাংস্কৃতিক চেতনার ফল, রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা সহ অন্যান্য উপরিকাঠামোগত বিষয়গুলির ভূমিকা, বনিয়াদ বা কাঠামোর উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। এবং কাঠামো পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে দ্রুত করে।"

(What Is Historical Materialism? by Z. Berbeshkina, L. Yakovleva, D. Zerkin, Progress Publisherss, 1985, Moscow)

বিপ্লব-ই শেষ কথা নয়। শোষিত, মেহনতি মানুষদের দ্বারা ক্ষমতা দখলই শেষ কথা নয়। শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পর ও তাকে টিকিয়ে রাখাটা জরুরি। তার জন্য একটা লাগাতার সাংস্কৃতিক আন্দোলন চাই-ই। নতুবা নজরদারির অভাবে গদিতে বসা নেতারা দুর্নীতির সঙ্গে আপোস করতে পারে। স্বজনপোষণে ডুবে থাকতে পারে। সব রকম খারাপ কাজই মুখোশের আড়ালে অথবা ক্ষমতায় ভয় দেখিয়ে করে যেতে পারে।

এ'দেশের নির্বাচন-নির্ভর মার্কসবাদী পার্টিগুলোর দিকে তাকালেই অবস্থা কিছুটা টের পাবেন। দীর্ঘ ক্ষমতায় থাকা বাস্তুঘুঘুরা বিপ্লব থেকে বহু দূর সরিয়ে রেখেছে পার্টিকে। সাম্যের সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখা তরুণরা আর পার্টি অফিসে স্টাডি ক্লাশ করতে আসে না। পার্টি অফিস প্রমোটার বা ব্যবসায়ীদের ভিড়ে জমজমাট হয়ে থাকে। মন্ত্রী থেকে ক্যাডার সব্বাই নব্য-পুজোকালচার নিয়ে মেতেছেন। এঁরা ভারতের নিরীশ্বরবাদী চিন্তাধারার ঐতিহ্যকে তুলে ধরবেন—এমন প্রত্যাশা ছিল। আজ সেই প্রত্যাশার কিছুই অবশিষ্ট নেই।

রাজনীতি ও সমাজনীতি সচেতন অশোক মিত্রের কথা গলায় গলা মিলিয়ে বলতে হচ্ছে, "অধঃপাতের আবর্তে বিরাজ করছি আমরা, শ্রদ্ধা করা যায়, সম্মান জানানো

যায়, যাঁদের দৃষ্টান্তে উদ্দীপ্ত হওয়া যায় এমন ব্যক্তির সংখ্যা, পৃথিবীতে না হলেও অন্তত আমাদের দেশে, ক্রমশ ক্ষীয়মান; মেরুদণ্ডগুলি বেঁকে যাচ্ছে, আরও বেঁকে যাচ্ছে।"

ভারতের এক সময়ের মূল চিন্তাধারা ছিল নিরীশ্বরবাদী ও যুক্তিবাদী। কয়েক হাজার বছরে আমরা কতটা এগোলাম? ইতিহাস বলছে—আমরা পিছিয়েছি, এবং এই পশ্চাৎগামীতাই আমাদের সমাজের মূল স্রোত। খাঁটি নিরীশ্বরবাদী ও যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ খুঁজে পাওয়া ভার। যাঁরা নিজেদের নিরীশ্বরবাদী ও যুক্তিবাদী বলে জাহির করেন, তাঁদের মধ্যে ভেজাল-ই বেশি।

এ'দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাজনীতি-ই ঠিক করে দেয় প্রচার মাধ্যম কী ছাপবে, কী চাপবে, সাহিত্য-শিল্প-সংগীত কেমন হবে, কেমন হবে অর্থনীতি, মূল্যবোধ, আইনের প্রয়োগ। যে রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিক এ'সব ঠিক করে দেয়, তারা নিজেদের আদর্শগত অবস্থান নিয়ে একটুও মাথা ঘামায় না। নির্বাচনী রাজনীতিতে কৌশল-ই আসল। আর এও সত্যি—এ'দেশে নির্বাচন-নির্ভর রাজনীতিকরা-ই সন্দেহাতীতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এর বাইরে অতি-সংখ্যালঘু কিছু রাজনীতিক অবশ্য আছেন, সরকার যাঁদের 'সন্ত্রাসবাদী', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' ইত্যাদি বলে ঘোষণা করেছে। কুকুর'কে হত্যার আগে 'পাগলা কুকুর' বলে ঘোষণা করার মত ব্যাপার আর কী!

এ'দেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে উপাসনা-ধর্মকে কাজে লাগাবার, উসকে দেবার দুর্নীতি উত্তরোত্তর বেড়ে-ই চলেছে। এই অবস্থায় নির্বাচন-নির্ভর মার্কসবাদী দলগুলোও আদর্শ-টাদর্শ শিকেয় তুলে যে'ভাবে ধর্মে-কর্মে ডুব দিয়েছে, তাতে তাদের কাছে আদর্শের কথা তুলতে যাওয়া মানেই ঝুঁকি নেওয়া। মিথ্যে মামলায় ঝুলে যাওয়ার ঝুঁকি, 'সন্ত্রাসবাদী' বলে দাগি হওয়ার ঝুঁকি, এনকাউন্টারে প্রাণ হারাবার ঝুঁকি।

বুদ্ধিচর্চাহীন, মুক্তমনহীন, ভণ্ড, ধান্দাবাজে ভরে যাওয়া এই দেশে এক সময়ের এগিয়ে থাকা নিরীশ্বরবাদী ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারা শুকিয়ে যাচ্ছে। এ'ভাবে সমাজকে অবক্ষয়ের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে দেব কিনা, তা নির্ভর করছে আপনার, আমার, আমাদের উপর। আমাদের নিস্পৃহতার চাদর উড়িয়ে দেবার উপর।

কীসব বেয়াড়া প্রশ্ন! মুখ ছুটে মিশে যায় মুখোশে

৩১ জুলাই ২০০২। বেশ কয়েকটা দৈনিক সংবাদপত্রে একটা খবর বেরিয়েছে, উপরাষ্ট্রপতি কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর জন্য দায়ী বাস্তু না মানা। তেলেগু দেশম পার্টির সংসদীয় দলনেতা ইয়েরান নাইডু লোকসভার স্পিকার মনোহর জোশীকে বলেছেন, হায়দরাবাদের এক 'বাস্তুশাস্ত্র'-বিশারদ তাঁকে জানিয়েছেন, সংসদের নতুন গ্রন্থাগারের কাঠামোটি বাস্তুমতে ঠিক নয়। তারই পরিণতিতে কৃষ্ণকান্তসহ অন্যান্য সাংসদের মৃত্যু হয়েছে।

নাইডুজীর এমন বক্তব্যকে কারও কারও কাছে মনে হতে পারে কাণ্ডজ্ঞানের অভাব। কিন্তু মাননীয় স্পিকার সাহেব জোশীজীর এমনটা মনে হয়নি। খবর কাগজের ভাষ্য অনুসারে—"নাইডুজীর কথায় জোশীজীর দুশ্চিন্তা বেড়েছে। তিনিও জানালেন, একটা জ্যোতিষশাস্ত্রের পত্রিকা জানিয়েছিল ২৭ জুলাই ও ২ আগস্ট—এই দুটি দিন খুব অপয়া। এই দু'দিন সংসদের দুই নামী ব্যক্তির মৃত্যু হবে। দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক, কারণ ২৭ জুলাই চলে গেলেন কৃষ্ণকান্ত। ২ আগস্ট কার পালা?" উৎকণ্ঠায় ছিলেন জ্যোতিষ-বিশ্বাসী ও অজ্ঞেয়বাদী দ্বিধাগ্রস্ত আমজনতা। ২ আগস্ট অতিক্রান্ত। জ্যোতিষশাস্ত্রের নাক-কান মুলে দিয়ে সাংসদরা দিব্বি ২ আগস্ট পার করে দিলেন বহালতবিয়তে।

৩১ জুলাই-এর আলোচনার শেষ এখানেই নয়। দু'জনের কথা শুনে প্রাক্তন স্পিকার এবং বর্তমানে কংগ্রেস সংসদীয় দল নেতা শিবরাজ পাতিল জানালেন, "ওই গ্রন্থাগারের উদ্বোধন যে দিন হয়েছিল, সে দিনই ব্যাঙ্গালোরে তাঁর মেয়ে মারা যায়।"

মন্দ লোকেরা এই প্রসঙ্গে কিছু অপ্রিয় প্রশ্ন তুলেছেন। প্রতি বছর বেশ কিছু সাংসদ মারা যান, নতুন গ্রন্থাগার তৈরির আগে যাঁরা মারা গেছেন, তাঁরা কেন গেছেন? তাঁদের যদি বার্ধক্যজনিত কারণে বিভিন্ন অসুখের শিকার হয়ে স্বাভাবিক মৃত্যু হতে পারে, তবে গ্রন্থাগার তৈরির পর সাংসদদের মৃত্যু স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হবে না কেন? বাস্তু মেনে গ্রন্থাগার ভবনের কিছু দরজা-জানলা-আসবাব এদিক-ওদিক করে দিলে সাংসদ থাকাকালীন কারো মৃত্যু হবে না—এই গ্যারান্টি কে দেবেন? নাইডুজী, না বাস্তু-বিশারদ? কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত বাস্তু-বিশারদদের পিছনে 'পাবলিক মানি' ঢালার আগে গ্যারান্টি আদায় জরুরি, যাতে চুক্তিভঙ্গের দায়ে জেলে পাঠানো যায়। এরপর টাকা খরচে আপত্তি নাও তোলা যেতে পারে। কারণ এর ফলে 'দুধ কা দুধ, পানি কা পানি' হয়ে যাবে।

মন্দ লোকেরা এমন প্রশ্নও তুলেছেন, গত ১৩ ডিসেম্বর সংসদ চলাকালীন সংসদভবনে আক্রমণ চালালো উগ্রপন্থীরা। আশ্চর্য ব্যাপার—একজন সাংসদের গায়েও সামান্যতম আঁচড়টি কাটতে পারলো না এই পরিকল্পিত আক্রমণ। এর কারণ যদি হয়, বাস্তু না মানা, তবে বাস্তু না মানাকেই ভালো বলতে হয়। শুভ বলতে হয়। অন্তত সাংসদদের পক্ষে তো শুভ।

গ্রন্থাগার উদ্বোধনের দিন পাতিলজীর মেয়ে মারা গেছেন। অতএব প্রমাণিত হল—গ্রন্থাগারের জন্মদিন অশুভ দিন। এমন সরলীকরণ যে'সব সাংসদ করেন, তাঁরা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি ও শ্রীরাজীব গান্ধির মৃত্যু নিয়ে কী ব্যাখ্যা দেবেন? দিন দু'টি তো গ্রন্থাগারের জন্মদিন ছিল না। তবে কি গ্রন্থাগারের অ-জন্মদিন আরও বেশি রকমের অশুভ?

নাগরিকদের জীবন ও মননকে সুরক্ষা দেবার, সুসংস্কৃতির বাতাবরণ এনে দেবার প্রতিজ্ঞাদৃঢ় অঙ্গীকার রেখেছেন সাংসদরা। তারপরও কী সব বেয়াড়া প্রশ্নরাশি। মন্দলোক কত কী-ই বলে, সে সব ধরতে নেই। আবার মন্দলোকেরা যখন মানুষের মনে উস্কে দেয় যুক্তির আঁচ, তখন ওদের হেলা-ফেলা করাটা কতটা ঠিক হবে—এটাও একটা প্রশ্ন। এই বেয়াড়া, বজ্জাত, প্রশ্নাতীত বলে কোনও কিছু মানতে না চাওয়া মানুষগুলো আসলে যুক্তিবাদী। এরাই মানবপ্রজাতির অগ্রগতির বিবেক, সাংস্কৃতিক অগ্রগতির বোধ।

জ্ঞান আসে যুক্তির পথ ধরে

যুক্তিবাদের মূল বক্তব্য—জ্ঞান মাত্রেই সঙ্গত কারণ বা যুক্তির (reason) পথ ধরে আসে। আমাদের যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে, সে ইন্দ্রিয়গুলো আমাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে বাড়ায়। দৃষ্টি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের অক্ষর পরিচয়ের শুরু। সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে দৃষ্টি ইন্দ্রিয়ের অবদানকে স্বীকার করতেই হয়। দৃষ্টির অভাবে ইচ্ছে মত পড়াশুনো বারবার ব্যহত হতে বাধ্য। ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক, ডিসকভারি, অ্যানিমেল প্ল্যানেট, ই এস পি এন, বি বি সি, এমনই কত টি ভি চ্যানেল আমাদের চোখের সামনে হাজির করে চলেছে নানা তথ্যরাশি, জ্ঞানভাণ্ডার। সমুদ্রতলার জগৎ, মরুভূমির রহস্যময়তা, পুরাতত্ত্বের আবিষ্কার, পৃথিবীর নানা প্রান্তের ট্রাইবদের জীবনযাত্রার ছবি, ক্রীড়া-শিল্প-সাহিত্য-সংগীত-নাটক-চলচ্চিত্রের নানা অগ্রগতির সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে চলেছে এইসব টিভি চ্যানেল। বিশ্বকাপ ফুটবলের দিকে চোখ রাখেন গোটা পৃথিবীর কোচ ও খেলোয়াড়রা। ক্রীড়াবিজ্ঞান ও নতুন নতুন ট্যাকটিক্যাল লাইন নিয়ে গবেষণা চলে দর্শন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। যাঁরা খেলেন, তাঁরা দেখতে না পেলে খেলাগুলোর চরিত্র যেত সম্পূর্ণ পাল্টে। হয়তো তখন খেলাগুলো হতো শব্দনির্ভর বা স্পর্শনির্ভর।

আমাদের জ্ঞানের অনেকটাই আসে স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বক্তব্য বা লেকচার শুনে। গান শিখি গান শুনে, এমনকী কথা শিখি কথা শুনে। অক্ষরের উচ্চারণের সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমও শব্দ। আমরা শৈশবে সুর করে নামতা পড়েছি গলা মিলিয়ে। শিখেছি 'অ-য়ে অজগর....' ছড়া। আজ হয়তো ছড়া পাল্টেছে, কিন্তু আমার নাতিও নার্সারিতে ভর্তি হয়ে অক্ষরজ্ঞানের আগেই ইংরেজি কবিতা বলা শিখে ফেলেছে। সেই প্রাচীন শ্রুতির ট্রাডিশন আজও বজায় রয়েছে। শুনছি কলকাতার আকাশবাণীর এফ এম ব্যান্ডের শ্রোতার সংখ্যা নাকি ২৮ লক্ষ এদের মধ্যে একটা অংশ নাকি সরাসরি ফোনে নানা আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনাগুলো নানা যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করে। এসব শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবদান।

এমনি করে সব ইন্দ্রিয়ই আমাদের জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে।

ইন্দ্রিয় যখন প্রতারিত

যুক্তিবাদ ইন্দ্রিয়ের অবদান মেনে নেবার পাশাপাশি একথাও বলে যে, ইন্দ্রিয় অনেক সময় প্রতারিত হয়, ভুল করে। ইন্দ্রিয় ভুল করলে আমরা ভুল করি।

ধরুন, নাটক দেখতে গেছেন। আপনার মেয়ের স্কুলের নাটক। মেয়ে পরীর ভূমিকায় নামবে। হলে ঢুকতে একটু দেরি হয়ে গেছে। ঢুকেই দেখলেন, জাদু-কাঠি হাতে মেয়ে নাচছে। মেঝেতে লুটোপুটি খাওয়া পোশাকটা ম্যানেজ করে সুন্দর নেচে চলেছে মিউজিক ট্র্যাকের তালে তালে। পোশাকের রঙ টুকটুকে লাল। মুহূর্তে সবুজ হল, মুহূর্তে নীল। নাচ শেষে পোজ দিয়ে স্থির। পোশাক সাদা, ধবধবে সাদা। এই যে আপনার দর্শন ইন্দ্রিয় বার বার পোশাকের রঙ বুঝতে গিয়ে প্রতারিত হচ্ছিল, এরপরও আপনি কী করে বলবেন যে দর্শন ইন্দ্রিয় আমাদের সঠিক জ্ঞানই দেয়? ইন্দ্রিয় আমাদের প্রতারিত করে। উদাহরণ রাশি রাশি হাজির করা যায়। কিন্তু আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি যাতে না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে দু-তিনটি দৃষ্টি বিভ্রমের দৃষ্টান্ত হাজির করছি।

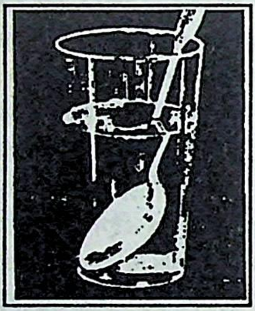

ছবি ১. একটা চামচের কিছুটা অংশ জলে ডুবিয়ে রাখলে সোজা চামচটা আর সোজা দেখায় না।

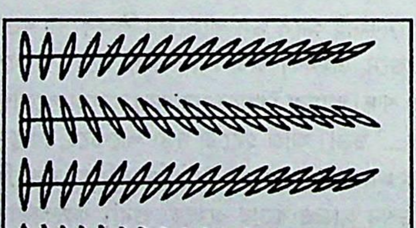

ছবি ২. যে চারটি দীর্ঘ রেখাকে দেখলে সেগুলো বাঁকা মনে হলেও চারটি রেখায় সমান্তরাল

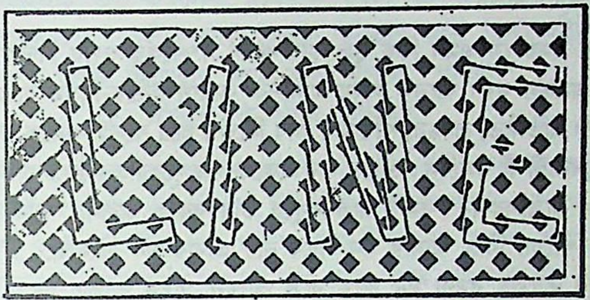

ছবি ৩. চারটি অক্ষর-ই বাঁকা বলে মনে হচ্ছে। বাস্তবে প্রতিটি অক্ষরই খাড়া

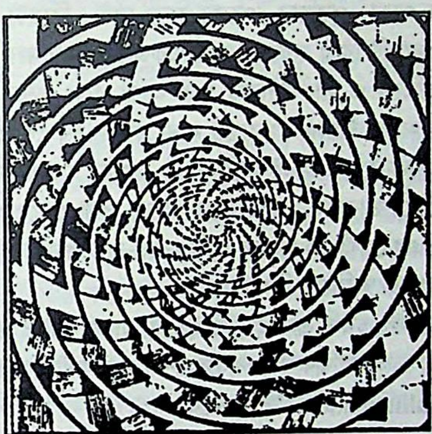

ছবি ৪. বক্ররেখাগুলো দেখলে কুণ্ডলী মনে হচ্ছে। বাস্তবে বক্ররেখাগুলো বৃত্ত

জাদুকররা অনেক জাদুই দেখিয়ে থাকেন মঞ্চের পিছনের পর্দার রঙ ও আলোর কারসাজিতে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়ে।

বিভ্রম যখন মনের

সব সময় যে এমন কিছু স্থূল কার্য-কারণ সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে বিভ্রম ঘটে, এমনটা নয়। অনেক সময় মানসিক কারণে ইন্দ্রিয়-বিভ্রম হতে পারে।

এক প্রতিষ্ঠিত, শ্রদ্ধেয়, শক্তিমান কবি নিজের ঘরে বসেই শুনতে পান রাইটার্সে বসে মুখ্যমন্ত্রী কী বলছেন। শুনতে পান একশো গজ দূরের এক ফ্ল্যাটবাসিনী বিবাহিতা রমণীর কথোপকথন। রমণী রাত দুপুরে তাঁর বরকে বলেন, "তুমি আমার দেহ পেতে পারো, কিন্তু আমার মন পাবে না। আমার মন দিয়েছি.....।" কবি যখন শোনেন তাঁকেই রমণী মন দিয়ে বসে আছেন, তখন আপ্লুত হন।

এই বিভ্রম কবির মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের বিশৃঙ্খলার ফল। এই বিশৃঙ্খলার পিছনে কারণ নিশ্চয়ই আছে। একটা বড় অর্থমূল্যের সাহিত্য পুরস্কার পাচ্ছেন—এমনটাই খবর ছিল তাঁর কাছে। পেলেই তিন মাসের মধ্যে বিয়েটা হৈ-হৈ করে করার পরিকল্পনা ছিল পাক্কা। পুরস্কার পেলেন অন্য কেউ। বিয়েটা আর হল না। বছর ঘোরার আগে মেয়েটি বিয়ে করলেন আর একজনকে। পুরস্কার না পাওয়ার পিছনে কয়েকজন সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের হাত আছে বলে গভীর ভাবে বিশ্বাস করে ফেললেন। এক সময় তাঁদের ষড়যন্ত্রের নানা খবরাখবর পেতে লাগলেন। অন্যের চিন্তাকে ধরার শক্তি হঠাৎ করেই নাকি তিনি একদিন পেয়ে গিয়েছিলেন। তারপর যার কথাই মন দিয়ে ভাবছেন, তারই কথোপকথন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন। Auditary hallucination-এর রোগী এই ধরনের অলীক কথা-বার্তা শুনতে পান। Hallucination মানে অলীক কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস।

হেরোইন, আফিং, চরস, এল এস ডি ইত্যাদি মাদক শরীরে গ্রহণ করলেও অনেক সময় তুরীয় আনন্দ, আধ্যাত্মিক আনন্দ, দেবদর্শন, দেববাণী শোনা যায়। এইসব মাদক অনেক সময় hallucination তৈরি করে।

বছরের পর বছর ধরে গড়ে ওঠা বদ্ধমূল ভুল ধারণা বা অন্ধ-বিশ্বাস অনেক সময় আমাদের এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়কে বিভ্রান্ত করে।

আমাদের যুক্তিবাদী সমিতিতে একটি যুবক আসতেন। চুপ-চাপ বসে আলোচনা শুনতেন। এক সময় আমার ফ্ল্যাটেও মাঝে-মাঝে আসতে লাগলেন। তারপর একদিন জানালেন ওঁর সমস্যার কথা। 'প্লেটোনিক লভ'-এ বিশ্বাস করেন কৈশোর থেকে। শ্রীদেবীর সঙ্গে এমনই এক দেহাতীত প্রেমে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। শোবার ঘরে শ্রীদেবীর কয়েকটা ছবি আছে। বিভিন্ন সময়ে শ্রীদেবীর আত্মা ওইসব ছবিতে চলে আসেন। কথা বলেন। গান শোনান। ছবি থেকে বেরিয়ে এসে নাচও দেখান। এ'সব কথা বিশ্বাস করতে চান না তাঁর আত্মীয়-বন্ধুরা। বলেন—"মাথা খারাপ হয়েছে। ডাক্তার দেখা।"

যুবকটি আমাকে প্রশ্ন করলেন, রামকৃষ্ণ থেকে রামপ্রসাদ কালীর সঙ্গে কথা বললে, কালীর গান শুনলে অবতার হয়ে যান। আর আমি শ্রীদেবীর সঙ্গে কথা বললে, পাগল! সত্যিই কি আমি পাগল?

ভয়ংকর প্রশ্ন। ধীরে ধীরে ধাপে-ধাপে বেশ কিছুদিন সিটিং বা আলোচনার মধ্য দিয়ে তরুণটিকে বোঝাতে পেরেছিলাম, দীর্ঘ দিনের বদ্ধমূল ধারণা থেকে ও এইসব অলীক কিছু দেখেছে, অলীক কিছু শুনছে। অন্ধ-বিশ্বাস বা বদ্ধমূল ধারণা থেকে যখন আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিগুলো ভুল করে, তখন সেই মানসিক অবস্থাকে মনস্তত্ত্বের ভাষায় বলে delusion, যা আসলে এক ধরনের মানসিক রোগ। যাঁরা ঈশ্বর দেখেন, ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁরা অবশ্যই মানসিক রোগী। আমাদের সামাজিক পরিবেশটাই এমন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন যে, কেউ মানুষের ছবির সঙ্গে কথা বললে পাগল, আর ঈশ্বরের ছবির সঙ্গে বললে অবতার।

গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ—এই তিন ইন্দ্রিয় যে বিভ্রান্ত হয়, সেটা বোঝাতে তিনটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

১১ ডিসেম্বর ১৯৮৮। এক সাংবাদিক সম্মেলনে আসার কথা ছিল ডাইনি সম্রাজ্ঞী ইপ্সিতা, শিক্ষা আশ্রম ইন্টারন্যাশনাল-এর সাঁই শিষ্য উপাচার্য ও জ্যোতিষী নরেন্দ্রনাথ মাহাতোর। এঁরা তিনজন নিজেদের ক্ষমতা প্রমাণের চেষ্টা করবেন। আমরা চেষ্টা করবো, ওঁদের ক্ষমতার দাবি যে বুজরুকি—তা প্রমাণ করতে। সাংবাদিক সম্মেলনে কলকাতার বাইরের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রতিনিধিরাও এসেছেন। শেষ পর্যন্ত এলেন না তিনজনই। না এলেও 'কুছ পরোয়া নেই'। কিছু কিংবদন্তি 'অলৌকিক' ঘটনা ঘটিয়ে সেগুলোর পিছনের কারণ ব্যাখ্যা করছিলাম আমরা। এক সময় আমি কয়েকজন সাংবাদিককে এক টুকরো করে কাগজ দিয়ে তাতে নিজের পছন্দ মত ফুলের গন্ধ, সেন্টের গন্ধ বা পাউডারের গন্ধের নাম লিখতে বলেছিলাম। তাঁরা লিখলেন। তাঁদের ভাবতে অনুরোধ করলাম, আপনারা এক মনে ভাবতে থাকুন আপনার লেখা গন্ধ কাগজে চলে আসুক। মিনিট তিন-চারেক চললো তাঁদের ভাবার পর্ব। বললাম, এ'বার কাগজের টুকরো নাকের কাছে নিয়ে এসে দেখুন তো গন্ধ পাচ্ছেন কি না? প্রত্যেকেই তাঁর তাঁর লেখা গন্ধই কাগজে পেয়েছিলেন। আর প্রথম যিনি পেয়েছিলেন, তিনি হলেন 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার স্বনামধন্য সাংবাদিক পথিক গুহ।

দু'বছর আগের ঘটনা। সল্টলেকে গিয়েছি 'নন্দন' মাসিক পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক সুমিত সেনগুপ্তের আমন্ত্রণে। দুর্গাপুজো উপলক্ষে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা পরিবেশন করবো 'অলৌকিক নয়,

লৌকিক' শিরোনামে কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে অনেক বিখ্যাত তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখানো হচ্ছিল ও এ'সবের পিছনের কারণগুলো ব্যাখ্যা করা হচ্ছিল। তিনজন দর্শককে ডাকলাম মঞ্চে। তিনটি চেয়ারে তাঁদের বসালাম। আমার অনুরোধ মতো তাঁরা চোখ বুজে এক মনে আমার কথা শুনছিলেন। আমি বলছিলাম, "আপনারা এক মনে ভাবতে থাকুন আপনাদের ডান কাঁধ থেকে হাতের আঙুল পর্যন্ত অবশ হয়ে যাচ্ছে। অবশ হয়ে যাচ্ছে।" এই ধরনের কথাকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলে suggestion বা 'ধারণা সঞ্চার'। দু-তিন মিনিট এই ধরনের কথা বলে তিনজনের মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষে ডান হাত অবশ হওয়ার ধারণা সঞ্চারিত করলাম। তারপর তিনজনের ডান হাতে ইঞ্জেকশনের তিনটে সিরিঞ্জ নিড্‌ল পুরো ঢুকিয়ে দিলাম। ঘুমের মধ্যে আমাদের মশা কামড়ালে আমরা বুঝতে পারি। হাতের তালু সেখানে গিয়ে পড়ে মশা মারার অভিলাষে। আর এখানে 'নিড্‌ল' পুরো ঢুকে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁদের চোখ পর্যন্ত সামান্য কুঁচকালো না। চোখ খোলার পর তিনজনই জানালেন, ছুঁচ ফোটার ব্যথা তো দূরের কথা, কিছু বুঝতেই পারেননি। এরপর দু'জনে তাঁদের হাতে ফোটানো সিরিঞ্জ নিড্‌ল বের করে কয়েকবার নিজেদের ডান হাতে ঢোকালেন, বললেন কোনও ব্যথা অনুভব করছেন না।

এই ধরনের স্পর্শানুভূতির বিভ্রান্তি ঘটিয়েছি এই ঘটনার পরেও অন্তত একশোবার। দর্শক ইংলিশবাজারের আধিবাসী থেকে আই আই টি খড়্গপুরের ছাত্র-অধ্যাপক সকলেই।

'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠানে মঞ্চে আসতে বলেছি তিনজন দর্শককে। তাঁদের চেয়ারে বসিয়েছি। গভীরভাবে আমার কথা শুনতে অনুরোধ করেছি। তারপর তিনজনের কানের কাছে ধীরে ধীরে টানা টানা সুরে খুব নিচু স্বরে Suggestion দিয়েছি বা একটা ধারণাকে তাঁদের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে সঞ্চারিত করতে চেয়েছি। ধারণাটা হল, এই Suggestion শেষে 'হিপনটিক ঘুম' ভাঙানোর পর তাঁরা তিনজন সিগারেটের স্বাদ পাবেন যথাক্রমে টক, ঝাল, মিষ্টি। সাজেশন শেষে তিনজন সিগারেট ধরিয়েছেন, টেনেছেন এবং জানিয়েছেন, সিগারেটের স্বাদ গেছে পাল্টে। হয়ে গেছে যথাক্রমে টক, ঝাল ও মিষ্টি।

এতক্ষণ যা বললাম, তার সারমর্ম, ইন্দ্রিয়কে বিভ্রান্ত করা যায়, ইন্দ্রিয় বিভ্রান্ত হয়। যুক্তিবাদের সেই বক্তব্যের সঙ্গে এ'বার আমরা সহমত পোষণ করতে পারি যে, ইন্দ্রিয় আমাদের জ্ঞানার্জনে সাহায্য করে, এ'কথা যেমন সত্য, তেমন-ই সত্য — ইন্দ্রিয় অনেক সময় আমাদের প্রতারিত করে। অবশ্য এই প্রতারণার পিছনেও রয়েছে যুক্তি। যে যুক্তিকে বুঝতে মনোবিজ্ঞান ও মস্তিষ্ক বিজ্ঞান সাহায্য করতে পারে।

যুক্তির রূপ রস পাল্টে দেয় সময়, সমাজ ....

কল্লোল আর পল্লবী হনিমুনে চলেছেন। শিলিগুড়ি থেকে একটা মারুতি ভাড়া নিয়েছেন। যাত্রা শেষ হবে গ্যাংটকে। পাহাড় ঘুরে ঘুরে গাড়ি উঠছে। চারদিকে শুধু সবুজ পাহাড়। কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে রুপোলি তিস্তা। পল্লবী গলা ছেড়ে গাইছেন, "আমার সকল নিয়ে বসে আছি / সর্বনাশের আশায় / আমি তার লাগি পথ চেয়ে থাকি / পথে যে জন ভাসায় ..."

কল্লোল জানেন না ঈশ্বর আছেন, কি নেই? জানতে চান না, স্বর্গ-নরক সত্যি কি না? কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তা এ'খানে। প্রকৃতিই স্বর্গ। পাহাড় যে এত সুন্দর, এত স্বর্গীয়, এখানে এলে অনুভব করা যায়।

চার দিন পরে। কল্লোল ফিরছেন গ্যাংটক থেকে শিলিগুড়ি। আজও মারুতিতে। তবে আজ শুধু একা। পল্লবী নেই। কাল বিকেলে ওর দেহ দাহ করা হয়েছে ফুল তুলতে গিয়ে পা পিছলে কুড়ি ফুট তলার রাস্তায়। হাসপাতালে যখন নিে যাওয়া হল, তখন পল্লবী মৃত। এতো হাসি-খুসি, ছট্‌ফটে, রোমান্টিক পল্লবী আর নেই। গোটা ব্যাপারটাই কেমন যেন অলীক স্বপ্নের মত। পাহাড়ের প্রতিটি ইঙ্গিতে মৃত্যুফাঁদ পাতা। চোখ বুজে আছেন কল্লোল। চোখ খুললেই দু'পাশে শুধু ভয়ংকর মৃত্যুর হাতছানি। বীভৎস পাহাড়গুলোর দিকে তাকানো যাচ্ছে না। ওঃ! তলায় তিস্তার দিকে চোখ পড়তেই মনে হল, মৃত্যু-পরোয়ানা নিয়ে কিলবিল করে চলেছে একটা সাপ। এই নরক-দর্শন কখন শেষ হবে? দু'হাতে চুল খামচে ধরে চোখ বোজে কল্লোল।

এটা একটা গল্প ভাবলে গল্প। গল্প তো জীবন থেকেই উঠে আসে। সময়ে কল্লোলের চেতনায় যে পাহাড় ছিল স্বর্গীয়, সময়ে তা-ই নরক। কী অদ্ভুত কৌতুক!

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই যে আবেগের, চেতনার পথ পরিবর্তন—এর পেছনেও যুক্তি আছে। রোমান্টিকতার ছোঁয়ায় পথ ছিল রূপে-রসে-গন্ধে টইটম্বুর। ফেরার পথে প্রেমিকা হারানোর অসহ্য যন্ত্রণা সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছিল। প্রেমিকাকে ছিনিয়ে নিয়েছে যে পাহাড়, সেই পাহাড়ের বীভৎস ঘোরাটোপ থেকে পালাতে চাইছিল মন। এই দুটো মন-ই বাস্তব সত্য। শুধু সময় মনকে দু-রকম করেছে।

রবার্ট ঈগল বিবিসি'র প্রোডিউসর ইনচার্য। ভারতে এসেছিলেন যুক্তিবাদী আন্দোলনের ওপর একটা তথ্যচিত্র তুলতে। বেশ কিছু দিন ওঁর টিমের সঙ্গে গ্রাম থেকে শহর চষে বেড়াতে হচ্ছিল। একদিন মিস্টার ঈগল আমাকে বলেই ফেললেন, "তোমাদের দেশের ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় আড্ডা মারে মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গেই গল্প-গুজব করে। অদ্ভুত লাগে! এটাই কিন্তু তোমাদের সমাজের মূল স্রোত। তোমার কি মনে হয় না যে, এটা খুবই অস্বাস্থ্যকর মানসিক ব্যাপার?

বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের সহজাত প্রবৃত্তিকে খারাপ বলে মনে করে তোমাদের সমাজ। ছেলে-মেয়েদের বন্ধুত্বকে স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে পারনি তোমরা। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিণতি সমাজের পক্ষে খারাপ হতে বাধ্য। আমার মেয়ের অনেক বন্ধু, অনেক বান্ধবী। যদি দেখতাম ওর শুধু বান্ধবী আছে, বন্ধু নেই, তবে ওকে অবশ্যই নিয়ে যেতাম কোনও মনোবিদের কাছে। কারণ এটা স্বাভাবিক আচরণ নয়।''

মিস্টার ঈগলকে বলেছিলাম, ''স্থান, কাল পাত্র অনুসারে অনেক কিছুই পাল্টে যায়। পাল্টে যায় যুক্তিবোধ, মূল্যবোধ। হ্যাঁ এটা ঠিক যে, এখনও আমাদের দেশের বেশিরভাগ পুরুষ মনে করেন—মেয়েরা থাকবেন তাঁদের অধীন। আর মেয়েরাও যুগ যুগ ধরে পুরুষদের অধীনতা মেনে আসছেন।

এখনও বিবাহিত নারী-পুরুষের সম্পর্ক বোঝাতে আমরা স্ত্রী ও স্বামী বলে থাকি। এদেশের শিক্ষিতারাও 'স্বামী' শব্দটি ব্যবহার করেন। 'স্বামী' অর্থাৎ প্রভু। 'প্রভু' কখনই বন্ধু হয় না।

এখনও স্ত্রী স্বামীকে প্রণাম করেন। স্বামী কেন তবে স্ত্রীকে প্রণাম করবেন না? এমন প্রশ্ন তোলা সহ্য করবেন না এই সমাজের প্রায় সব নারী-পুরুষরাই।

''এখনও মেয়েকে বিয়ের সময় বাবা দান করে দেন পাত্র'র কাছে। আমাদের সমাজে মেয়েরা এখনও বস্তু, দানসামগ্রী। এখনও এমন বাবার সংখ্যাই বেশি, যাঁরা গর্বের সঙ্গে বলেন—আমার মেয়ে খুব-ই ভালো। কোনও ছেলে বন্ধু নেই।

'ভালো মেয়ে' আর 'খারাপ মেয়ে'র সংজ্ঞা তোমার দেশে আর আমার দেশে আশমান-জমিনের ফারাক। তোমাদের সমাজটা ইউনাইটেড কিংডমের। আমাদের সমাজটা হাজার হাজার মাইল দূরের ভারতের। স্থান বা দেশ অনুসারেও সাংস্কৃতিক চেতনা, মূল্যবোধ, যুক্তিবোধ পাল্টায়, যেমন পাল্টায় সময় অনুসারে।

''জানো আমাদের দেশে এক সময় পুরুষদের বহু বিবাহ গর্বের ও গৌরবের ছিল। রক্ষিতা রাখা, পতিতাপল্লীতে যাওয়া আভিজাত্যের লক্ষণ ছিল। মৃত স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা এবং সেই নিষ্ঠুর হত্যা-দৃশ্য দেখাও পুণ্য কাজ বলে বিবেচিত হত।

''আমাদের সমাজের এগিয়ে থাকা মানুষদের মধ্যে নারী-পুরুষ সম্পর্কের ধারণা আম-জনতার ধারণার সঙ্গে মেলে না। না মেলাটাই স্বাভাবিক। সংস্কৃতিগত ভাবে এগিয়ে থাকা মানুষের যুক্তিবোধ সাধারণ মানুষের থেকে অন্য রকম হবে—এটাই স্বাভাবিক। আমাদের দেশের এগিয়ে থাকা সংস্কৃতির পরিবারের ছেলে-মেয়েরা একে অন্যকে 'মানুষ' বলে স্বীকৃতি দিতে শিখেছে, বন্ধু বলে ভাবতে শিখেছে। এমন পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সুন্দর ও স্বাভাবিক।

"আমাদের এ'দেশে ছেলেদের সঙ্গে ছেলেদের, মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদের বন্ধুত্ব সাধারণভাবে স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্ত। এর সঙ্গে সমকামিতার সম্পর্ক নেই। এটাই আমাদের সংস্কৃতি।"

অসমে গিয়েছিলাম গত বছর। শিলচর থেকে গুয়াহাটি বেশ কয়েকটা কুসংস্কার বিরোধী আলোচনাচক্রে অংশ নিতে হয়েছিল। গুয়াহাটিতে রাতে আমরা অনেকে হৈ হৈ করে আড্ডা দিচ্ছি। প্রায় সকলেই স্থানীয় তরুণ-তরুণী। এরই মধ্যে এক তরুণ চিত্র-সাংবাদিক পটা-পট ছবি তোলা শুরু করলেন। একটি তরুণী, নামটা ঠিক মনে নেই, হঠাৎ আমারে উরুর ওপর বসে পড়লেন। একটুও অস্বস্তিতে নেই তরুণীটি বা স্থানীয় তরুণ-তরুণীরা। অস্বস্তি আকাশ ভেঙে আমার মাথায়। মেয়েটিকে বললাম, "আচ্ছা পাগল তো? আমার কোল থেকে ওঠো মা।"

মেয়েটি সহজ-সরল ভাবে বললেন, "তুমি তো আমার বাবার মতো। তোমার কোলে বসলে কী হয়েছে?"

কোল থেকে ওঠার নামটি না করে আমাকে জড়িয়ে ধরেই ছবি তুললেন। আমি জানি, বাবা-মায়ের এই ধরনের আদরের সম্পর্কের মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা বা কদর্যতা দেখে না অসমের একটা বড় অংশের সংস্কৃতি। এ'সব জানার পরও পশ্চিমবাংলার জল-হাওয়ায় বড় হয়ে ওঠা আমি প্রতিবেশী অসমের সংস্কৃতিকে মানতে পারলাম কই?

তোমার আমার দুই চেতনার ভালো-খারাপ

তসলিমা সাহিত্যিক হিসেবে কেমন? সমরেশ মজুমদার ওঁকে সাহিত্যিক হিসেবে একটুও পাত্তা দিতে রাজি নন। দু-দু'বার আনন্দ পুরস্কার পাওয়ার পরও তসলিমা সমরেশের চোখে এলে-বেলে।

আবার এই বঙ্গের কিছু সাহিত্যিক তসলিমার লেখার প্রশংসায় আকাশের মত উদার। কিছু সাহিত্যিক (বিশেষ করে ওপার বাংলার সাহিত্যকরা) মনে করেন, তসলিমা প্রশংসায় পঞ্চমুখ সাহিত্যিকরা আসলে একটি পত্রিকা-মালিকের 'হিজ মাস্টার ভয়েজ'। অর্থাৎ তাঁরাও তসলিমার সাহিত্য-বোধকে তুড়ি মেরে ওড়াতে চান। সাহিত্যিকদেরই এমন দুটি বোধের কারণ, সাহিত্য বিষয়ে দু'ধরনের যুক্তিবোধ। অর্থাৎ সাহিত্যের ভালো-খারাপ একান্তভাবেই দুই চেতনার বিষয়। আপেক্ষিক ব্যাপার। এই যে সাহিত্যের একটা নির্দ্দিষ্ট মানের তুলনায় ভাল বা খারাপ লাগা— তা একান্তভাবেই যার যার নিজস্ব ব্যাপার। আর তাই 'দেশ' ও 'নবকল্লোল' দুই-ই ভালোই কাটে।

'বেদের মেয়ে জোসনা' আর 'স্পাইডার ম্যান' দুটোই কল্পকাহিনী। গ্রাম বাংলার

এক একটা সিনেমা হলে 'বেদের মেয়ে...' চলেছে এক বছরের ওপর। তাও আবার টানা 'হাউজ ফুল'। গরুর গাড়ি নিয়ে দর্শকরা দু-একদিন আগে থেকেই হাজির হতেন হলের সামনে। 'বেদের মেয়ের....' বিশাল জনপ্রিয়তা ভাবা যায়! 'স্পাইডারম্যান' পৃথিবী জুড়ে সাড়া জাগিয়ে রেকর্ড রোজগার করে এই বঙ্গের এঁদো ডোবায় এসে মুখ থুবড়ে পড়লো।

স্পাইডারম্যানের হিন্দি ভার্সনও ছিল। কিন্তু চলেনি। গাদা-গুচ্ছের হিন্দি ছবি যখন শ'য়ের বান্ডিল গুনে ঘরে তুলছে, তখন হিন্দি মাকড়সা-মানুষ সিকি-আধুলি কুড়োচ্ছে।

এই যে বিশেষ কোনও মানের ছবিকে ভালোলাগা, অন্য মানের ছবিকে খারাপ লাগা—একে আমরা বলতে পারি 'আপেক্ষিক' ব্যাপার, বা তুলনামূলক ব্যাপার। একটু একটু করে আমার মনে ভালো-মন্দের যে ধারণা গড়ে উঠেছে, সেই ধারণা থেকেই আমরা একের সঙ্গে আর একের তুলনা করি। এই ধারণা গড়ে ওঠার পিছনেও থাকে কারণ বা যুক্তি। আমাদের সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ-ই আমাদের মধ্যে নানা ধারণা, নানা মূল্যবোধ গড়ে তোলে।

মধ্যপ্রদেশের পটনা তামেলি গ্রামের কুট্টুবাঈকে সতীদাহ করা হয়েছে শুনে আমরা পশ্চিবঙ্গবাসী চম্‌কে উঠি। কী বীভৎস! আমরা মধ্যপ্রদেশবাসী বা রাজস্থানবাসী হলে আপ্লুত আলোচনায় মুখর হতাম—কী অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন সতী কুট্টুবাঈ! পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের সাত পুরুষকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। সতী-তীর্থ করে গেলেন গ্রামকে, যেমনটা সতী রূপ কানওয়ার করে গেছেন দেওয়ালা গ্রামকে।

কয়েক দিন আগের ঘটনা। মধ্যপ্রদেশের কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধুকে একটা সি ডি দেখাচ্ছিলাম। কালীপুজোর রাতে বর্ধমান জেলার এক গ্রামে দশ হাজার বলির দৃশ্য। রক্তে রাস্তা-ঘাট থক্‌থকে লাল কাদা হয়ে গেছে। মোষ বলি দিয়ে মোষের মাথা ঘাড়ে নিয়ে নাচছেন এক ব্রাহ্মণ। ভক্ত নারী-পুরুষের সে কী উন্মাদনা!

ওই বীভৎস দৃশ্য দেখে এক সাংবাদিক বন্ধু বমি করে ফেললেন। অন্য সাংবাদিক বন্ধুরাও ভয়ংকর ধাক্কা খেয়েছেন। তাঁরা সমস্বরে উত্তেজিতভাবে চেঁচাচ্ছিলেন। তাঁদের মোদ্দা বক্তব্য ছিল—তোমরা কী করে এই ধরনের ভয়ংকর নিষ্ঠুর বলি চালাতে দাও? দর্শকরা সবাই তো এ-সব দেখতে দেখতে নিষ্ঠুর হয়ে যাবে। ছোটদের তো মানসিক রোগী বানিয়ে ছাড়বে, যারা বড় হয়ে খুন করতেও পিছ-পা হবে না। তোমরা এইসব বে-আইনি কাজ চালাতে দাও কী করে?

বললাম, "যে কারণে তোমাদের রাজ্যের মানুষ গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে সহমরণের বিরল দৃশ্য দেখতে দৌড়োন; যে কারণে এমন মহৎ কাজে কেউ বাধা দিতে গেলে তাঁরা জান লড়াতেও কসুর করেন না; সেই একই কারণে আমাদের রাজ্যের মানুষ মনে করেন শক্তি আরাধনায় বলি শ্রেষ্ঠ ভোগ। বলিতে বাধা দিতে গেলে ভক্তরা রক্ত-গঙ্গা বইয়ে দিতে-ই পারেন। কারণটা হল প্রশ্নহীন ধর্মীয় আনুগত্য, ধর্মীয় বিশ্বাস।

দু'রাজ্যের আমজনতা দু'ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবেশে একটু একটু করে বড় হয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাসেও কিছু নিজস্বতা বা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এই নিজস্বতার কারণে তোমরা সতীতে আপ্লুত, আমরা বলিতে। পিছিয়ে থাকা সাংস্কৃতিক পরিবেশের কারণে দু'রাজ্যের মানুষই যুক্তি-র চেয়ে ধর্মীয় ভাবাবেগকে গুরুত্ব দেয় বেশি। আবার দু'রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন স্থানীয় মানুষের ভাবাবেগকে গুরুত্ব দেন। ফলে সতীদাহ, বলি, ডাইনি হত্যা ইত্যাদি অপরাধ চলে আসছে। সাংস্কৃতিক পরিবেশগত কারণে তোমাদের কাছে সতীদাহ মহৎ, বলি বীভৎস। আমাদের কাছে উল্টোটা।"

মধ্যপ্রদেশের শিক্ষিতরাও সতীমাঈ কুট্টুবাঈয়ের মাহাত্ম্যের গুজব চেটে-পুটে খাচ্ছেন। গুজব—এক পুলিশ অফিসার সতীমাঈকে চিতা থেকে টেনে নামাতে গিয়েছিলেন। সতীমাঈকে ছোঁয়ামাত্র বৈদ্যুতিক শক খেলেন। ছিটকে পড়লেন দূরে। আর একটি গুজব—এক পুলিশ অফিসার সতীমাঈকে যেই ছুঁয়েছেন, অমনি অফিসারের হাত থেকে গলগল করে রক্ত বের হতে লাগলো।

খবরের কাগজে সতীমাঈ কুট্টুবাঈয়ের অলৌকিক মাহাত্ম্যের খবর আমরা বাঙালিরা পড়েছি। অবাক হয়েছি এই ভেবে যে—এমন গুজবে কেউ বিশ্বাস করতে পারে? আমরাই আবার গুজব খাচ্ছি —রণে-বনে-জঙ্গলে যেখানেই বিপদে পড়ি না কেন, শুধু একবার বাবা লোকনাথকে ডাকলেই সমস্ত সমস্যার 'মুশকিল আসান' হবে।

আমরাই তান্ত্রিক-জ্যোতিষীদের কাছে দৌড়োই বশীকরণ তাবিজ কিনতে। যাকে চাই, তার ছবি আর হাজার তিরিশ চল্লিশ টাকা খরচ করলেই কেল্লা ফতে—বলে মনে করি। আর এই জ্যোতিষীদের ধাপ্পাবাজিতে ভোলার জন্য কর্ণাটকবাসীরা বাঙালিদের আহাম্মক মনে করেন।

তা'হলে কী দাঁড়ালো? আমরা বাঙালিরা চালাক, না বোকা? নাকি এ'সবের পিছনে রয়েছে আত্মসমালোচনার অভাব? অবস্থান পাল্টে নিজেকে দিল্লিবাসী, মুম্বাইবাসী বা ভোপালবাসী বলে ভাবতে শুরু করুন, তারপর আমাদের বাঙালিদের দোষ-ত্রুটিগুলো দেখার চেষ্টা করুন—অনেক কিছুই চোখে পড়বে।

মূল্যবোধ বা ভালো-খারাপ বিচারবোধকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে কেউ কেউ 'আপেক্ষিক' শব্দটিকে কাজে লাগালন। ধরুন আপনি হয়তো বলছিলেন, "সিগারেট খাওয়াটা খুব খারাপ।" ওমনি একটি তরুণ বললেন, 'ভাল-খারাপ ব্যাপারটাই আপেক্ষিক। আপনি খারাপ ভাবছেন, তাই আপনার কাছে খারাপ। আর,

যিনি সিগারেটের ধোঁয়া টেনে এনার্জি পাচ্ছেন, তাঁর কাছে ভালো।"

যে কোনও 'ভালো-খারাপ' প্রসঙ্গকে এ'ভাবে 'আপেক্ষিক' শব্দের মোড়কে গুটিয়ে ফেলার চেষ্টা অতি-সরলীকরণ ছাড়া কিছুই নয়। সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারটাই ধরা যাক। তার ভাল দিক কী? না, অন্যান্য নেশার মতই নেশাগ্রহণকারীর কাছে অপরিহার্য হয়ে ওঠা। পায়খানায় বসে সিগারেটে টান না দিলে পেট হালকা হচ্ছে না। কাজ করতে করতে ক্লান্ত হওয়ার পর আবার চন্‌মনে হয়ে উঠতে সিগারেটে টান—জবাব নেই।

সিগারেটের বা যে কোনও নেশার গুণ-ই তার দোষ। নেশা একটা মানসিক নির্ভরতার ভিত্তি ভূমি হয়ে দাঁড়ায়। হাতের সামনে নেশা না পেলে প্রাণ আনচান। চিকিৎসা করে নেশা নির্ভরতা কাটিয়ে তোলা সম্ভব। তারপর দেখা যাবে মানুষটি সিগারেট না টেনেই প্রতিটি কাজ স্বাভাবিকভাবেই করে চলেছেন। অর্থাৎ তাঁর এই কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সিগারেটের বাস্তবিক কোনও ভূমিকা ছিল না। সিগারেট থেকে কত রকম রোগ-ই না হয়। হাপানি, কাশি, থ্রোট-ক্যানসার, লাং-ক্যানসার, ফ্যারেনজাইটিস থেকে শুরু করে অনেক রোগকে পুষ্ট করে বা তৈরি করে সিগারেটের ধোঁয়া। ক্ষতি করে গর্ভের সন্তানের। এর পরও 'আপেক্ষিক' শব্দ প্রয়োগ করে সিগারেট পানকে 'ভাল ভাবলে ভাল' বলা যায় না।

খণ্ডিত ছেড়ে পূর্ণতায় : ভালো-খারাপের মাপকাঠি

আমাদের মুশকিলটা হয়, যখন একটা ব্যক্তিমানুষের ভালোখারাপ বিচারে বসি, তখন আমাদের শ্রেণী-চরিত্র, আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠা ভালো-খারাপের ধারণা সব-ই আমাদের বিচার শক্তিকে প্রভাবিত করে। এমনকী, এর মধ্যে আমাদের স্বার্থচিন্তাও কাজ করে। একে অতিক্রম করে যাঁরা উঠে আসতে পারেন, তাঁরাই ব্যক্তি চরিত্র ঠিকমত বিশ্লেষণ করতে পারেন।

মধ্যপ্রদেশের কুট্টুবাঈ সতী হলেন। দিন সাতেকের মাথায় কলকাতা এফ এম রেডিও থেকে সতীদাহ'র ওপর আলোচনায় অংশ নেবার আমন্ত্রণ পেলাম। সঞ্চালক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'খোলা-মেলা কথা বলার সুযোগ পাবে?" সঞ্চালক জানালেন, "অবশ্যই।" বললাম, "স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু সতীদাহ প্রথার সমর্থক ছিলেন তিনি সতীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, যেমনটা করেন রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের ধর্মান্ধ মানুষ।"

সঞ্চালক বললেন, "এ'সব আপনি রেফারেন্স-সহ বলতে পারবেন?"

বললাম, "তা পারবো।"

সঞ্চালক এবার বললেন, "স্বামী বিবেকানন্দকে বরং ছেড়ে দিন। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে বাঙালিদের গভীর আবেগ জড়িয়ে রয়েছে।"

বললাম, "কেনই বা আমরা মনে করে বসে থাকবো যে, বাঙালি আবেগ-স্বর্বস্ব

জাতি। যদি তেমনটাই হয়, তবে আমাদের কি উচিত নয়, আবেগ-সর্বস্বতার অবস্থা থেকে বাঙালিদের তুলে আনার সাধ্যমত চেষ্টা করা? আপনি-ই পারেন, এফ এম-এর মতো অত্যন্ত জনপ্রিয় মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে বাঙালির চেতনাকে তুলে আনতে।"

অসম্ভব ভালো লাগলো যখন দেখলাম, সঞ্চালক তাঁর ব্যক্তি স্বার্থ-চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে আমাকে বলার স্বাধীনতা দিলেন। কেন্দ্রে গদিতে বসে ভারতীয় জনতা পার্টি। আকাশবাণী আসলে কেন্দ্রের অধীন। এই অবস্থায় ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শ বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে কথা বলার স্বাধীনতা দিয়ে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক যে হিম্মত দেখালেন, তাতে তিনি আমার কাছে মুহূর্তে বিশাল মানুষ হয়ে গেলেন।

মাত্র একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে সঞ্চালক যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তাকে স্বীকার করার মানে এই নয় যে, তিনি সামগ্রিকভাবেই বিশাল মানুষ। এমনটা তিনি হতেও পারেন, আবার না-ও হতে পারেন। আবার একই ভাবে বিবেকানন্দের কর্মজীবন থেকে একটি দুটি বিচ্ছিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ তাঁকে বিচার করলে ভুল হতে পারে। সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আমাদের প্রয়োজন তাঁর সামগ্রিক কাজ-কর্ম নিয়ে বিশ্লেষণ।

হাতকাটা নেলো একজন বিখ্যাত তোলাবাজ। ওর মূল ঘাঁটি যে পাড়ায়, সেখানকার গরিব মানুষগুলোর কাছে নেলোর রবিনহুড মার্কা ইমেজ। নেলো আর তার দলবল দক্ষিণ কলকাতার একটা বড় অঞ্চল জুড়ে ছোট-বড় দোকানদার থেকে প্রমোটার, সবার কাছ থেকেই তোলা আদায় করে। কেউ বেগড়বাঁই করলে গুলিও চালাতে হয়। ষোলটা খুনের অভিযোগ আছে। আতঙ্কিত দোকানদার ও স্থানীয় মানুষ নেলোকে গ্রেপ্তারের দাবিতে বেশ কয়েকবার রাস্তা অবরোধ করেছেন। নেলোকে ধরা যায়নি।

যে গরিব মানুষগুলোর দরকারে-অদরকারে নেলো অর্থ-সাহায্য করে, তাঁরা এক কথায় নেলোর জন্য জান দিতে পারেন। নেলোর প্রচুর ইনফরমার। ওঁরা নেলোকে ভালোবেসে ইনফরমারের কাজ করেন। পাড়ায় সন্দেহজনক কোনও লোক বা পুলিশ ভ্যান ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে নেলোর কাছে খবর পৌঁছে যায়। নেলোকে নিরাপদে পালাতে সাহায্য করেন পাড়ার কচি-কাঁচা, বুড়ো-বুড়ি সব্বাই।

হাত-কাটা নেলোকে আমরা ভালো বলবো, না খারাপ? এই বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে আরও একটা কথা পরিষ্কার করা বোধহয় জরুরি। সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে জেনেছি—অসাম্যের সমাজ কাঠামোর ওপর গড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সামগ্রিক আইন এমনভাবে তৈরি হয়, যাতে আইন মেনেই শোষণ প্রক্রিয়া চালু রাখা যায়। এমন এক সমাজ কাঠামো কি ভাঙতে চায় নেলো? তার রাজনৈতিক চেতনা, সমাজ চেতনার মধ্যে ভুল থাকতে পারে। ভুল থাকলেও একটা সৎ ইচ্ছের হদিস নিশ্চয়ই

পাওয়া যাবে। তেমন কি কিছু পাওয়া গেছে নেলোর চিন্তায়? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, নেলো ইতিমধ্যে তিনটি সংসার পেতেছে। অনেক বেশ্যালয়-ই তার অস্থায়ী ঠিকানা। অর্থাৎ চরিত্রটা আর পাঁচজন সমাজবিরোধীর ছাঁচে ঢালা। হাত-কাটা নেলো পাড়ার গরিবদের অর্থ সাহায্য করে, না অর্থের বিনিময়ে সাহায্য কেনে?

পাড়ার গরিব মানুষদের কাছ থেকে প্রটেকশন আদায়ের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করাটা অনেক মস্তানদের-ই পুরনো কৌশল। এর দ্বারা গরিবের বন্ধু সাজা যায়, কিন্তু বন্ধু হওয়া যায় না। আর, নকল গরিব-বন্ধুকে, আসল বলি কী করে?

বিদ্যাসাগর, রামমোহন, বিবেকানন্দ অথবা যে কোনও কিংবদন্তি মানুষকে নিয়ে যখনই আমরা কিছু বলি, তাতে কিছু বাড়তি আবেগ যুক্ত হয়। ফলে বক্তব্যে কিছু অসংগতি থেকে যায়। আবার প্রচারমাধ্যম, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিকরা কাউকে ভাল বা খারাপ বললে, আমরা আমজনতা তাকেই সত্যি বলে ধরে নিয়ে সেই সুরে সুর মেলাই। তলিয়ে বিচারে যাই না। বিদ্যাসাগর, রামমোহন, বিবেকানন্দ আমাদের চোখে মনীষী, কারণ প্রচারমাধ্যম থেকে বুদ্ধিজীবী তেমনই বলেন। এ'বার আসুন, যুক্তিকে শাণিত করতে আমরা তিনজনকে নিয়ে কিছু নির্মোহ বিশ্লেষণে নামি।

যে কোনও চরিত্র বিশ্লেষণের আগে আমরা একটা কথা মাথায় রাখবো—আমরা কেউ-ই শ্রেণীবদ্ধতা ও কালবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নই। সমস্ত দোষ-মুক্ত মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। প্রতিটি চরিত্রকে সামগ্রিকভাবে বিচার করে দেখা প্রয়োজন তাঁদের দোষের পাল্লা ভারী, না গুণের?

আমাদের যুক্তি-বুদ্ধিই বুঝিয়ে দেবে এই তিন কিংবদন্তি মানুষকে একই ধরনের বিশেষণে বিশেষিত করাটা ঠিক, কি বেঠিক। তিন ব্যক্তিকে একই পঙ্‌ক্তিতে দাঁড় করিয়ে আমাদের যুক্তিবোধের অভাবকে বে-আব্রু করে তুলছি না তো? আসুন, নিরপেক্ষভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক।

আমাদের আলোচ্য তিন চরিত্রের শ্রেণী-বিশ্লেষণের পাশাপাশি সময় বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি। ভারত তখন ব্রিটিশ শক্তির অধীন। বাঙালি সমাজ তখন দারিদ্র-অশিক্ষা-কুসংস্কার-অধ্যাত্মবাদ ও তন্ত্র সাধনার নামে অনাচারের-যৌনাচারের অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। সেই সময় সমাজ সংস্কারের কাজে অবতীর্ণ হতে দেখেছি দুটি আধুনিক মানুষকে। একজন বিদ্যাসাগর, অপরজন রামমোহন।

আমরা জানি ছোটলাট গ্রান্ট সাহেব গ্রামে গ্রামে স্কুল খোলার প্রস্তাব দিলে বিদ্যাসাগর জানিয়েছিলেন, এতে তাঁর সায় নেই। অপেক্ষাকৃত সচ্ছলদের মধ্যে শিক্ষার গভীর অনুপ্রবেশকে তিনি বেশি কাম্য মনে করেছিলেন। মেয়েদের স্কুল বেশি বেশি

করে গড়ে তুলতে শিক্ষিকা-শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রস্তাবের তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। এই বিরোধিতারও প্রেক্ষিত ছিল। ব্রিটিশ শাসকরা শিক্ষা খাতের খরচের পরিমাণ বা বাজেট ঠিক করে দিতেন। বিদ্যাসাগরের মনে হয়েছিল ওই বরাদ্দ টাকায় গ্রামে গ্রামে স্কুল, শিক্ষিকা-শিক্ষণ কেন্দ্র ও চালু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে চালাতে গেলে শেষ পর্যন্ত কোনওটাই ঠিক মতো চলবে না। তারচেয়ে সচ্ছল, এগিয়ে থাকা মানুষদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে পারলে, সেই শিক্ষিতদের মধ্যে থেকেই অনেকে উঠে আসবেন, যাঁরা শিক্ষাকে গরিব ও নারীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগ নেবেন। শিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যাসাগর লিখেছেন বর্ণপরিচয়, ব্যাকরণকৌমুদী, কথামালা থেকে কত না বই। এ'সব বইয়ের অনেকগুলোই গ্রামের গরিবদের ও নারীদের শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। সব শ্রেণীর মানুষের কাছে যাতে বইগুলো পৌঁছে যায়, তার জন্য বই ছাপা ও প্রকাশনার দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের প্রচলন করেছিলেন। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। নিজে ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণদের আচারসর্বস্বতার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি ছিলেন বেদান্ত বিরোধী। ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরি করেও কখনও 'সরকারি বুদ্ধিজীবী' বা 'যো-হুজুর' হননি। খুব গরিব অবস্থা থেকে উঠে এসেছিলেন। প্রচুর উপার্জন করেছেন। দানও করেছেন প্রচুর। বর্ধমানের মহারাজের ইচ্ছে হল বীরসিংহ ও তার আশেপাশের গ্রাম বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে তুলে দেন। বিদ্যাসাগর বিনয়ের সঙ্গে প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করে বলেছিলেন—যখন আমি ওইসব গ্রামের সমস্ত প্রজার খাজনা দেবার মত উপার্জন করতে পারবো, তখন আপনার জমিদারি গ্রহণ করবো।

দু-চারটি ঘটনাকে টেনে এনে বিদ্যাসাগরকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' সাজাবার একটা চেষ্টা চলছে। এই চেষ্টা নিজেদের অজ্ঞতা বা অনিরপেক্ষতার প্রমাণ। খণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে ছেড়ে গোটা বিদ্যাসাগরকে নিয়ে যুক্তি-শৃঙ্খলার সাহায্যে বিশ্লেষণে নামুন। নিজের যুক্তি-বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে পারবেন, ভাল-খারাপের মধ্যে কোনটা ভারী।

বিদ্যাসাগরের পূর্বসূরি রামমোহন জন্মেছিলেন প্রায় সোয়া-তিনশো বছর আগে সোনার চামচ মুখে নিয়ে। ব্যবসা ও দেওয়ানি পেশায় তাঁর আয় ছিল বিশাল। ধনী বাঙালি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন।

আমরা সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান থেকে শিখেছি—সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ

ব্যক্তি মানুষকে প্রভাবিত করে। ব্যতিক্রমী মানুষ-ই শুধু পারেন সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করতে। রামমোহন ছিলেন এমনই এক ব্যতিক্রমী আধুনিক মানুষ। তিনি বিশাল ধন-সম্পদের মালিক হয়েও বাঙালি বাবু-সংস্কৃতির স্রোতে গা ভাসাননি। খেউড় গান, বাঈ-নাচ, বেশ্যালয়ে রাত কাটানোর মধ্যে যখন ধনী বাঙালি সমাজ ডুবে রয়েছে, তখন রামমোহন আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন গভীর পড়াশুনোর মধ্যে, জগদ্দল সমাজের সংস্কারের কঠিন কাজের মধ্যে।

রামমোহন কোরান পড়তে পাটনায় গিয়ে ফার্সি শেখেন। উপনিষদ পড়তে বারাণসী গিয়ে সংস্কৃত শেখেন। এখানেই শেষ নয়। বাংলা, ফার্সি, সংস্কৃত, আরবি, হিব্রু, ইংরেজি, হিন্দি-সহ গোটা বারো ভাষায় লিখতে-পড়তে-বলতে পারতেন। ২৩ বছর বয়সে ফার্সি ভাষায় তাঁর লেখা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির নাম বাংলা করলে দাঁড়ায়,'একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার।' বাইবেল বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মত নিয়ে তিনি খ্রিস্ট উপাসনা-ধর্মে বিশ্বাসীদের প্রতি আবেদন জানিয়ে তিনটি বই লিখেছিলেন ইংরেজিতে। লিখেছেন পাঁচটি উপনিষদ ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রের নিজস্ব-ভাষ্য। নারী শিক্ষা নিয়েও বই লিখেছেন। তিনশো বছর আগে তিনি এক আশ্চর্য কথা বলেছিলেন, "স্ত্রীলোকদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা কবে আপনারা করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে বুদ্ধিহীন কহেন?" বাড়িতে মেয়েরা আসন গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি কখনও বসতেন না। রামমোহন সোচ্চারে বহুবিবাহের বিরোধিতা করেছেন। সতীদাহের মত সেই সময়কার অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে সমাজের সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যে আন্দোলন করেছেন, আইন বিধিবদ্ধ করিয়েছেন। এবং এ'সবই করেছেন বিদ্যাসাগরের আ.বির্ভাবেরও শ'খানেক বছর আগে।

আমরা জানি, রামমোহন ব্রাহ্ম উপাসনা-ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। আমরা তাঁর ব্রিটিশ শক্তি-প্রীতির কথাও জানি। তিনি মনে করেছিলেন, ইংরেজ শাসনের আবির্ভাবে শত-শত বছরের কুশাসনের অবসানের পালা শুরু হল। পাশ্চাত্য-সভ্যতা, সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ভারতবর্ষ শিক্ষায়-জ্ঞান-বিজ্ঞানে-সাহিত্যে-শিল্পে-বাণিজ্যে কয়েক'শো বছর এগিয়ে গেল। ভারত পেলো উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। কাজির বিচারের নামে প্রহসনের অবসান ঘটলো। বন্ধ হল শাসকদের হেঁকে-ডেকে সম্পত্তি থেকে নারী-লুণ্ঠন। ইংরেজ শাসকদের তিনি মুসলিম বা হিন্দু শাসকদের চেয়ে অনেক বেশি কাম্য মনে করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার বিরোধীদের নিন্দা করেছেন, আবার মধ্যযুগীয় অবস্থায় ফিরে যাবার আতঙ্কে।

ব্রিটিশ শক্তি ভারতকে শোষণ করতে শাসন ক্ষমতা দখল করেছিল, এ'নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। ভারতের গরিবরা সব রাজা-সম্রাটদের দ্বারা হাজার হাজার বছর ধরে শোষিত হয়েছে, এ'নিয়েও কোনও দ্বিমত নেই। আবার এটাই সত্যি যে, ইংরেজরাই প্রথম প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে শিক্ষিত সমাজের কাছে তুলে এনেছিল। ভারতের বিভিন্ন কালের সম্প্রদায়ের, ভাষাভাষির, অঞ্চলের সংস্কৃতির পরিচয় আমরা

ব্রিটিশদের কাছ থেকেই পেয়েছি। রাষ্ট্র-চেতনা, জাতীয়তাবোধ ব্রিটিশরাই এ'দেশের উচ্চবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর চেতনায় ঢুকিয়েছিল। উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তারাই আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিল। ইংরেজ শাসনের আগে এ'দেশের আমজনতা ছিল কয়েক হাজার ছোট-বড় রাজা, সামন্তপ্রভু, গোষ্ঠীপতিদের অধীন। শাসকদের জুতোর শুকতলা হয়ে কৃপা পাওয়াটাই তখন 'মহাভাগ্য' বলে বিবেচিত হত।

এইসব মোসাহেবদের বউ, বোন বা মেয়ের রূপের বর্ণনা শুনলে রাজা থেকে গোষ্ঠীপতি প্রত্যেকেই তার মহলে বা হারেমে পাঠিয়ে দিতে বলতো মোসাহেবদের। ধন-প্রাণ রক্ষা ও বৃদ্ধি করতে সেই আদেশ পালন করতো 'মহাভাগ্যবানেরা'। সম্পত্তি লুঠ, ডাকাতি, হত্যা এ'সব নিয়ে তখন ছিল জঙ্গলের-আইন। রাস্তা-ঘাট-যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। বিচারব্যবস্থা বলতে খেয়ালখুশি। এই অবস্থা থেকে

ব্রিটিশ শক্তি নিজেদের স্বার্থে হলেও ভারতবর্ষের খোল-নলচে পাল্টে ফেলেছিল। রাস্তা-ঘাট-রেল-স্টিমার, বিচার ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, সবেই একটা নতুন জোয়ার এলো। এ'সব সুযোগের অনেকটা সাধারণের কাছে অধরা থাকলেও মাৎস্যন্যায়ের অবস্থা অনেকটাই বিদায় নিল। এমন একটা অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে অতীত শাসকদের থেকে ব্রিটিশ শাসকদের অনেক বেশি কাম্য মনে করেছিলেন রামমোহন।

ইংরেজ প্রীতি এই কাম্যজ্ঞানেরই ফলশ্রুতি ছিল।

গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তারপরও আমরা সরবে স্বীকার করি—বুদ্ধ ছিলেন পৃথিবীর প্রথম যুক্তিবাদী মানুষ। তিনি অস্বীকার করলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব। জানালেন, আত্মা অনিত্য। বললেন, কোনও গ্রন্থকেই অপৌরুষেয় ও স্বতঃপ্রমাণ বলে মানা যায় না। বুদ্ধের কিছু সময়ের সীমাবদ্ধতা ছিল। তারপরও সামগ্রিক বিশ্লেষণের পর বুদ্ধকে শ্রদ্ধা জানাতে দ্বিধা হয় না। বরং ভাবাই যায় না, আড়াই হাজার বছর আগে তিনি কী বিপ্লবাত্মক চিন্তা-চেতনা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

চৈতন্যদেব জাত-পাতহীন, নারী-পুরুষের ভেদাভেদহীন যে উপাসনা ধর্ম প্রচার করেছিলেন, সেই ধর্ম যে হিন্দু-উপাসনা ধর্মের তুলনায় অনেক প্রগতিশীল—এ'কথা না মেনে উপায় নেই।

এক-ই ভাবে রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্ম উপাসনা-ধর্মকে হিন্দু উপাসনা-ধর্মের থেকে অনেকটা এগিয়ে রাখতে পারি। উপাসনা-ধর্মের বিবর্তনের ইতিহাসে ব্রাহ্ম উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি অবশ্যই একটা মাইল স্টোন। ব্রাহ্ম উপাসনা-ধর্মে জাত-পাতের ভেদাভেদ নেই, শ্রাদ্ধ-শান্তির কুসংস্কার নেই, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস নেই, নেই

নিয়তিবাদে বিশ্বাস। সুতরাং তাগা-তাবিজ গ্রহরত্নে বিশ্বাসের কোনও প্রশ্নই নেই। ব্রাহ্মধর্মে অলৌকিকতার কোনও স্থান নেই।

রামমোহন প্রায় তিনশো বছর আগে বাঙালি হিন্দু সমাজকে যতটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে ব্রাহ্মদেরই উচিত ছিল যুক্তিবাদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এক সময় ব্রাহ্মরাই প্রথম নারী-শিক্ষা প্রসারে আন্তরিকতার সঙ্গে উদ্যোগী হয়েছিলেন। আমাদের সমাজের বিবাহিত পুরুষ যখন নিজেকে বিবাহিতা স্ত্রীর স্বামী বা প্রভু বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তখন ব্রাহ্ম সমাজ চেয়েছিল বিবাহিত নারী-পুরুষের সম্পর্ক হোক বন্ধুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মসমাজ সে'কালে শুধুমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিল না। নানা সমাজ সংস্কারের কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। বহুবিবাহের বিরোধিতায়, বাল্যবিবাহের বিরোধিতায়, সহমরণের বিরোধিতায় সমাজ যেমন সামগ্রিকভাবে সোচ্চার ছিল, তেমনই বিধবা বিবাহের সমর্থনেও সোচ্চার ছিল। অসমের চা বাগানের কুলিদের বন্দিদশা থেকে মুক্তির জন্য তাদের দেখেছি আন্দোলনে শামিল হতে। অবশ্য সে'সবই অতীত ইতিহাস।

আজকের ব্রাহ্মরা ঘড়ির কাটা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে তাগা-তাবিজ-গ্রহরত্ন-অলৌকিকত্ব সবেই বিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন। এবং এটাই মূল স্রোত। সমাজ সংস্কারকে শীতের কাঁথার মত গুটিয়ে রেখে ঈশ্বর ভজনাকে সার করেছেন।

এ'সব গভীর পরিতাপের বিষয় হলেও তার জন্য আমরা কোনও ভাবেই রামমোহনকে দায়ী করতে পারি না। সামগ্রিক বিচারে রামমোহন ছিলেন একজন 'আধুনিক মানুষ'।

স্বামী বিবেকানন্দের অনেক সুন্দর সুন্দর বাণী আছে। এক : জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। দুই : হে ভারত ভুলিও না মেথর মুচি চণ্ডাল তোমার ভাই....। তিন : খালি পেটে ধর্ম হয় না...। চার : ভারত বেরুক চাষার কুটির ভেদ করে...

এমনই আরও অনেক বাণী হাজির করা যায়, যে'গুলো সত্যিই ভাল লাগে শুনতে। বিবেকানন্দকে খণ্ডিতভাবে না জেনে সামগ্রিকভাবে জানতে তাঁর 'বাণী ও রচনা', 'পত্রাবলী', নিবেদিতার লেখা 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', শঙ্করীপ্রসাদ বসুর লেখা 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', পড়াটা খুবই জরুরি। এ'সব পড়লে বিবেকানন্দ সম্পর্কে যে ধারণা পরিষ্কার হয়ে ওঠে তা হল—বিদ্যাসাগর বা রামমোহনের মত কালের সীমাবদ্ধতা তাঁর জীবনে আমরা দেখতে পাই না। আমরা যা পাই, তা ভয়ংকর! সোজা-সাপটা স্ববিরোধীতা।

বিবেকানন্দ এক দিকে বাণী দিচ্ছেন "জীবে প্রেম করে যেই জন...." পাশাপাশি তিনি বরানগর মঠে পশুবলির প্রবর্তন করেন।

দরিদ্র সেবার ক্ষেত্রেও বিবেকানন্দ ছিলেন পাক্কা হিসেবি। ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ একটি চিঠি দিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে নির্দেশ দেন, "কলকাতার মিটিং-এর খরচা বাদ দিয়ে যা বাঁচে ঐ famine-এতে (দুর্ভিক্ষে) পাঠাও বা কলকাতা, ডোমপাড়া, হাড়িপাড়া বা গলিঘুঁজিতে অনেক গরীব আছে তাদের সাহায্য কর ..... তারপর লোকের (হিন্দুত্বে) বিশ্বাস হবে, তারপর যা বলবে শুনবে।" (পত্রাবলী, পত্র নম্বর ৩৬৩)

বিবেকানন্দ একদিকে বলছেন, "হে ভারত ভুলিও না...." বলছেন, "নতুন ভারত বেরুক চাষার কুটির ভেদ করে", তখন তিনি-ই চিঠি লিখে শিষ্যদের নির্দেশ পাঠাচ্ছেন, "ধনী দরিদ্রের বিবাদ যেন বাঁধিয়ে বসো না। ধনীদের আদতে গালমন্দ দেবে না।" (পত্রাবলী, পত্র সংখ্য ৪৭৬)

'ব্রহ্ম-বাদিন্' পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে কী করা উচিত, সে বিষয়ে উপদেশ দিয়ে তাঁর একটি চিঠি, "গত সংখ্যায় ক্ষত্রিয়দের খুব বাড়ান হয়েছে, পরের সংখ্যায় ব্রাহ্মণদের খুব প্রশংসা কর, তারপরের সংখ্যায় বৈশ্যদের।" (পত্রাবলী, পত্র সংখ্যা ২৩৯)

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর ও রামমোহনের মতামত জানি। বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গে বলছেন, "বাল্য বিবাহের ওপর আমার প্রবল ঘৃণা।" (ভারতীয় নারী, প্রকাশক উদ্বোধন কার্যালয়, পৃষ্ঠা ৯০)। তারপর-ই আমরা ভয়ংকর রকমের ধাক্কা খাই, যখন দেখি 'ভারতীয় নারী' বইটির ১৫ পৃষ্ঠায় বিবেকানন্দের একটি মত মুদ্রিত রয়েছে, যেখানে তিনি বলছেন, "কখনো কখনো শিশু বয়সেই আমাদিগকে বিবাহ দেওয়া হয়, কেন না বর্ণের নির্দেশ। মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া যদি বিবাহের ব্যবস্থা করিতে হয়, তবে প্রণয়বৃত্তি জাগ্রত হওয়ার পূর্বে বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া ভাল।"

প্রণয়বৃত্তি বা প্রেম সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মতামতে চোখ রাখি আসুন। তিনি বলছেন, "যে-কাউকে ইচ্ছামতো পতি বা পত্নীরূপে গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া যায়, যদি ব্যক্তিগত সুখ এবং পাশবপ্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির চেষ্টা সমাজে বিস্তার লাভ করে, তার ফল নিশ্চয় অশুভ হবে—দুষ্টপ্রকৃতি, অসুর ভাবের সন্তান জন্মাবে।" (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৩য় খণ্ড, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পৃষ্ঠা ২৬৪)। 'প্রেম' বিষয়ে এমন মতকে আমরা কোন্ যুক্তির নিরিখে প্রগতিশীল বলবো?

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ অনেক দেশপ্রেমীর কাছে বিবেকানন্দ ছিলেন আদর্শ। ১৮৯৭-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা-অভিনন্দনের উত্তর দিতে গিয়ে বিবেকানন্দ আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন, "ইংরেজদের সম্বন্ধে যে ঘৃণার

হৃদয় নিয়ে আমি ইংলন্ডের মাটিতে পদার্পণ করেছিলাম, কোনো জাতি সম্বন্ধে তার থেকে অধিক ঘৃণার ভাব নিয়ে সে দেশের মাটিতে আর কেউ কখনো নামেনি।" বিবেকানন্দের এই বক্তব্যকে অনেকেই তুলে ধরে প্রমাণ করতে চান তাঁর ইংরেজ বিদ্বেষ। কিন্তু আসলে এটা বিবেকানন্দের বক্তব্যের অংশ বিশেষ। "কেউ কখনো নামেনি"-র ঠিক পরেই বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "এই সভামঞ্চে যেসব ইংরাজ বন্ধু উপস্থিত আছেন, তাঁরাই সে-বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। কিন্তু যতই আমি তাদের মধ্যে বাস করতে লাগলাম, তাদের জাতীয় জীবনযন্ত্র কিভাবে কাজ করছে দেখতে পেলাম, তাদের সঙ্গে মিশে জানলাম কোথায় রয়েছে তাঁদের জাতির হৃৎস্পন্দন— ততই আমি তাদের ভালবাসতে লাগলাম। তার ফলে, হে ভ্রাতৃগণ, এখানে এমন কেউ নেই যিনি আমার থেকে ইংরেজদের বেশি ভালবাসেন।" (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২) বিবেকানন্দের 'বাণী ও রচনা' ৯ম খণ্ডের ২৫৩ পৃষ্ঠায় বিবেকানন্দ বলছেন, "সকল কথার ধুয়ো হচ্ছে—'ইংরেজ আমাদের দাও।' বাপু আর কত দেবে? রেল দিয়েছে, তারের খবর দিয়েছে, রাজ্যে শৃঙ্খলা দিয়েছে, ডাকাতদের দল তাড়িয়েছে, বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে। আবার কী দেবে? নিঃস্বার্থভাবে কে কী দেয়? বলি ওরা তো এতো দিয়েছে, তোরা কী দিয়েছিস?"

বিবেকানন্দের এই সব বক্তব্য তুলে বলতে চাইছি, বিবেকানন্দকে পুরোপুরি ইংরেজ বিদ্বেষী বলে বর্তমানে যেভাবে চিত্রিত করা হয়, সেটা ঠিক নয়। তিনি তাঁর স্বভাব বৈশিষ্ট্য অনুসারে কখনও ইংরেজ-প্রেম, কখনও ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন।

এই লেখকের একটি বিনীত অনুরোধ,

বিবেকানন্দের কিছু ভালো বাণী পড়ে খণ্ডিত বিবেকানন্দকে না জেনে সম্পূর্ণ বিবেকানন্দকে জানতে আন্তরিকতার সঙ্গে প্রয়োজনীয় বই-পত্তর আদ্যন্ত পড়ুন। দেখতে পাবেন, বিবেকানন্দের সতীদাহের প্রতি সমর্থন থেকে বিধবা বিবাহ বিরোধিতার সম্পূর্ণ চিত্র। দেখতে পাবেন বিবেকানন্দের স্ববিরোধিতার নানা দিক। সুতরাং তাঁর প্রগতিশীল বাণীগুলোই শেষ কথা নয়।

বিদ্যাসাগর, রামমোহন শিক্ষা প্রসারে সমাজ সংস্কারে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। শিক্ষা বিষয়ে বিবেকানন্দের মত ছিল একটু ভিন্ন রকম। তাঁর কথায়, "এইসব বই, এইসব বিজ্ঞান আমাদিগকে কিছুই শিখাইতে পারিবে না। বই পড়িয়া আমরা তোতাপাখী হই, বই পড়িয়া কেহ পণ্ডিত হয় না। .... বই যত কম পড়েন ততই ভাল। .... গ্রন্থ দ্বারা জগতের ভাল অপেক্ষা মন্দ অধিক হইয়াছে।" (বাণী ও রচনা,

৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৫, ৯৯ এবং ১০৯) সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে বিবেকানন্দের স্পষ্ট অভিমত, "সমাজ সংস্কার ধর্মের কাজ নয়।" (পত্রাবলী, পত্র সংখ্যা ৮৩)

যে মতামত, আদর্শ ও আন্দোলনের জন্য বিদ্যাসাগর, রামমোহনকে আমরা শ্রদ্ধা করি, সেই মতামতের, আদর্শের বিরোধী চরিত্র'কে আমরা শ্রদ্ধা জানাবো কী করে? এতে আমাদের স্ববিরোধিতা, ভণ্ডামী, অজ্ঞতা-ই কি প্রকাশিত হয় না?

আমরা কী করবো, আমাদেরই ঠিক করতে হবে। আমজনতার আবেগে গা ভাসাবো, না-কি যুক্তি-বুদ্ধিকে শাণিত করতে সচেষ্ট হবো? আবেগ হল যুক্তির সবচেয়ে বড় শত্রু। আবেগ চিন্তা শক্তিকে দুর্বল করে, যুক্তি দিয়ে বিচার করার ক্ষমতা শেষ করে দেয়। চিন্তা একটা অভ্যাস, একটা চর্চা। এই চর্চা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ যুক্তির মধ্য দিয়ে এগোলে সব সময়-ই আমরা উন্নত থেকে উন্নততর মূল্যবোধে পৌঁছতে পারবো। বুঝে নিতে পারবো কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ ; কোনটা কালো, কোনটা সাদা। তারপরও একটা প্রশ্ন থেকে যায়, আমরা কালোকে কালো, আর সাদাকে সাদা বলার হিম্মত দেখবো কি না? একটা লাগাতার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ভীরুও সাহসী হয়ে ওঠে ; সাহসী হয় ভীরু। মানসিকভাবে সাহসীদের সঙ্গে গভীর মেলামেশার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে ভীরুও সাহসী হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়াকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'গ্রুপ থেরাপি'। আবার একজন শারীরিক ও মানসিক ভাবে শক্তিশালী মানুষও জেলের প্রহার ও অন্ধকার সেলে থাকতে থাকতে মানুষ ও আলো দেখলেই ভয়ে সিটিয়ে যেতে পারে। পাশা-পাশি এও সত্যি—একজন ব্যক্তির আদর্শ, সাহস বহুজনকে উদ্দীপ্ত করে। আপনি-আমিও পারি সেই ব্যতিক্রমী মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে।

হ্যাঁ, আমাদেরই ঠিক করতে হবে, জনতার আবেগের সুরে সুর মেলাবার নিরাপদ পন্থা গ্রহণ করবো, নাকি সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলার হিম্মত দেখাবো? আমরা কাকে শ্রদ্ধা জানাবো—যাঁদের কর্মময় জীবন-ই ছিল বাণী, না-কি বাণীদান-ই যাঁদের প্রধান কর্ম?

মারাদোনার পায়ের জাদু ও যুক্তিবাদ

"যুক্তিবাদ দিয়ে কি মারাদোনার পায়ের জাদু ব্যাখ্যা করা যায়? যায় না।" কথাগুলো আমাকে বলেছিলেন ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবল ফরোয়ার্ড অসীম মৌলিক।

মারাদোনা, জিদান, বেকহ্যাম থেকে রোনাল্ডো কেউ-ই হঠাৎ করে পায়ের জাদু অর্জন করেননি। এঁরা ফুটবলকে জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস করে নিয়েছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই ছ-সাত বছর বয়স থেকে ফুটবল শিখতে শুরু করেছেন বিভিন্ন ক্লাবের শিক্ষণকেন্দ্রে বা আকাদেমিতে। এঁদের কোচরা ফুটবল খেলার বিবর্তনের খুঁটিনাটি খবর রাখেন। বিভিন্ন ক্লাব, ইউরোপিয়ান বা লাতিন আমেরিকান সার্কিটের ফুটবল প্রতিযোগিতার ভিডিও ক্যাসেট দেখেন বারবার। স্পোর্টস মেডিসিনের সাহায্য নেন। প্রয়োজনে সাহায্য নেন মনোবিদের। আর সবচেয়ে বড় কথা যে বয়সে যেগুলো শেখালে ভাল, সে বয়সে সেগুলোই শেখান।

বিশ্ব-স্তরের ফুটবলাররা প্রত্যেকেই ছ-সাত বছর বয়েস থেকে চেষ্টা করেছেন যত বেশি সম্ভব বলের সঙ্গে পায়ের চেটো, থাই, মাথা, কাঁধের সম্পর্ক গড়ে তুলতে। এইসব প্রত্যঙ্গ যত বেশি বলের স্পর্শ পাবে, বল ততই বাধ্য হবে। বল নিয়ে কিশোর মারাদোনারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাচিয়ে গেছেন চেটো, থাই ও মাথার আলতো স্পর্শে। এই বয়সে ছোট-ছোট স্ট্রোকে বল নিয়ে দৌড়নো অভ্যেস করেছেন। এ'সবে 'টাচ' বেড়েছে। খুদে খেলোয়াড়রা বুঝতে শিখে গেছে, কতটা জোরে মারলে বল কোথায় যাবে। এইভাবে তৈরি করা হয় বছর পাঁচেক ধরে। তারপর আসে বল কন্ট্রোল, ট্যাক্‌লিং, শুটিং, পাসিং, সেন্টার, ড্রিবলিং, ভলি, ফ্রি-কিক, গোলকিপিং, অ্যান্টিসিপেশন গড়ে তোলার পর্যায়। একজন ভাল হেডার জানেন, ঠিক কখন লাফালে বলটা ছুঁতে পারবো। সেকেন্ডের ভগ্নাংশে বুঝে নিতে হবে এবার কী করতে হবে, বলটা মাটিতে ড্রপ খেয়ে যাবে, না-কি অরক্ষিত জায়গা দিয়ে গোলে ঠেলতে হবে। ফ্রি-কিক টেকারকে বুঝতে হবে কোন জায়গায় সোয়ার্ভ করালে গোলকিপার হতচকিত হবেন। এমন ফ্রি-কিকের জন্যেই তো বেকহ্যাম ও কার্লোসের এতো নাম। একজন ভাল পাসারকে জানতে হবে ছোট ছোট পাস খেলে দলকে কীভাবে আক্রমণে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, কখন ডিফেন্স-চেরা পাস বাড়াতে হয়। সুইং-মেশান-পাস দিলে অনেক সময় ডিফেন্ডারদের অ্যান্টিসিপেশনে গোলমাল হয়ে যায়। গোলকিপিং-এর বিজ্ঞান বলতে গেলে সবচেয়ে বেশি পাল্টেছে। এখন গোলকিপার শুধুমাত্র লাস্ট লাইন অফ ডিফেন্স নন, ফার্স্ট লাইন অব অ্যাটাকও। একই সঙ্গে গোলকিপারকে হতে হয় একজন ভাল জিমনাস্ট। অ্যান্টিসিপেশন অত্যন্ত জরুরি। বুঝতে হবে ঠিক কখন বের হবো, সোয়ার্ভিং সেন্টারগুলো কোথায় আসতে পারে।

শুধু ফুটবল খেলার ক্ষেত্রে নয়, সমস্ত খেলার উন্নতির জন্যই যুক্তি ও বিজ্ঞানকে বেশি বেশি করে কাজে লাগানো হচ্ছে। কাজে লাগানো হচ্ছে মনোবিদ্‌দের।

এই ছোট্ট আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চয়ই পেয়ে গেছি, মারাদোনার পায়ের জাদুর যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা।

প্রেমের রহস্যময়তা ও যুক্তিবাদ

"আমি বিশ্বাস করি না যে, প্রেমের যে রহস্যময়তা রয়েছে যুগের পর যুগ ধরে, কালের পর কাল ধরে, তা কোনও বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার দ্বারা, $(a + b)^2$ -এর ফর্মুলার দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব।" এই বক্তব্য বাংলা নাট্যজগতের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব চন্দন সেনের।

'প্রেম' নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা মূল্যবোধ প্রতিনিয়ত ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হচ্ছে। মূল্যবোধ ব্যাপারটাই পরিবর্তনশীল। এক সময় বাঙালি হিন্দুরা মনে করতেন, সহমরণ একটা মহান কিছু, একটা গর্ব করার মত ব্যাপার। এক সময় হিন্দু বিধবা কদমছাঁট চুল রাখতেন। থান পরতেন। গয়না পরার প্রশ্নই ছিল না। নিরামিষ খেতেন। আমরা এটাই বিধবার আদর্শ ভাবতাম। এক সময় বনেদী ধনী পরিবারের বধূরা স্বামীর রক্ষিতা-সংখ্যা বাড়লে গর্ব অনুভব করতেন। এইসব প্রাচীন মূল্যবোধকে ত্যাগ করেছে মানুষ। কারণ খারাপ মনে করেছে, তাই ত্যাগ করেছে। নতুন মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে, লাগাতার চিন্তা-ভাবনার ফসল হিসেবে। আরও একটু স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, সমাজের এগিয়ে থাকা মানুষদের চিন্তা-ভাবনার ফসল হিসেবেই সমাজে নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমার স্কুল-কলেজের জীবনে দেখেছি, বন্ধুরা প্রেমে পড়তো। পরিচিতা মেয়েরাও প্রেমে পড়তো। 'প্রেমে পড়া' শব্দটা আমরা ব্যবহার করতাম। এখনও শব্দটা বহুল-ব্যবহৃত। 'বন্ধুত্বে পড়েছে' শব্দটা ব্যবহৃত হতে শুনেছেন? না শোনেননি। বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। প্রেমে পড়াটা তেমনভাবে গড়ে উঠতো না, এখনও গড়ে ওঠে না। আমাদের সময় অনেকেই একটি মেয়েকে দেখেই প্রেমে পড়ে যেতো। তাকে শুধু দেখবে বলে সাইকেলে চক্কর-কাটা, জানালার দিকে চোখ রেখে দীর্ঘ প্রতীক্ষা—কখন শাড়ির আঁচলটা একটু দেখা যাবে। এমন গভীর প্রেমে মগ্ন প্রেমিক দেখেছি, যে একবারের জন্যে প্রেমিকার সঙ্গে কথা না বলেই একতরফা প্রেমিক।

**সে 'সময় 'প্রেম' ছিল হঠাৎ হানাদার। হঠাৎ করেই হানা দিত মনে।
কার চোখে কে যে কখন দিলীপকুমার বা মধুবালা হয়ে উঠবে,
আগাম বলা ছিল অসম্ভব। ওইসব হিজিবিজি
আবেগকে 'প্রেম' মনে করতাম ভেবে
এখন লজ্জা পাই।**

কিন্তু তারপরও বলতে হচ্ছে, তখন ওইসব প্রেমে পড়ার মধ্যেও একটা প্রচলিত ছাঁচ ছিল। একটা ব্যাকরণ ছিল। একটা যুক্তি-শৃঙ্খলা ছিল। সেইসব ছেলে-মেয়েরাই এমন দুম-দাম প্রেমে পড়তো, যাদের ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব

গড়ার সুযোগ ছিল না। এই সুযোগের অভাবে নারীর কাছে পুরুষ ও পুরুষের কাছে নারী ছিল রহস্যময় জগতের মানুষ। একটু তাকানো, বা একটা চিঠি এতই উত্তেজনার সৃষ্টি করতো যে, অনেক সময় রাতের ঘুমটুকুকে পর্যন্ত বিদায় দিতে হতো। অন্ধকার রাতে চোখ ঘরের ছাতের দিকে মেলে শুধু প্রেমের রাজ্যে বিচরণ। প্রেমের কষ্ট ছিল রোমান্টিক ব্যাপার। আমার এক কলেজের বন্ধু আত্মহত্যা করেছিল, প্রেমিকার বিয়ে আটকাতে পারছে না বলে। বন্ধু তার প্রেমিকার সঙ্গে রেলগাড়ির তলায় ঝাঁপিয়ে ছিল। অথচ দু'জনের প্রেমটা ছিল সর্বগ্রাসী। প্রেমিকা কোনও তরুণের সঙ্গে কথা বললে বন্ধুটি সহ্য করতে পারতো না। বন্ধুটি কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা বললে বরদাস্ত করতে পারতো না তার প্রেমিকা। আজ বুঝি, ওদের মধ্যে কোনও প্রেম ছিল না, ছিল আবেগ। এত অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে কখনই বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে না। প্রেমের ক্ষেত্রে 'বন্ধুত্ব' হল আবশ্যিক ও প্রাথমিক শর্ত। আজ এ'সব ভাবি, সে'দিন এমনটা ভাবতাম না। এ'সব-ই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবোধ পরিবর্তনের ফল।

আজ যে সব পরিবারের ছেলে-মেয়েরা নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, স্বাভাবিকভাবে মেলা-মেশা করছে, তারা হঠাৎ করে প্রেমে পড়ার মত অস্বাভাবিক আচরণ করে না।

যাকে চিনলাম না, জানলাম না, বন্ধুত্ব-ই গড়ে উঠলো না, তার প্রেমে পড়লে সেখানেও একটা ছক বাঁধা ব্যাপার থাকে। যার প্রেমে পড়েছি, তাকে প্রেমে ফেলার জন্য নিজেকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করে দেখাবার চেষ্টাও থাকবে। আমাদের যুক্তিবোধই এ'সব শেখায়, এ'ভাবেই পটাতে হয়।

পত্রিকায় মাঝে-মাঝেই পড়ি—প্রেমিকাকে খুন করেছে ব্যর্থ প্রেমিক। এখানে 'প্রেম' শব্দটা এলো কেন? বুঝলাম না। আমাদের অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সব পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে শেষ দিন পর্যন্ত সম্পর্ক থাকে না। কখনও যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা, কখনও ভুল বোঝাবুঝি, কখনও বা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা রুচির পার্থক্যের জন্য বন্ধুরা হারিয়ে যায়। এই বন্ধু বিচ্ছেদ হলে আমরা যদি বন্ধুকে খুন করি—সেটা কতটা মানবিক হবে? এখনও দেখি, প্রেমিকের হাতে প্রেমিকা খুন হলে, অনেকে বলেন, "ঠিক হয়েছে।" এমন খবরও কাগজে পড়েছি, প্রেমিকার কাছে পাত্তা না পেয়ে অভিমানে ব্যর্থ প্রেমিক আত্মহত্যা করেছে। উত্তেজিত প্রতিবেশীরা প্রেমিকার বাড়িতে হামলা চালিয়েছে, মারধর করেছে। বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটলে কেন আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে না? এইসব আত্মহননকারী দেবদাস মার্কা চরিত্রগুলো সিনেমা সাহিত্যের আবেগে কাঁপা অপদার্থ। নারী-পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে বোধের অভাবে হামলাকারীরা এমন হিস্টিরিক হয়েছে।

এমন অনেককে জানি, যাঁরা বিবাহ-বিচ্ছেদের পরও দেখা হলে কথা বলেন, সৌজন্য বিনিময় করেন। এই যে মূল্যবোধের পার্থক্য, এটা একটা হয়ে ওঠার ব্যাপার। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠার ব্যাপার। এই যে দু'ধরনের মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে, একেও যুক্তি দিয়েই আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। দুই মূল্যবোধ গড়ে ওঠার পিছনে রয়েছে দু'ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব।

শিল্পী-সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ—এঁদের অনেকেই বিয়ের পরও অন্য নারী বা পুরুষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন বা বহুজনের সঙ্গে 'অনৈতিক' সম্পর্ক রাখেন। অনেকে মনে করেন—এটা হল বুদ্ধিজীবীদের বজ্জাতি। এর পিছনেও কিন্তু কারণ থাকে। এমন হতে পারে, শিল্পী যখন বিয়ে করেছিলেন, তখন ছিলেন অপরিণতমনস্ক, প্রতিভা তখনও বিকশিত হয়নি। একটু একটু করে প্রতিভা ও মননের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছেন তাঁর জীবনে আসা মানুষটির সঙ্গে গড়ে উঠছে একটা পার্থক্য। এটা মননের পার্থক্য, সাংস্কৃতিক চেতনার পার্থক্য। এমন সময় সমমনস্ক, মননশীল কারও সঙ্গে পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা, বন্ধুত্ব ও প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠতে-ই পারে। বহু শিল্পী-সাহিত্যিকের জীবনে এমনটা ঘটেছে। এটাকে ফর্মুলা বললে ফর্মুলা। প্রতিভাধরদের গুণমুগ্ধের অভাব হয় না। এইসব গুণমুগ্ধদের অনেকে ক্ষণিকের নিকট সম্পর্ক গড়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন বা সহযোগিতা করেন। আবার ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে অনৈতিক সম্পর্ক গড়ার মত শিল্পী সাহিত্যিকও আমাদের সমাজে আছেন। শেষেরটির বেলায় সাধারণভাবে একটা দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে সম্পর্ক।

এই সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে কোন সম্পর্ক আমাদের সহানুভূতি কুড়োবে, কোন সম্পর্ককে আমরা আঁস্তাকুড়ে ফেলবো, সেটা আমাদের মূল্যবোধের ব্যাপার। কোন্‌টিকে 'প্রেম' বলবো, কোন্‌টিকে 'বজ্জাতি'—সেটা বিচারের ভার পাঠক-পাঠিকাদের যুক্তিবুদ্ধির কাছে তুলে দিলাম।

এখন এ'টুকু আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি, বিজ্ঞানমনস্কতা (যার আর এক নাম যুক্তিবাদ) দিয়েই আমরা প্রেমের যে কোনও রহস্য ও রসায়ন ভেদ করতে পারি।

কবি কৃষ্ণা বসুর বাড়িতে রবিবারের সকালের এক আড্ডায় আমাকে পেড়ে ফেলতে এক তরুণ কবি প্রশ্ন ছুড়লেন, "জয় গোস্বামীর কবিতা, বা বিকাশ ভট্টাচার্যের পেইনটিং, এই যে অসাধারণ সব শিল্পসৃষ্টি, একে কি আপনি যুক্তি দিয়ে আদৌ ব্যাখ্যা করতে পারেন?"

আমি মুখ খোলার আগে কৃষ্ণা বললেন,

"একটা পরিশীলনের মধ্যে দিয়ে, একটা চর্চা ও যুক্তিবিন্যস্ত পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যে কোনও শিল্পের দক্ষতায় পৌঁছতে হয়। কবিতা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে এ'কথা প্রযোজ্য বলে গভীরভাবেই মনে করি।"

এত সুন্দর করে বোঝানোর পর আমার আর কিছু বলার নেই।

সমকালীন যুক্তিবাদ' (Contemporary Rationalism)

'সমকালীন যুক্তিবাদ' (Contemporary Rationalism) প্রথমত একটা দর্শন। দ্বিতীয়ত একটা খণ্ডিত দর্শন নয়, সম্পূর্ণ দর্শন। তৃতীয়ত চিরকালীন, চির আধুনিক দর্শন। কারণ এই দর্শন 'সমকালীন দর্শন', সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পা মিলিয়ে এগোয়। শিখতে শিখতে পাল্টায়, পাল্টাতে পাল্টাতে শেখে।

আমরা ইতিমধ্যে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় গিয়েছি। বুঝেছি যুক্তির পথ ধরে-ই সব কিছুকে ঠিকঠাক বোঝা সম্ভব, দেখা সম্ভব। যুক্তিই আমাদের খোঁজ দেয় ইন্দ্রিয়ের নানা ভ্রান্তির, কার্য-কারণ সম্পর্কের। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, সমাজের বিবর্তনের প্রতিটি স্তরে আমাদের যুক্তিবোধ পাল্টায়, পাল্টায় নীতিবোধ। যুক্তিবাদ একটি অনড় দর্শন নয়। যুক্তিবাদ শিখতে শিখতে পাল্টায়, পাল্টাতে পাল্টাতে শেখে।

'দর্শন' হল জীবন ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখার পদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গি। যুক্তিবাদ এমন-ই এক দৃষ্টিভঙ্গি যার সাহায্যে আমরা জীবন ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুকেই দেখতে পাই, বুঝতে পারি। এগিয়ে থাকা মানুষরা যুক্তিবাদকে 'দর্শন' হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সমাজ বিবর্তনের শেষ পর্যন্ত অনিবার্য অগ্রগতির কথা মাথায় রাখলে বলতে হয়, যুক্তিবাদের এই স্বীকৃতি অনিবার্য ছিল।

যুক্তিবাদ দর্শনের অন্যতম প্রধান নীতি হল, পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের পরই আমাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত। কোনও কিছুকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়ার অর্থ—আত্মবিনাশের পথ পরিষ্কার করা।

'সমকালীন যুক্তিবাদ' (Contemporary Rationalism) 'তর্কশাস্ত্র' (Ligic) নয়। এতদিনকার পাশ্চাত্য চিন্তার দ্বারা সংজ্ঞায়িত 'যুক্তিবাদ' (Rationalism) বা 'নয়া যুক্তিবাদ' (New Rationalism) নয়। 'যুক্তিবাদ' ও 'নয়া যুক্তিবাদ'-এর সঙ্গে বাড়তি কিছু। (আমরা একটু পরেই 'তর্কশাস্ত্র' পাশ্চাত্যের 'যুক্তিবাদ' ও 'নয়া যুক্তিবাদ' নিয়ে যখন আলোচনায় যাব, তখন বিষয়গুলো ও পার্থক্যগুলো পরিষ্কার হবে।) 'নব্য যুক্তিবাদ' হলো 'সমকালীন যুক্তিবাদ'-এর আগের ধাপ। 'নব্য যুক্তিবাদ'-এর সীমাবদ্ধতা আছে। সীমাবদ্ধতার কারণে এই মতবাদ শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছুকে দেখা ও বিশ্লেষণ করার দর্শন-ই হয়ে উঠতে পারেনি, 'দর্শন' হিসেবে সর্বকালের গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া তো দূরের কথা।

যুক্তিবাদী সমিতির কলকাতার স্টাডি ক্লাসের একটি সন্ধ্যা। 'ভারতের মানবতাবাদী

সমিতি'র (Humanists' Association of India) সাধারণ সম্পাদক সুমিত্রা বক্তব্য রাখছিলেন। বিষয়-যুক্তিবাদ। কথাগুলো ভালো লেগেছিল। তাই এখানে তুলে দিলাম—

'যুক্তিবাদ' ছিল, আছে, থাকবে। যেমন 'বিজ্ঞান' ছিল, আছে, থাকবে। যুক্তিবাদের আরেক নাম তাই বিজ্ঞানমনস্কতা। নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করার আগেও গাছ থেকে আপেল পড়ত। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ছিল। মানুষ শুধু তাকে আবিষ্কার করেছে। তাকে সূত্রবদ্ধ করেছে। তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। প্রয়োজনে তাকে কাজে লাগিয়েছে। প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। ঠিক তেমনই যখন গুহামানব প্রথম আগুন জ্বালতে শিখল, চাষ করতে শিখল, নিজের প্রয়োজনে পশুপালন করতে শুরু করল, তখন থেকেই তো, সভ্যতার সেই প্রথম লগ্ন থেকেই তো যুক্তিবাদের জয় দেখতে পাচ্ছি।

এখন এই ধর্মোন্মাদনার যুগে শুধু আমরা 'সমকালীন যুক্তিবাদ'-কে একটা বিষয় হিসাবে, একটা সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিভঙ্গি বা দর্শন হিসাবে বুঝতে চাইছি। এবং বোঝাতে চাইছি—যার কোনও বিকল্প নেই। 'সমকালীন যুক্তিবাদ' চিরকাল-ই সমকালীন, চিরকাল-ই আধুনিক বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতি।

'ঈশ্বরে বিশ্বাস', 'বিজ্ঞানের বিশ্বাস' : আকাশ-পাতাল

ধর্ম গুরু, অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ যুক্তিবাদীদের বিরুদ্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ তোলেন। অভিযোগগুলোর মূল সুর এই ধরনের ঃ—

গরুর গাড়ির চাকা থেকে মহাকাশ বিজয়—বিজ্ঞানের প্রতিটি জয়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মানুষের চিন্তা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেচনা ও প্রয়োগ। প্রয়োগ মানেই সফলতা নয়। প্রয়োগে ব্যর্থতা আসতে পারে। আবার ব্যর্থতা মানে অনেক সময়ই সাফল্যের ধাপও; এটাও মনে রাখতে হবে।

আদিম মানুষ গতি বাড়াতে চাকা বানিয়েছে। এই চাকা বানাবার আগে একটি কল্পিত বিশ্বাস নিয়ে চিন্তার জগতে কাজ শুরু করেছিল। একটা কাঠামোর সঙ্গে দুটো বা চারটে চাকা জুড়ে দিলে কেমন হয়? একটা গৃহপালিত পশু তার পিঠে চাপলে যতটা বোঝা বইতে পারে, চাকা লাগানো কাঠামোটা পশুর পিঠে জুতে দিলে তার চেয়ে অনেক বেশি বইবে। এই চাকার গড়নটা যে গোল করলে সুবিধে হবে, সেই ভাবনাটা, বিশ্বাসটা আগে চিন্তায় এসেছে, তার পর প্রয়োগে।

চাকা থেকে মারণ রোগের ওষুধ মহাকাশ গবেষণা—প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আগে গবেষকদের মাথায় চিন্তা এসেছে, একটা কল্পিত বিশ্বাস এসেছে। তারপর তার প্রয়োগ এসেছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের কল্পিত পরীক্ষার শুরু হয় কোনও বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই।

যুক্তিবাদীরা বিজ্ঞানের এই বিশ্বাস নির্ভরতাকে দোষণীয় মনে করেন না; আর আমাদের ঈশ্বর বিশ্বাসের বেলায় যত দোষ! এ'হল যুক্তিবাদীদের স্ববিরোধিতা। এ'হল যুক্তিকে বাদ দেওয়া নিজের স্বার্থে। যুক্তিবাদীরা কোনও পরীক্ষা না চালিয়েই বলে দেন—ঈশ্বর নেই। এও তো তাঁদের বিশ্বাসেরই কথা।

বিজ্ঞানের 'বিশ্বাস' ব্যাপারটা একেবারেই অন্যরকম। বিজ্ঞানের জগতে এই ধরনের বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে কোনও কাজই হয় না। 'বিজ্ঞান' বলতে 'পরীক্ষা' পর্যবেক্ষণ-সিদ্ধান্ত' নামের যে অতি সরলীকৃত একটি সংজ্ঞা চালু আছে, সেটাও পুরোপুরি ঠিক নয়। বিজ্ঞানে তত্ত্ব আছে, অঙ্ক আছে, আবার পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণও আছে। বিজ্ঞানের পরীক্ষা বলতে শুধুমাত্র গবেষণাগারে যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা বোঝায় না। বিজ্ঞানের পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে একটি কল্পিত প্রস্তাবনা বা Hypothesis, যে প্রস্তাবনা যাচাই শেষে একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছবার সম্ভাবনা থাকে। এই প্রস্তাবনায় পৌঁছতে কল্পিত পরীক্ষার প্রয়োজন হয়, অঙ্কের সাহায্য নিয়ে পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। পাশাপাশি রয়েছে যে বিষয় নিয়ে গবেষণা হবে, সেই বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত যে-সব গবেষণা ইতিপূর্বে হয়েছে বা হচ্ছে, সেগুলো জানা। বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের সঙ্গে সেগুলোর সঙ্গতির পরীক্ষা। প্রস্তাবনার সঙ্গতির পরীক্ষা। প্রয়োজনমতো কল্পিত প্রস্তাবনার পরিবর্তন করা। এরপর আসে কল্পিত প্রস্তাবনা বা তত্ত্বটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে ফলাফলের পরীক্ষা।

খুব সংক্ষেপে 'পরীক্ষা' শব্দটিকে আমরা ব্যবহার করেছি। বাস্তবে অসংখ্য পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের তত্ত্বকে যাচাই করা হয়, তারপর আসে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার প্রশ্ন। এ'ভাবে যাচাই করার আগে বিশ্ব বিখ্যাত বিভিন্ন গৃহীত তত্ত্বও ছিল প্রস্তাবনা মাত্র।

বিজ্ঞানের কল্পিত প্রস্তাবনার সঙ্গে জড়িত বিশ্বাসগুলো এসেছে পূর্বসূরী বিজ্ঞানীদের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব ও নানা গবেষণা থেকে। এই বিশ্বাসের সঙ্গে সত্যের একটা সম্পর্ক থাকে।

ঈশ্বরকে নিয়ে বা পক্ষীরাজ ঘোড়ার অস্তিত্ব নিয়ে বিজ্ঞান কেন গবেষণার প্রথম পর্যায়—কল্পিত পরীক্ষায় যাবে না, তার পিছনে অবশ্যই জোরালো কারণ আছে। ঈশ্বর বা পক্ষিরাজ ঘোড়ার অস্তিত্ব শুধু বইয়ের লেখা আর আঁকা ছবিতে পাওয়া গেছে। তেমন লেখা ও ছবি তো হাঁসজারু, বকচ্ছপ থেকে রাক্ষস অনেক বইতে-ই পাওয়া যায়। কল্পনার মিথ্যের ওপর ভিত্তি করে আর যাই হোক বিজ্ঞানের কল্পিত প্রস্তাবনা তৈরি হয় না। ঈশ্বর দেখার দাবিদার বা ভক্তদের প্রচারে বিশ্বাস করে বিজ্ঞান কল্পিত প্রস্তাবনায় নামতে পারে না। কারণ, বিজ্ঞানেরই একটি শাখা মনোবিজ্ঞানের কাছে ঈশ্বর-দর্শনের কার্য-কারণ সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট। মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের অস্বাভাবিকতা থেকেই মানুষ অলীক দেখে। অলীক

দর্শনে ঈশ্বর এলে মানুষটি পুজো পায়, আর অভিনেত্রী করিশমা এলে পাগল বলে গাল খায়।

যদি কোনও ঐশ্বরিক ক্ষমতার দাবিদার প্রকাশ্যে, নিরপেক্ষ ভাবে তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রমাণ বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থার কাছে হাজির করতে পারতেন, শুধু তবে-ই বিজ্ঞানীদের ঈশ্বর নিয়ে কল্পিত পরীক্ষায় নামার প্রশ্ন আসতো।

ঈশ্বর নিয়ে বিজ্ঞানের কল্পিত পরীক্ষায় যাওয়ার বড় বাধা হল বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলো। মুসলিমরা যদি বলেন, ঈশ্বর নিরাকার ; তো হিন্দুরা কয়েক হাজার দেব-দেবীর মূর্তি পুজো করে বুঝিয়ে দেন ঈশ্বরের আকার আছে। আবার হিন্দু ধর্মে এই নিয়ে লাঠালাঠি কম নেই। অনেক হিন্দুদের কাছেই ঈশ্বর নিরাকার। আবার জৈনরা মনে করেন, মানুষই জৈন ধর্মের নিয়ম-নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে দেবতা হতে পারেন।

এতো যত ধর্ম মত, তত বিভাজন। ঈশ্বর নিয়ে উপাসনা-ধর্মগুলোর মধ্যেকার বিরোধিতা আমাদের কাছে তাদের বিশ্বাসের অসারতাই স্পষ্ট করে দেয়। ধর্মমতগুলো নিজেদের মধ্যে বসে 'ঈশ্বর'-এর একটা সর্বধর্মমত-গ্রাহ্য সংজ্ঞা তৈরি করার প্রাথমিক কাজটুকু আগে শেষ করে ফেলুক।

তারপর ধর্মগুরুরা নামবেন পরবর্তী বাধাগুলো অতিক্রম করতে। খুঁজে হাজির করবেন এমন ধর্মগুরু, যিনি প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে ঐশ্বরিক ক্ষমতা দেখাবেন। তখন বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ ঈশ্বর নিয়ে কল্পিত পারীক্ষায় নামার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেন।

এ'সব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিয়ে বোকা বোকা চেঁচাবেন না যে—যুক্তিবাদীরা কোনও পরীক্ষা না চালিয়েই বলে দেন ঈশ্বর নেই।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে যে, 'ঈশ্বরে বিশ্বাস' আর 'বিজ্ঞানের বিশ্বাস'-এর পার্থক্য কোথায়।

'যুক্তিবাদ' পাবলিক খাচ্ছে ভালো

'যুক্তিবাদ' পাবলিক ভালই খাচ্ছে—কথাটা রাষ্ট্র হয়ে যেতেই যুক্তিবাদকে নতুন নতুন ভাবে পরিবেশনে লেগে পড়েছে অনেকে-ই। এমন-ই এক জিভে জল আনা খাবার 'যুক্তি পেস্টো'। মধ্যমেধার বুদ্ধিজীবীদের প্রিয় খাবার।

উপকরণ : ১০০ গ্রাম যুক্তির ঘিলু, ১৫০ গ্রাম শোধন করা তাবিজ-কবচ, ১০০ গ্রাম পুজো-আচ্চা, ১৫০ গ্রাম শ্রাদ্ধ-শান্তি, ২০০ গ্রাম অন্তরে জিইয়ে রাখা ঈশ্বর-বিশ্বাস, ১০০ গ্রাম জনগণের ধর্মীয় আবেগ, শ্রদ্ধা, ১০০ গ্রাম প্রগতিশীলতা ও ১০০ গ্রাম মার্কসবাদ।

প্রণালী : মার্কসবাদকে ইচ্ছে মত ফালি ফালি করে কেটে রেড টমাটো সসে ডুবিয়ে রাখুন। বাকি সব উপকরণ মিক্সিতে দিয়ে এক সঙ্গে পেস্ট করে নিন। এবার এই পেস্ট মার্কসবাদের ফালিতে মাখিয়ে আধঘণ্টা ম্যারিনেট করুন। তারপর একটা

পাত্রে ভাববাদের মাখন গরম করে ফালিগুলো লাল করে ভেজে গরম গরম পরিবেশন করুন। খাদ্য-রসিকরা জিভে লালা ঝরিয়ে লুফে নেবেন।

'সমকালীন যুক্তিবাদ'-এর পালের হাওয়া কাড়তে অনেকেই

'আগে কে বা প্রাণ করিবেক দান, তার লাগি কাড়াকাড়ি', সমকালীন যুক্তিবাদের পালের হাওয়া কাড়তে রাষ্ট্র শক্তির গেটের কাছে বুদ্ধিজীবীদের বিশাল লাইন। লাইনে শামিল যুক্তিবাদী-বুদ্ধিবাদী-কৌশলবাদী-এ জি ও'বাদীরা। রাষ্ট্রশক্তির কাছে ওঁরা বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী। শত হলেও সমাজ কাঠামোর চারটে পায়ার একটা তো ওঁরাই।

'রাষ্ট্র' মানে তো আসলে শোষকদের রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ার। সমাজে শোষক-শাসক দু'টি শ্রেণী থাকলে রাষ্ট্র-চরিত্র এমনটাই থাকবে। রাষ্ট্রের মূল লক্ষ হবে ধনী-শোষকদের একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা। এই রাষ্ট্রকে টিকে থাকতে কিছু সহায়ক শক্তির প্রয়োজন হয়।

যেমন, (১) শাসক হতে চাওয়া, গদিতে বসতে চাওয়া রাজনৈতিক দল। যারা শোষণকে তৈল মসৃণ করতে শোষকদের স্বার্থরক্ষাকারী নানা আইন তৈরি করবে। (২) সেনা-পুলিশ-প্রশাসন। যারা শোষিত মানুষদের উস্কে দেওয়ার চেষ্টাকে কড়া হাতে দমন করবে। (৩) প্রচার মাধ্যম। মাধ্যমগুলোর ক্রোড়পতি মালিকরা প্রয়োজনমত, কৌশল ও বুদ্ধিকে কাজ লাগিয়ে আমজনতার মগজ ধোলাই করে যাবে। (৪) বুদ্ধিজীবীরা, যাঁদের কথা শুরুতেই বলা হয়েছে। বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের লেখায়-রেখায় প্রতিটি সৃষ্টিতে মগজ ধোলাই করবেন। বেয়াদপ মানুষদের আন্দোলনের পালের হাওয়া কাড়তে মেকি বেয়াদপ মানুষ তৈরি করবে। রাষ্ট্রের পক্ষে কোনও বিপদ্জনক তত্ত্বকে ঠেকাতে যা দরকার রাষ্ট্র সব করবে।

এক প্রাক্তন নকশালপন্থী নেতার একটা লেখা পড়ছিলাম 'উবুদশ' পত্রিকায়। যতই পড়ছিলাম, বিস্ময়ের পারদ ততই চড়চড় করে ওপরে উঠছিল। এ'যেন কোনও লালটুকটুকে মানুষের লেখা নয়, গেরুয়া কারও লেখা? তিনি লিখেছেন, "যুক্তির একটা গ্রহণযোগ্যতা থাকে। সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, পশ্চিমে ডোবে, এটা যুক্তিবাদ, যে কেউ মেনে নেবে, কিন্তু এটা তো সত্যি নয়। সূর্য ওঠে না, ডোবেও না, আসল সত্য হল এটাই। সুতরাং 'যুক্তিবাদী' আর 'সত্যবাদী' এক ব্যক্তি নন। যুক্তিবাদ শেষ বিচারে টুপি-পরানোর প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ।"

পৃথিবী সূর্যের চারপাশে যেমন ঘুরছে, তেমনই নিজের মেরুদণ্ডের চারপাশে লাট্টুর মত ঘুরে চলেছে। এই লাট্টু গতির জন্যেই পৃথিবীর মানুষ সূর্যের উদয় ও অস্ত দেখে। এই দেখাটাকে আমরা অস্বীকার করতে পারছি না। এও সত্যি—সূর্য ওঠে

না, ডোবেও না। এটা আজকালকার ফাইভ-সিক্সের ছাত্র-ছাত্রীরাও জানে। ওরা এ'সব জেনেছে বিজ্ঞানের বই থেকে। আর বিজ্ঞান জেনেছে যুক্তির পথ ধরে।

বস্তুময়তা এবং বাস্তব পরিবর্তনশীলতার ধারণা ছাড়া যুক্তি দাঁড়ায় না। যুক্তিবাদ আসলে বস্তুবাদ-ই।

এক সময়ের কট্টর বস্তুবাদী মানুষটির কত দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে, দেখে চমকালাম দুঃখিত হলাম। প্রাক্তন নকশাল নেতা উচ্চশিক্ষিত, লেখাপড়ায় ভালো। ন'য়ের দশকের এক্কেবারে গোড়ায় যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় অফিসে এসে যুক্তিবাদের পক্ষে স্টাডি ক্লাশও পরিচালনা করেছিলেন। যুক্তিবাদের পক্ষে কত না কথার ফুলঝুরি জ্বালিয়েছিলেন সে'দিন। আর আজ কিনা লিখছেন—সূর্য ওঠে না, ডোবে না, বিজ্ঞানের এই সত্য যুক্তিবাদীরা মানেন না! কেন তাঁকে এমন অদ্ভুত কথা লিখতে হল? যুক্তিবাদীদের সম্বন্ধে এমন বোকা-বোকা ভাবনা তাঁর মত শিক্ষিতের তো থাকা উচিত নয়! তবু কেন এলো? প্রাক্তন বিপ্লবী আরও লিখলেন—সূর্য ওঠেও না, ডোবে না। অতএব যুক্তিবাদীরা মিথ্যেবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল।

বুদ্ধের ক্ষণিকবাদের অণুবীক্ষণের তলায় বিপ্লবীটিকে ফেললে রহস্য পরিষ্কার হয়ে যায়। তিরিশ বছর আগের বিপ্লবী আর আজকের প্রতিবিপ্লবী মানুষটি এক নন। সময়ই তাঁকে পাল্টে দিয়েছে। তিনি এখন রাষ্ট্রের বুদ্ধিজীবীদের লাইনে আছেন। রাষ্ট্র চায়, তাই তিনি যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে সরব।

'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' যত দিন শুধু বাবাজী-মাতাজীদের 'ভাণ্ডাফোড়' করছিল, ততদিন এ'সব খবর বাজারে বিক্রি করতে উদ্যোগী ছিল অনেক প্রচার মাধ্যম-ই। যখন রাষ্ট্র শক্তির মনে হল, ওরা গরিব মানুষগুলোর মাথায় চেতনার আগুন জ্বালাতে চাইছে, তখনই রাষ্ট্র নামলো যুক্তিবাদী সমিতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে। যুদ্ধে জেতাটাই নীতি। রাষ্ট্র বিভিন্ন দিক থেকে এক সঙ্গে সাঁড়াশি আক্রমণ চালালো। এক দিকে রাষ্ট্রের অর্থানুকূল্যে ও বিদেশি অর্থে গজিয়ে উঠলো অনেক যুক্তিবাদী সংগঠন ও বিজ্ঞান ক্লাব।

যুক্তিবাদী সমিতি ও তার সহযোগী সংগঠন মানবতাবাদী সমিতিকে ভাঙতে টোপ ফেলা হল নানা ধরনের। আর এক দিকে, দেশের মানুষ যুক্তিবাদী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা বলে যাঁকে গ্রহণ করেছে, তাঁকে ঠেকাতে অতীত ও বর্তমানের অনেককে 'যুক্তিবাদী' বলে প্রচার শুরু হল।

আর এক দিকে কিছু বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে অপপ্রচার শুরু হল—যুক্তিবাদ প্রতিক্রিয়াশীলদের মতবাদ ; যুক্তিবাদ মার্কসবাদ বিরোধী ; যুক্তিবাদ খ্রিস্টপূর্বেও ছিল; যুক্তিবাদ ও

চার্বাকবাদ একই মতবাদ, যার শেষ পরিণতি ভোগবাদ।

আমরা প্রচার মাধ্যমগুলোর কল্যাণে জেনেছি তিন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী যুক্তিবাদী ব্যক্তিত্বের জন্মশতবর্ষ পালনে সরকারি নানা উদ্যোগের খবর। এ'সবই কালের বিচারে সাম্প্রতিক ঘটনা। আমরা প্রচারের কল্যাণে জানলাম প্রশান্ত মহলানবিশ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং জে বি এস হ্যালডেন নিখাদ যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন। রাজ্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন ও বিজ্ঞান পত্রিকা এঁদের জন্মদিন পালন করলেন।

তিন জনই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিশাল প্রতিভার অধিকারী, এ'নিয়ে দ্বিমত নেই। তাঁদের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শতবর্ষ পালন—অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টা ; এ বিষয়েও দ্বিমত নেই। দ্বিমতটা অন্য জায়গায় ; ওঁদের তিনজনকে আদর্শ যুক্তিবাদী হিসেবে প্রচারে নামার বিরুদ্ধে। ওঁদের বিশাল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিলে আমজনতা শ্রদ্ধায় আপ্লুত হতেন। এর জন্য যুক্তিবাদী সাজাবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বরং উদ্যোক্তাদের মিথ্যাচারিতা তিন ব্যক্তিত্বকে অসম্মান-ই করেছে।

এমন প্রচারে নামার পিছনে আরও গভীর কোনও অভিসন্ধি থাকতে-ই পারে। রাষ্ট্র শক্তি চায়, সাধারণ মানুষ 'যুক্তিবাদী' বলতে সেইসব চরিত্রকে আদর্শ বলে গ্রহণ করুক, যাঁরা যুক্তিতেও আছেন, আবার ঈশ্বর, নিয়তিবাদ, অলৌকিক বিশ্বাসেও আছেন। বিবেকানন্দকে যুক্তিবাদী বানাবার চেষ্টা এই ষড়যন্ত্রেরই ফল। উদ্দেশ্য, জনগণকে বোকা বানিয়ে আসল যুক্তিবাদীদের আগ্রাসন রোখা।

প্রশান্ত মহলানবিশ 'নিষ্ঠাবান' ব্রাহ্ম। ব্রহ্ম বা পরমপিতায় বিশ্বাসী। ব্রাহ্মধর্ম প্রেতচর্চা ও প্ল্যানচেটে বিশ্বাসী না হলেও প্রশান্ত মহালানবিশ এ'সবে বিশ্বাসী ছিলেন, জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা রবীন্দ্র-জীবনী গ্রন্থ আগ্রহী পাঠক-পাঠিকারা নেড়ে-চেড়ে দেখতে পারেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঈশ্বরে ও অলৌকিকত্বে পরম বিশ্বাসী ছিলেন। অনেক অলৌকিকবাবাদের চরণে মাথা ঠেকাতে তিনি যেতেন। সে'সব তাঁর ছাত্র-ছাত্রী বহু বিজ্ঞানীদেরই অজানা নয়। কিছু কিছু অলৌকিকবাবারা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভক্তি-গদ্গদ সার্টিফিকেট ও ছবি নিজেদের প্রচারমূলক বইতে ছেপে থাকেন।

জে বি এস হ্যালডেন সম্পর্কে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যা বলা হয় তা হল—"হ্যালডেন শুধুমাত্র একজন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন না, ছিলেন মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী সামাজিক দায়বদ্ধ এক মহান পুরুষ। সমাজতন্ত্রের প্রতি আমরণ তাঁর আস্থা ছিল।" ....একদিকে বিজ্ঞানের গবেষণা অন্যদিকে সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়া, এই ছিল তাঁর আদর্শ।" (কথাগুলো হ্যালডেনের "The Inequality of Man and Other Essays" নামের প্রবন্ধ সংকলন থেকে নির্বাচিত প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ মানুষের বিভিন্নতা'য় প্রকাশিত প্রকাশকের নিবেদন'-এর অংশ বিশেষ) যে কলম থেকে উৎসারিত হ্যালডেনের সমাজতন্ত্রের প্রতি আমরণ আস্থার কথা, সেই কলমই কিন্তু হ্যালডেনের ই এস পি ও টেলিপ্যাথি বিশ্বাসে আমরণ আস্থা

বিষয়ে নীরব থাকে। হ্যালডেনের নিজের কথায়, ‘‘আমি বুঝি না যে একজন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী কেন পূর্বসিদ্ধভাবে টেলিপ্যাথি বা অলৌকিক দৃষ্টির ঘটনা বলে যা দাবি করা হয় সেগুলির সম্ভাবনা অস্বীকার করবেন।’’ (The Marxist Philisophy and the Sciences গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ‘বিজ্ঞান ও মার্কসীয়দর্শন’; জে বি এস হ্যালডেন। প্রকাশক চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৯০; পৃষ্ঠা ১০৭)

অর্থাৎ হ্যালডেন টেলিপ্যাথিসহ বিভিন্ন অতীন্দ্রিয় ব্যাপার-স্যাপার বস্তুবাদীরা না মানায় যথেষ্টই বিস্মিত এবং কিছুটা ক্ষুব্ধও। তাঁর মতে এ'সব বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রতারণা হতে পারে, কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রে অবশ্যই নয়। কী সর্বনাশ! হ্যালডেন একই সঙ্গে মার্কসবাদে ও অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাস রেখেছিলেন।

হ্যালডেনকে যখন বিভিন্ন মহল থেকে ‘বস্তুবাদী’ বলে প্রচার করা হচ্ছে, তখন হ্যালডেনের নিজের লেখায় আমরা পাচ্ছি, ‘‘আমি নিজে বস্তুবাদী নই, কারণ বস্তুবাদ যদি সত্য হয় তাহলে আমার ধারণা আমরা জানতে পারি না যে সেটা সত্যি। আমার মতামতগুলি যদি আমার মস্তিষ্কের মধ্যে চলতে থাকা রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে হয়, তাহলে সেগুলি নির্ধারিত হয় রসায়নের নিয়মে, যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মে নয়।’’ (মানুষের বিভিন্নতা, হ্যালডেন, পৃষ্ঠা-৬৮) এর পরেও হ্যালডেনকে বস্তুবাদী মহান মার্কসবাদী বলে ‘প্রজেক্ট’ করা কি নীতিগর্হিত নয়? মিথ্যাচারিতা নয়? উদ্দেশ্যমূলকভাবে বস্তুবাদের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের মেলবন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নয়?

চার্বাক থেকে দেকার্ত এবং যুক্তিবাদ

বুদ্ধ, মহাবীর, চার্বাক, স্পিনোজা, কান্ট, হেগেল, দেকার্ত, ভলতেয়ার, কভুর, ডিরোজিও, আরাজ আলী মাতুব্বর প্রমুখ যুক্তিবাদী মানুষ যুক্তিবাদী আন্দোলনকে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছেন। কালের সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে তাঁরা যা করেছেন, তাতে যুক্তিবাদী আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়।

পূর্বসূরিদের চিন্তা-ভাবনা অভিজ্ঞতাই আমাদের যুক্তিবোধ ও জ্ঞানকে আরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই এগিয়ে যাওয়ায় পূর্বসূরি চিন্তাবিদ থেকে বিজ্ঞানী কেউ-ই ছোট হন না। প্রাচীনের অবদান শ্রদ্ধা বা স্বীকৃতি হারায় না। এই বইটি শুরু থেকে যাঁরা পড়ে এখানে এলেন, তাঁরা এই ভাবধারার স্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পেয়েছেন।

গত শতকের ন'য়ের দশকে এসে আমরা হঠাৎ-ই দেখলাম কিছু বুদ্ধিজীবীদের ‘যুক্তিবাদ’ নিয়ে লেখা। লেখাগুলোয় তাঁরা একটা ছাপ মানুষের মনে ফেলতে চাইছেন যে, চার্বাক, দেকার্ত, স্পিনোজা, হেগেল, কান্ট ইত্যাদি মানুষগুলো বর্তমান যুক্তিবাদীদের আদর্শ চরিত্র হওয়ার যোগ্য। যুক্তিবাদের এই পূর্বসূরিরা কালের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে আজও অনুসরণীয়।

দেকার্ত ঈশ্বরের ও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। স্পিনোজার দর্শনও ছিল ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সঙ্গী করেই। লিবনিজ তাঁর দর্শনে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন ঈশ্বর ও আত্মা বিষয়ক ধর্মীয় মতবাদকে। কান্ট ঈশ্বর ও আত্মার সঙ্গে অতীন্দ্রিয় ব্যাপার-স্যাপারে বিশ্বাসী ছিলেন।

এঁদের যাঁরা 'আধুনিক যুক্তিবাদীদের' অনুকরণযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁরা কি না জেনে-বুঝেই এসব কথা বলেছেন? নাকি অন্য পরিকল্পনা আছে মাথায়? ঈশ্বরে ও যুক্তিতে অবস্থানকারী হাঁসজারু-মার্কা 'যুক্তিবাদী' গড়ার পরিকল্পনা?

যুক্তিহীন আধ্যাত্মবাদী চিন্তাকে বাতিল করার ঝাঁঝ চার্বাকবাদে যতখানি উপস্থিত, ততখানি অনুপস্থিত ভবিষ্যৎমুখী মানবতাবাদী সমাজ সচেতনাবোধ। চার্বাক দর্শনে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটিয়ে সাম্যের সমাজ গড়ার কোনও চিন্তা ছিল না। চার্বাকবাদীরাও ছিল সেই সময়কার রাজতন্ত্রকেন্দ্রিক শোষণ কাঠামোর সমর্থক। আমাদেরই ঠিক করতে হবে, আমরা সেই চার্বাক নিয়েই চর্বিত চর্বণ করবো, না কি আরও যুগোপযোগিতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাবো যুক্তিবাদকে।

ডিরোজিও যৌবনে পা দিয়েই ঝরে যাওয়া একটা জীবন। এরই মধ্যে তিনি ভারতীয় সমাজের স্থূল কুসংস্কার মুক্তির জন্য অনেক কাজ করেছেন। তাঁরই জনা কুড়ি ছাত্র ডিরোজিওর আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়েছেন। হিন্দু ধর্মে নিষিদ্ধ খাবার খেয়েছেন, কালী ঠাকুরকে নিয়ে ছড়া কেটেছেন। ডিরোজিওর যুক্তিবাদী চিন্তা শুধুমাত্র কিছু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ ছিল। ডিরোজিওর 'যুক্তিবাদ' কখনই বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতি বা জীবন দর্শন হয়ে ওঠেনি। ডিরোজিওর যুক্তিবাদ দিয়ে সৌন্দর্যবোধ থেকে নীতিবোধ ইত্যাদি বাস্তব বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা সম্ভব ছিল না। ডিরোজিয়ানপন্থী ধনীর সন্তানদের অনেকেই ডিরোজিওর কুসংস্কার মুক্তির চিন্তাকে আত্মস্থ করতে পারেননি; তাই তাঁরা, পরবর্তীকালে খ্রিস্টান হয়েছিলেন, কেউ প্ল্যানচেটের আসর বসাতেন।

ডিরোজিওর কুসংস্কার মুক্তির চেষ্টাকে যে কারণে আমরা যুক্তিবাদী দর্শন বা বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়কে দেখার ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি মনে করি না, সেই একই কারণে কোভুরের যুক্তিবাদকে আমরা কোনও ভাবেই 'যুক্তিবাদী দর্শন' বলতে পারি না। কোভুর কুসংস্কার মুক্তির জন্য চেষ্টা করেছেন। তার জন্য তাঁকে আমরা অবশ্যই শ্রদ্ধা জানাই।

এ'দেশের বুদ্ধিজীবীরা যাঁদের 'যুক্তিবাদী' দর্শনের পথিকৃৎ বলে প্রচারে নামলেন, তাঁরা কেউ-ই পথিকৃৎ নন। বরং তাঁরা যুক্তিবাদের 'দর্শন' চরিত্রটিকে ধরতেই পারেননি। তাঁদের লেখায় এ'কথা বেরিয়ে আসেনি যে,

'যুক্তিবাদ' একটি স্ববিরোধীতাহীন বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতি। যুক্তিবাদের সাহায্যে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি সৌন্দর্যবোধ, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, মূল্যবোধ, নারী-পুরুষের প্রণয় সম্পর্ক ইত্যাদি বাস্তব বিভিন্ন বিষয়।

কিছু সমাজ সচেতন, রাজনীতি সচেতন মানুষ মনে করেন, 'সমকালীন যুক্তিবাদী দর্শন' এবং তার স্রষ্টার উত্থান ঠেকাতেই রাষ্ট্র লড়াইতে নামিয়েছে তার সহযোগী শক্তিদের। বার বার একই মিথ্যে প্রচার করে মিথ্যেকেই 'সত্যি' বানাতে চাইছে। এই মিথ্যে প্রচারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব দিতে লিফলেট, পুস্তিকা ইত্যাদি নিয়ে পাল্টা প্রচারে নেমেছে এ'দেশের ও বাংলাদেশের যুক্তিবাদীরা। ওরা মনে করে 'আধুনিক যুক্তিবাদ দর্শন'-এর স্রষ্টা কোনও দেশের একান্ত সম্পত্তি নন। তাঁর উপর যে পরিকল্পিত লাগাতার আক্রমণ চালানো হচ্ছে তা পৃথিবীর তামাম যুক্তিবাদী দর্শনে আস্থাশীলদের ওপর আক্রমণ। যুক্তিবাদের ওপর আক্রমণ।

গত শতকের ন'য়ের দশক থেকে একটা বিষয় অনেকেরই নজরে পড়েছে। 'সমকালীন যুক্তিবাদী' দর্শনের স্রষ্টার ওপর সর্বাত্মকআক্রমণের পাশাপাশি দু-তিনজন ব্যক্তিকে 'একালের বিশিষ্ট যুক্তিবাদী' বলে তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। এঁদের একজন একটি রাজনৈতিক দলের বিজ্ঞান সংগঠনের সভাপতি ও পাড়ার দুর্গোপুজো কমিটিরও সভাপতি। আর একজন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বই-পত্তর লেখেন, পুজো ও শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ভাববাদী বই'কে প্রশংসা করে সার্টিফিকেট দেন। তৃতীয় জন গ্রহরত্নের আংটি পড়েন, পুজো করেন, কুসংস্করের বিরুদ্ধে বই লেখেন। বইয়ের উদ্বোধন করেন কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে। 'দামি যুক্তিবাদী', তাই পুজো দিয়ে বই উদ্বোধনের খবরও ছাপা হয় খবরের কাগজে।

এর বিষময় ফল ইতিমধ্যেই প্রকট হয়ে উঠেছে। সাচ্চা যুক্তিবাদীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঝুটা যুক্তিবাদীদের সংখ্যা। আজ এমন যুক্তিবাদী সংস্থা বা বিজ্ঞান ক্লাবের সংখ্যা কম নয়, যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাগা-তাবিজধারী কুসংস্কারের আচ্ছন্ন মানুষগুলো। এঁরা 'যুক্তিবাদ দর্শন' বিষয়টা নিয়ে তত্ত্বগতভাবে কিছুই জানেন না। জানার প্রয়োজনও বোধ করেন না। এঁদের কাছে যুক্তিবাদ শুধুই একটা ফ্যাসান। প্রগতিশীল সাজার ফ্যাসান।

উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের বিবর্তনের মত বিবর্তন ঘটে চলেছে আরও অনেক ক্ষেত্রেই। যেমন উপাসনা-ধর্মের বিবর্তন, বিজ্ঞানের বিবর্তন, দর্শনের বিবর্তন।

দর্শনের বিবর্তনের একটা ইতিহাস আছে। যুক্তিবাদী দর্শনের উত্তরণ বা বিবর্তনেরও একটা ইতিহাস আছে। সেই আদিম যুগে বেঁচে থাকার তাগিদে, শিকারের তাগিদে আমরা গাছের ডালের মুখ ঘসে ছুঁচলো করে হাতিয়ার করেছি। পাথর ঘষে ধারালো অস্ত্রের চেহারা দিয়েছি। আগুনের ব্যবহার শিখেছি। চাকা তৈরি করতে শিখেছি।

সৈন্য ও সম্পদ গণনার তাগিদে সৃষ্টি হল পাটিগণিতের। জমি মাপ-জোকের প্রয়োজনে এলো জ্যামিতি। শস্য উৎপাদনের স্বার্থে ঋতু পরিবর্তনের হিসেব রাখতে গিয়ে সৃষ্টি হল জ্যোতির্বিজ্ঞানের। যুক্তি-গণিত-বিজ্ঞান সবই আমাদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের অঙ্গ। আমাদের যুক্তি-বুদ্ধির বিবর্তনের ইতিহাস। এমনি করেই মানুষের যুক্তি-বুদ্ধির কয়েক হাজার বছরের বিবর্তন আমাদের পৌঁছে দিয়েছে মহাকাশ ও কম্পিউটারের যুগে। এই বিবর্তন শুধু প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের বেলায় ঘটেনি। ঘটেছে খেলা, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, নাটক, নৃত্য, সিনেমা, চিন্তায়, দর্শনে। 'সমকালীন যুক্তিবাদ' দর্শনেরই এক চূড়ান্ত বিবর্তিত রূপ।

'তর্কবিদ্যা' ও 'যুক্তিবাদ' এক নয়

তর্কবিদ্যা অর্থাৎ ন্যায় দর্শনের সঙ্গে সমকালীন যুক্তিবাদী দর্শনের একটা বড় রকমের পার্থক্য রয়েছে। ভারতীয় ভাববাদীরা বেদ ও বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রকে অভ্রান্ত, স্বতঃপ্রমাণ ধরে নিয়ে তারপর বেদ ও ধর্মশাস্ত্রের নানা বক্তব্য নিয়ে নিজেদের মত করে টীকা বা ব্যাখ্যা হাজির করেন। বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে মত পার্থক্য থাকে। সেই পার্থক্যের কারণে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে যুক্তি-তর্কের লড়াই চলে। বেদ ও ধর্মশাস্ত্রকে অভ্রান্ত ধরে নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বা টীকাকারদের এই তর্ককেই, 'তর্কবিদ্যা' হিসেবে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে প্রধান গৌরবের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'তর্কবিদ্যা' কখনই 'যুক্তিবাদ' হয়ে ওঠেনি। কারণ, প্রথমেই ধর্মশাস্ত্র বা বৈদিক সাহিত্যকে অভ্রান্ত ধরে নেওয়ার পিছনে কোনও যুক্তি নেই।

পাশ্চাত্যের (Rationalism ও New Rationalism) যুক্তিবাদ ও নব্য-যুক্তিবাদ

পাশ্চাত্যে যুক্তিবাদের চর্চার একটা ইতিহাস আছে। লক, কান্ট, হিউম প্রভুখ চিন্তাবিদরা যুক্তিবাদ বা Rationalism তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এই যুক্তিবাদের মূল বক্তব্য ছিল—জ্ঞান মাত্রেই reason বা যুক্তি-বুদ্ধি থেকে আসে। ইন্দ্রিয় অনুভূতি থেকে আমরা যা জানতে পারি, বুঝতে পারি, তাতে ভুল থাকতে পারে। কারণ ইন্দ্রিয় প্রতারিত হতে পারে। ফলে আমরা ইন্দ্রিয় থেকে যা পাই, তাকে 'জ্ঞান' না বলে 'মতামত' বলাটাই ঠিক হবে।

প্রাচীন এই যুক্তিবাদীদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করতেন, মানুষ কিছু সহজাত ধারণা নিয়ে জন্মায়। এই সহজাত ধারণাগুলো কখনই মিথ্যে হতে পারে না। সম্ভবত ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টির সময় এই ধারণাগুলো মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেন।

এইসব যুক্তিবাদীরা যুক্তিকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। কিন্তু কালবদ্ধতার কারণে, অর্থাৎ সেই সময়কার সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস, আত্মায় বিশ্বাস ইত্যাদি কিছু বিশ্বাসের উর্ধ্বে তাঁরা উঠতে পারেননি। আমরা বলতে পারি তাঁরা হলেন 'ঈশ্বরবাদী যুক্তিবাদী'। অর্থাৎ বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের মতই তাঁরাও আগেই ঈশ্বর আছেন, ধরে নিতেন।

পশ্চিমি দেশগুলোতে 'New Rationalism' বা 'নব্য যুক্তিবাদ' বলে একটি মতবাদের আবির্ভাব হয়েছে। এই 'নব্য যুক্তিবাদ' অন্যান্য দেশেও ইতিমধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে।

নব্য যুক্তিবাদের মতে 'মন' হল প্রকৃতির-ই উৎপন্ন ফল (product), প্রকৃতির সঙ্গে বেড়ে ওঠে। প্রকৃতি যে'হেতু তার নিজস্ব নিয়মে চলে, তেমন-ই মানুষের মনও প্রকৃতিগত যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়। সোজা কথায়—মন যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রকৃতির বিশালতার অংশ মাত্র আমাদের মন ধরতে পারে। যে'টুকু ধরতে পারে, তাকে যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা বিচার করে গ্রহণ করলে ভুল হওয়া উচিত নয়।

আমাদের গাণিতিক (Mathematical) ও তর্কশাস্ত্র (logical) বিষয়ক আলোচনা থেকে যে সব সত্য উঠে আসে তা জগতের বস্তুগত নিয়মশৃঙ্খলার সঙ্গে জড়িত। এর সঙ্গে অপার্থিব কোনও কিছুর সম্পর্ক নেই।

আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয় থেকে আসে না। আসে অভিজ্ঞতা থেকে। সেই অভিজ্ঞতা নিজের হতে পারে আর পূর্বসূরিদের থেকে পাওয়া—এমনও হতে পারে।

এই বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারছি না। ইন্দ্রিয়গুলো না থাকলে আমরা নিজের বা পূর্বসূরিদের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতাম কী করে? আর পূর্বসূরিরা-ই বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে মাথায় রাখতেন কী ভাবে? মাথায় আসে না!

ইন্দ্রিয় আমাদের যেমন মাঝে-মধ্যে ভুল দেখায়, ভুল শোনায়, ভুল বোঝায়, তেমন-ই ঠিক-ঠাক জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের অবদানকে কোনও অবস্থাতেই অস্বীকার করতে পারি না। ইন্দ্রিয় যে মাঝে-মধ্যে ভুল বোঝায়, এবং এই ভুল বোঝার পিছনেও যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে—তা আমরা বুঝতে পারি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই।

নব্য যুক্তিবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জেমস হার্ভে রবিনসন (James Harvey Robinson)-এর মতে, 'নব্য যুক্তিবাদ' মনে করে জ্ঞানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা সৃজনশীল চিন্তার (creative thought)।

অনেকেই যুক্তির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাননি—তাই যুক্তিহীন। আবার যুক্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিলেই যে সবাই যুক্তিবাদী হয়ে উঠবেন—এমনটা নয়। কারণ যুক্তিবাদী হয়ে উঠতে গেলে যুক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যেমন জরুরি, তেমনই জরুরি সৃজনশীল চিন্তার অধিকারী হওয়ার। দু'য়ের মেলবন্ধনে একজন যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে।

এত কিছুর পরও 'নব্য যুক্তিবাদ' শেষ পর্যন্ত একটা মতবাদ হয়ে রইলো। বিশ্বের সমস্ত কিছুকে দেখার ও বিশ্লেষণ করার দর্শন হয়ে উঠল না।

অধ্যায় ঃ চার

উপাসনা-ধর্ম ঃ আধুনিক মত

ভগবানের জঙ্গলে এক পাগল

প্রথম কলকাতা দর্শন বছর বারো বয়সে। সেদিন ছিল ছট্ পুজো। অর্থাৎ সূর্যের পুজো। তাসার বাজনা, হিজড়েদের নাচ, দণ্ডিকাটা মেয়ে বউ আর কাঁদি কাঁদি কলা নিয়ে গঙ্গায় ছট্ পুজোর মিছিল যাচ্ছিল একের পর এক। গঙ্গাকে দেবী ভাবার মত মন ছিল না, সুর্যকে দেবতা? বাঙালি বলেই বোধহয় গোটা ব্যাপারটাই কেমন বোকা বোকা লাগছিল। কারণ, বাঙালিদের ছট্ পুজো নেই। থাকলে বোধহয় এমনটা মনে হত না।

সকালে বড়বাজারে যাঁড়েদের গরম গরম গাদাগুচ্ছের জিলিপি আর কচুরি খাওয়াতে দেখলাম মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের। "ঘাস বা বিচুলির বদলে জিলিপি কচুরি খাওয়াচ্ছে কেন ওরা?" আমার প্রশ্নের জবাবে ছোটমামা জানালেন, "ওরা গরুকে ভগবতী মনে করে। যাঁড়কে ভগবান। তাই খাইয়ে পুণ্যি করছে।" অবাক হয়েছিলাম!

চিড়িয়াখানায় কুমিরের চৌবাচ্চায় অবাঙালি কিছু দর্শক প্রণাম করে পয়সা ছুড়ে দিচ্ছিলেন। জানলাম, এসব নাকি মকরকে প্রণাম করে প্রণামী দেওয়া, পুণ্যলাভের আশায়। অবাক হয়েছি!

আদ্রায় কেটেছে আংশিক শৈশব। ওখানে সাপের দেবী মনসার পুজো হতো খুব ধুমধাম করে। দুর্গা ঠাকুরের মত বিশাল মূর্তি। দু-পাশে জয়া-বিজয়া। কোনও কোনও পুজো প্যান্ডেলের বাড়তি আকর্ষণ ছিল চাঁদ সওদাগরের মনসা পুজোর মূর্তি। বিসর্জনের দিন দিঘির ঘাট ঘিরে মণিহারি দোকান, মুরগি লড়াই, জুয়া, তাড়ির পসরা। ঝাঁকা ঝাঁকা সাপ নিয়ে সাপুড়েদের ভিড়। ভক্‌ভক তাড়ির গন্ধ, গ্রাম্য-সানাই, মাদল, ধামসার উন্মাদনা—মন নাচত। মনসা পুজো ছোট্ট থেকে জীবনের সঙ্গে এতটাই মিশে গিয়েছিল যে, সাপের পুজো দেখে মাথায় কোনও প্রশ্ন আসেনি।

আদ্রার জীবনে সাপের কামড় থেকে বাঁচতে শোয়ার সময় বালিশে তিনটে টোকা মেরে একটা মন্ত্র আওড়াতাম, "আস্তিকেশ্বর মণি মাতা ভগ্নি বাসুকি তথা/জরৎকার

মুনি পত্নী/মনসাদেবী নমস্তুতে।'' সে সময় ভাবতাম, এই মন্ত্রের শক্তিতে সাপ কিছুতেই কামড়াবে না। তার অনেক বছর পরে জেনেছি বৈদিক যুগের মুনি-ঋষিরাও মনে করতেন, ঠিক মন্ত্র পড়ে যজ্ঞ করলে ফল মিলবেই। দেবতাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে মন্ত্রশক্তির কাছে অতি তুচ্ছ।

বাবা ট্রান্সফার হলেন খড়্গপুরে। খড়্গপুরে জলের অভাব ছিল। গুরুর অভাব ছিল না। বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠী ও ভাষাগোষ্ঠীর মানুষরা তাঁদের প্রদেশ থেকে গুরু আমদানি করতেন। এই উপলক্ষে প্রবাসী জীবনে নিজেদের গোষ্ঠীর মানুষজনদের হয়তো বেশি করে কাছে পেতেন। আর আমি ছিলাম একটু বেশি রকম গুরু-নেওটা। মুচিদের দৃষ্টি যেমন জুতোর দিকে, আমার ছিল গুরুদের দিকে। যে কোনও পাড়ায় নতুন গুরু এলেই খবর পৌঁছে যেত। গুরুদের কেউ নিরাকার একেশ্বরবাদী, আল্লাকে শুধু মানেন। কেউ বা শ্বেতাম্বর নিরীশ্বরবাদী জৈন, মুখে কাপড় বেঁধে রাখেন পোকাদের বাঁচিয়ে রাখতে। কেউ বা দিগম্বর জৈন, ঈশ্বর মানেন না। আবার কেউ বা ছত্রিশ কোটি দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। কেউ রাধে-শ্যাম, তো কেউ সীয়ারামের ভক্ত। কেউ নিরামিষভোজী পরম বৈষ্ণব তো কেউ বা চরম শাক্ত, নিত্য মদ্য-মাংস সেবায় লাগান। কেউ লিঙ্গের পূজারি কেউ বা যোনির। কেউ দেহ-মিলনে পরম ব্রহ্ম খুঁজে পান। কেউ বা মন্ত্র শক্তিকে দেবতার উপরে স্থান দেন। কেউ সূর্যের উপাসক। কেউ আগুনের পূজারি। কেউ বা পিশাচ সিদ্ধ প্রেত পুজারি তান্ত্রিক। কেউ বা গো-মাতাতে নিবেদিত প্রাণ।

এঁরা সকলেই দাবি করতেন—তিনিই একমাত্র খাঁটি। আমি এক ভগবান সন্ধানী পাগল, গিয়ে পড়েছিলাম ভগবানের জঙ্গলে। যতই পথ খুঁজে বেড়াতে চাইতাম, ততই হারিয়ে যেতাম ভগবানের গভীর জঙ্গলে।

উপাসনা-ধর্ম : নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিতে

উপাসনা-ধর্ম নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার শুরু মাত্র ২৩০ বছর আগে। আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজতত্ত্ববিদরা নানা আদিম মানব গোষ্ঠীদের মধ্যে উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে গভীর গবেষণা করেছেন। তাঁদের গবেষণার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন মতামতের সঙ্গে আমরা পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি। উপাসনা-ধর্মের আদি ও প্রাথমিক রূপ কী ছিল? বর্তমান অবস্থায় পৌঁছতে কী কী স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে? এ'সবই আমরা জেনেছি বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণাকর্ম থেকে। উপাসনা ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে প্রথম বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থটির নাম 'Primitive culture' বাংলা করে বলতে পারি 'আদিম সংস্কৃতি'। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালে। লেখক টাইলর (Tyler)। টাইলরকে দিয়ে যাত্রা শুরু। তারপর বহু বিবর্তনবাদী নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ উপাসনা ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে গবেষণা করেছেন ও গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। 'ধর্ম' (religion)-এর প্রাথমিক রূপ খুঁজে পেতে

গবেষকদের প্রায়ই মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। আদিম মানব সমাজের মানসিক অবস্থার নানা পর্যায় সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণা না থাকলে উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি ও বিবর্তনের নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় অনেক ভুলের সম্ভাবনা থেকে যাবে।

আদিম মানব জীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্য নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় পাওয়া গেলেও তা থেকে আমরা কিছু কিছু অনুমানে পৌঁছতে পারি মাত্র। সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান আমাদের সেই অনুমানকে আরও কিছুটা সঠিক দিকে পরিচালিত করতে পারে। সেই অনুমানকে আমরা কোনওভাবেই নির্ভুল সিদ্ধান্ত বলতে পারি না। আদিম মানুষের জীবনযাত্রার ইতিহাসের প্রায় পুরোটাই অজানা। কারণ তখন ইতিহাস লিখে যাবার প্রশ্ন-ই নেই। এখনও পর্যন্ত পৃথিবী জুড়ে যে'সব পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে আদিম মানব গোষ্ঠীর অতি সহজ-সরল মানসিক অবস্থা জুড়ে আমরা সেই সময়কার সমাজ জীবনের একটা ছবি পেতে পারি। আদিম সমাজ জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ে জানতে না পারলেও, তখনকার মানুষদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির একটা মোটামুটি ধারণায় অবশ্যই পৌঁছতে পারি।

এমনই কিছু মোটামুটি ধারণার উপর ভিত্তি করে কিছু নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজতত্ত্ববিদরা আদিম মানব-সমাজে ঈশ্বর বিশ্বাস ও উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে গবেষণা করেছেন ও কিছু সুস্পষ্ট মতামত দিয়েছেন। আমরা এমনই কিছু উল্লেখযোগ্য মতামত এবার আলোচনায় নিয়ে আসব।

● **টাইলরের 'সবেরই প্রাণ আছে তত্ত্ব' (Animiam) :** টাইলর তাঁর 'আদিম সংস্কৃতি গ্রন্থে লিখলেন—আদিম মানুষ বিবর্তনের একটা পর্যায়ে এসে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, সবের-ই প্রাণ আছে। নদী, সমুদ্র, মেঘ, বিদ্যুৎ, বর্ষা, বন্যা, পাহাড়, আগুন, গাছ-পালা, জঙ্গল, ঝড়, চাঁদ, সূর্য ইত্যাদি সবের-ই। আরও বিশ্বাস করতো—মানুষের প্রাণ আছে বলে মানুষ যেমন নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করতে পারে, তেমনই নদী থেকে সূর্য প্রত্যেকেই নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো কাজ করে।

নদীর পানীয় জলের যোগান ও বন্যা, সমুদ্রের বিশালতা ও জলোচ্ছ্বাস, মেঘের আকাশ চেরা বিদ্যুতের ঝলকানি, বজ্রপাত ও বৃষ্টি, আগুনের দহন ক্ষমতা, সবুজে ঢাকা পাহাড়-পর্বতের বিশালতা ও রহস্যময়তা, শিকার ও ফলমূলের জন্য অরণ্য নির্ভরতা, বৃক্ষ থেকে ফল-মূল-জ্বালানি সংগ্রহ ও ছায়া প্রাপ্তি, সূর্যের অন্ধকার কাটিয়ে আলোয় ভরিয়ে দেওয়া, উদয় ও অস্তের পরিক্রমা, চাঁদের স্নিগ্ধ আলো ও আকাশ পরিক্রমা, হ্রাস-বৃদ্ধি—এ'সবই আদিম মানুষদের মনে বিস্ময়, ভক্তি, ভয় ইত্যাদি সৃষ্টি করেছিল। উপকারী প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রাকৃতিক শক্তিকে তারা যেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি থেকে তুষ্ট করতে চাইতো, তেমনই ঝড়, বন্যা, বজ্রপাতের মত ধ্বংসকারী

শক্তিকে ভয় করতো, এবং ভয়াবহ এইসব শক্তি থেকে বাঁচতে তাদেরও তুষ্ট করতে চাইতো।

এই তুষ্ট করার চেষ্টা থেকেই উপাসনার উৎপত্তি। সব কিছুরই প্রাণ আছে, এবং তাদের ভালো বা খারাপ করার ক্ষমতা আছে—এমন চিন্তা থেকেই সূর্য, চন্দ্র, নদী, সমুদ্র, বায়ু, ঝড়, বজ্র ইত্যাদিকে ঈশ্বর বলে মনে করার শুরু। পৃথিবীর প্রায় সব অঞ্চলেই এইসব প্রাকৃতিক শক্তিকে ঈশ্বর হিসেবে পুজো করা হত বা এখনও হয়।

এই হল মোটামুটি ভাবে টাইলরের 'Animism' বা 'সবেরই প্রাণ আছে' তত্ত্ব।

টাইলরের এই তত্ত্বকে সমাজ বিজ্ঞানীদের বড় অংশই মেনে নিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন,

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র একটা সময় আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যে এই বিশ্বাস ছিল যে, গাছ থেকে সূর্য—সবেরই প্রাণ আছে। এই বিশ্বাসই সেই সব আদিম মানবগোষ্ঠীর ঈশ্বর বিশ্বাস ও উপাসনা-ধর্মের ভিত।

'সবেরই প্রাণ আছে' এই বিশ্বাস কোন্ সময়ে দেখা দিয়েছিল? প্রশ্ন আসে। কোনও কোনও সমাজ বিজ্ঞানী এই বিশ্বাসের আবির্ভাবের কাল বা সময় নির্ধারণ করেছেন। বাস্তবে এ'ভাবে সময় ঠিক করাটা ভুল হবে। কারণ, আদিম মানুষের বিবর্তনের পর্যায়গুলো পৃথিবী জুড়ে, একই সঙ্গে আসেনি। ভারতীয়দের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের দিকে তাকালেই এই বক্তব্যের সত্যতা বুঝতে পারবেন। আমরা স্যাটেলাইট, কম্পিউটার জমানায় আছি—এটা আংশিক সত্য। কারণ আমরা যখন জাড়োয়া তখনই আদিম মানুষের খোলস ছেড়ে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারিনি।

● **হার্বাট স্পেনসর-এর (Harbert Spencer) 'প্রেতপুজো তত্ত্ব' ঃ** স্পেনসর হাজির করলেন এক নতুন তত্ত্ব। তিনি বললেন, উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে প্রেতপুজোর মধ্য দিয়ে, যা আসলে মৃত পূর্বপুরুষদের উপাসনা। আদিম মানুষরা মনে করতো, পূর্বপুরুষদের আত্মাকে তুষ্ট রাখলে আত্মারা বিপদে-আপদে তাদের রক্ষা করবে। স্পেনসরের মতে, 'সবেরই প্রাণ আছে' ধারণারও আগে প্রেতপুজোর শুরু।

ভারতের পিছিয়ে থাকা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দিকে তাকালে দেখতে পাবো পূর্বপুরুষদের আত্মাকে পুজো করা এখনও টিকে আছে। সাঁওতাল সমাজ বিশ্বাস করে, পরিবারের কেউ মারা যাওয়ার পর 'বোঙ্গা' অর্থাৎ ঈশ্বর হয়ে যান। পারলৌকিক আচার-আচরণ পালনের পর ওই বোঙ্গা তার নিজের পরিবারের কুঁড়েঘরে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকে। আত্মার এই বোঙ্গাকে বলে 'হপ্রামপো

বোঙ্গা'। প্রতি পরবে পরিবারের লোক হপ্‌রামপো বোঙ্গাকে নৈবেদ্য দেয়। বিনিময়ে এই বোঙ্গা পরিবারকে বিপদ-আপদে রক্ষা করে।

আদিম আদিবাসী কিছু কিছু সমাজে প্রেতপুজো ছিল। যে'সব আদিবাসী জনগোষ্ঠী এখন সংস্কৃতিগত ভাবে পিছিয়ে আছে, সে'সব জনগোষ্ঠীর কেউ কেউ এখনও প্রেতপুজো করে। তার সরল অর্থ এই নয় যে—প্রেতপুজোই উপাসনা-ধর্মের উৎস।

আদিম সমাজে মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্পনা আগে এসেছিল, তার-ও পরে এসেছে প্রাকৃতিক বস্তুর প্রাণের কল্পনা—এমন তত্ত্ব মনোবিদরা স্বীকার করেন না। তাঁরা মনে করেন, আগে প্রাণের কল্পনা এলে, তারপরই শুধু আত্মার কল্পনা করা সম্ভব।

আত্মার মতো একটা জটিল কল্পনা মানসিক বিবর্তনের অনেক উঁচু স্তরে এসেছে। আর নৃতত্ত্ববিদদের আধুনিক গবেষণা থেকে আমরা যা জানতে পেরেছি, তাতে এ'টুকু নিশ্চিন্তে বলা যায় যে, উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি প্রেতপুজোর মধ্য দিয়ে নয়।

● **রবার্টসন স্মিথ (Robertson Smith)-এর 'টোটেম তত্ত্ব' (Totem-Theory) :** স্মিথ-এর 'Religion of Semites' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৫ সালে। উপাসনা-ধর্ম নিয়ে তাঁর 'টোটেম তত্ত্ব' সে সময় দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল। টোটেম হল সাধারণভাবে সেই প্রাণী গোষ্ঠী, যারা একটি মানব গোষ্ঠীর প্রতীক বা কুলপ্রতীক বলে পরিচিত। এই টোটেম প্রাণীদের মধ্যে গাছ, ফুল, ফল ইত্যাদিকেও গণ্য করা হয়। স্মিথ তাঁর 'সেমিটিসদের ধর্ম' গ্রন্থটিতে সেমেটিক জাতিগোষ্ঠীর উপাসনা-ধর্ম নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। 'সেমিটিক জাতি' মানে বাইবেলে কথিত 'Shem' (শেম) থেকে উৎপন্ন জাতিগোষ্ঠী। এই জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে ব্যাবিলনিয়ন, আসিরিয়ন, ফিনিসিয়ন, মৌটিস, ওল্ড হিব্রু, পূর্ব অ্যারামিনিয়ন, পশ্চিম অ্যারমিনিয়ন, উত্তর আরবিক, দক্ষিণ আরবিক, আবিশাইনিয়ন। এই উপজাতিগুলোর মধ্যে টোটেম প্রথার প্রচলন শুরু। পৃথিবীর অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যেও টোটেম প্রথার উদ্ভব দেখা গেছে। টোটেম প্রথা অর্থাৎ টোটেম পুজোর মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল আদিম মানবগোষ্ঠীর উপাসনা ধর্মের জয়যাত্রা।

'টোটেম' মানে সাধারণভাবে বিশেষ প্রজাতির প্রাণী। বিশেষ প্রজাতির উদ্ভিদ এবং জড়বস্তুকেও টোটেম হিসেবে পুজো করা হত, তবে জড় টোটেমের উদাহরণ অবশ্য খুবই বিরল।

উত্তর আমেরিকার আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ান থেকে ভারতীয় আদিবাসীদের মধ্যে টোটেম পুজোর প্রচলন ছিল, এখনও আছে। সাপ, বাঘ, ষাঁড়, ভেড়া, হনুমান, শুয়োর, কুমির, মাছ, কাছিম, পেঁচা, বাজপাখি ইত্যাদি কত না পশু-পাখি পুজিত হয় এখনও।

এখনও বট, অশ্বত্থ, তুলসী, আকন্দ, কলা, হলুদ, ধান ইত্যাদি গাছকে পুজো করা হয়। পুজো করা হয় পাথর, শাল গাছের খুঁটি। শুধু আদিবাসী সমাজ নয়, হিন্দু উপাসনা- ধর্মে মীন, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি পশুকে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাপের পুজো এখনও আমাদের দেশে খুবই জনপ্রিয়। আদিম অস্ট্রিকভাষী উপজাতিদের থেকে এই পশু পুজোর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বৈদিক উপাসনা-ধর্মে ও বেদ-পরবর্তী উপাসনা-ধর্মে, এ বিষয়ে নৃতত্ত্ববিদরা নিশ্চিত।

১৮৯৬-তে প্রকাশিত হল আরও একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'Introduction To The History of Religion'। বাংলায় বলতে গেলে বলতে পারি, 'উপাসনা-ধর্মের ইতিহাসের ভূমিকা'। লেখক এফ বি জেভন্স। প্রায় রবার্টসন স্মিথ-এর প্রতিধ্বনি পেলাম তাঁর লেখায়।

স্মিথ ও জেভন্স আর একটা বিষয়ে একমত ছিলেন—টোটেমের প্রাণী, উদ্ভিদ বা জড়বস্তু হল পূর্বপুরুষদের প্রতীকীভূত কুলদেবতা।

'টোটেম' শব্দের সঙ্গে আরও একটি শব্দ জড়িয়ে আছে—'টাবু' (Taboo) 'টাবু' মানে নৈতিক বাধা-নিষেধ। শুচিতা-অশুচিতা, পবিত্র-অপবিত্র ইত্যাদি বিষয়ে টোটেম উপাসনা-ধর্মের বিধি-নিষেধকে বলা হয় 'টাবু'। 'টাবু' শব্দটি এখন অবশ্য ধর্মীয় লক্ষ্মণ-রেখা অতিক্রম করে ব্যাপ্তি পেয়েছে। আধুনিক সমাজ দেহশূচিতাকে 'টাবু' বা সামাজিক বাধা-নিষেধ বলে মনে করে।

● **দুর্খাইম (Durkhiem)-এর 'টোটেম তত্ত্ব' ঃ** দুর্খাইম বিশিষ্ট ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ। তাঁর মতে যে কোনও উপাসনা-ধর্ম বিশ্বাসের মূলে রয়েছে এক রহস্যময় শক্তির কাছে আবেগের আত্মসমর্পণ। এই রহস্যময় শক্তিকে মানবজীবনের নিয়ন্ত্রণকারী মনে করে বলেই মানুষ আবেগ ও ভক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। টোটেম হল সামাজিক কর্তৃত্বের প্রতীক। টোটেমকে মানলে টাবুকেও মানতে হয়। এসে পড়ে সমাজকে বেঁধে ফেলার নৈতিক রীতি-নীতি।

দুর্খাইম অবশ্য তাঁর মতামতে আরও কিছু প্রকাশ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, উপাসনা-ধর্ম ও জাদু বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য টানা মুশকিল। উপাসনা ধর্ম ও জাদু বিশ্বাসের আকারগত পার্থক্য থাকলেও দুইয়ের-ই উৎস এক। টোটেমের রহস্যময় শক্তিকে নিজের মধ্যে পেতেই আদিম জাতিগোষ্ঠী টোটেম হত্যা করে খেতো বিশেষ অনুষ্ঠানে।

টোটেম প্রথা সারা পৃথিবী জুড়ে উপাসনা-ধর্মের গোড়ার কথা—এমন মতামত বর্তমানের নৃতত্ত্ববিদরা মানতে নারাজ। টোটেম প্রথা প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে ধর্মের বিবর্তনের একটা পর্যায়ে দেখা গিয়েছিল—এটা ঠিক।

টোটেম পুজোর পর টোটেমকে হত্যা করে খাওয়া হত—এটাও ঠিক। কিন্তু সব আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে টোটেম পুজোর প্রচলন ছিল না।

যাযাবর জীবন ও টোটেম প্রথা

অনেক আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে টোটেম প্রথা এসেছে যাযাবর জীবন পশুনির্ভর হয়ে পড়ায়। আদিম জনগোষ্ঠী ছিল যাযাবর। জলের অভাব হলে আজও যেমন পশুরা তাদের ডেরা তুলে জলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। তেমনই আদিম মানবগোষ্ঠীও জলের অভাব দেখা দিলে দলবদ্ধভাবে পাড়ি দিত জলাশয়ের সন্ধানে। প্রধান খাদ্য ছিল পশু মাংস। সঙ্গে ছিল মৎস্য শিকার ও বনের ফল-মূল আহরণ। পশু-মাংস নির্ভরতা থেকেই এলো পশু পালন। বনের কিছু পশুকে ধরে পালন। এইসব পশুরা ছিল তৃণভোজী। বুনো কুকুরদেরও পোষ-মানিয়েছিল শিকারে সাহায্য পেতে। গৃহপালিত তৃণভোজীদের জন্য ঘাস-পাতার প্রয়োজন হত। সবুজের অভাব দেখা দিলে সবুজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হত। মাংস সরবরাহ বজায় রাখতে গৃহপালিত পশুদের বংশবৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। তার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল পালিত পশুদের পরিচর্যার।

মানুষ যখন চাষ করতে শিখল, তখন যাযাবর জীবনে এলো স্থায়িত্ব। চাষের কাজে ষাঁড়, বলদ, চামরি, মোষ ইত্যাদির ব্যবহার এলো এক সময়। দুধ অন্যতম খাদ্য হয়ে উঠলো। 'গো-ধন' সম্পদের মাপকাঠি হয়ে উঠলো। মাংস ও দুধের জন্য ভেড়া, ছাগল, চামরি গাই, মোষ এ'সব গৃহপালিতদেরও কদর ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীদের মধ্যে। চামরি এ ভেড়ার লোম থেকে পোশাক তৈরি করতে শিখলো। পোশাকে এলো পশু-চামড়ার ব্যবহার। এ'ভাবেই বেড়েছে পশু নির্ভরতা ও পশু পালনের প্রয়োজনীয়তা। মানবগোষ্ঠী পশুসম্পদ রক্ষা ও বৃদ্ধিতে যেমন একদিকে নজর দিয়েছে, পাশাপাশি অন্য গোষ্ঠীর পশু সম্পদ লুঠ করতে বুদ্ধি ও শক্তি প্রয়োগ করেছে। পশুরা এক দিকে পেতে লাগলো সেবা, পরিচর্যা ও পুজো। আর এক দিকে খাদ্যবস্তু হিসেবে নিহত হতে লাগলো। শুরুতে টোটেম পশু-পাখি ছিল অন্তর্গত গোষ্ঠীর খাদ্য। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে টোটেম গোষ্ঠী নানা উপগোষ্ঠীতে ভাগ হল। অনেক উপগোষ্ঠী টোটেম খাওয়া নিষিদ্ধ করলো।

উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি, নতুন নতুন খাদ্যের যোগান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টোটেম বিশ্বাস তার তাৎপর্য হারালো। অনেক জায়গায় ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ালো নিছকই প্রথা।

হিন্দু উপাসনা-ধর্মে টোটেমের প্রভাব

টোটেমগোষ্ঠীর মানুষরা কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলে। এই বিধি-নিষেধকে বলে 'টাবু'। বিয়ের ব্যাপারে প্রত্যেকেই প্রায় 'টাবু' বা নিময়-কানুন মেনে চলে। এক টোটেম

গোষ্ঠীর পুরুষ বা নারী সেই টোটেম গোষ্ঠীর নারী বা পুরুষকে বিয়ে করে না।

হিন্দুদের গোত্র ব্যবস্থা টোটেম প্রথা থেকেই এসেছে। গোত্রের নাম দেখলেই হিন্দু ধর্মীয় চেতনায় টোটেমের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। শাণ্ডিল্য মনে ষাঁড়, গৌতম অর্থে গরু, ভরদ্বাজ মানে ভরত পাখি, মৌদ্‌গল্য হলো মাগুর মাছ, কাশ্যপ মানে কচ্ছপ। কোনও গোত্রের মানুষ তার টোটেম খাবে না, তার গোত্রের কাউকে বিয়ে করবে না, এটাই ছিল 'টাবু'।

হিন্দু উপাসনা-ধর্মে আমরা অবতার হিসেবে মীন, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি প্রাণীর উল্লেখ পাই। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন শুনক গোত্রধারী, যার টোটেম হল কুকুর।

হিন্দুদের কিছু ধর্মশাস্ত্রের নামও পশুদের নামে। যেমন : শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ। শ্বেতাশ্বতর অর্থাৎ সাদা অশ্বতর। ঘোড়া ও গাধার মিলনজাত সাদা রঙের পশু। তৈত্তিরীয় উপনিষদ। তৈত্তিরীয় শব্দটি এসেছে তিত্তির পাখি থেকে। এমন উদাহরণ প্রচুর রয়েছে।

আদিবাসীদের মধ্যে হাঁসদার টোটেম হল হাঁস, হেমব্রেম-সুপারি, সরেন-আমলকি গাছ, মারাণ্ডি-ঘাস, মাণ্ডি-পিয়াল গাছ। লোধাদের গোত্র শুশুক।

ডবলিউ বরার্টসন স্মিথ তাঁর 'রিলিজিয়ন অফ দি সেমিটিজ' (Religion Of The Semites by W.Robertion Smith) গ্রন্থে লিখেছেন, বলিদান প্রথার মূলে রয়েছে টোটেম প্রথা। বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসবে টোটেম প্রাণীকে হত্যা করে তাকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

আদিম সংস্কৃতির কিছু কিছু অবশেষ এখনও টিকে রয়েছে সংস্কৃতিগতভাবে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলগুলোতে। সেখানে এখনও নিষ্ঠুর বলিপ্রথা টিকে রয়েছে। টিকে রয়েছে 'প্রগতিশীল' পশ্চিমবঙ্গেও। বিহার ও ঝাড়খন্ডে বলির বিরুদ্ধে আইনের প্রয়োগ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে—যে দুটি প্রদেশকে 'পিছিয়ে পড়া' বলে আমরা বাঙালিরা নাক সিঁটকোই।

প্রাক-সর্বপ্রাণ তত্ত্ব ও জাদু (Pre-animism and Magic) :

কিছু নৃতত্ত্ববিদ জানালেন, 'সবেরই প্রাণ আছে, এই ধারণারও আগে উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল। আদিম মানবগোষ্ঠী এই সময় মনে করতো—যা দেখছে, সবের মধ্যেই রয়েছে একটা রহস্যময় শক্তির খেলা। এই শক্তি নিয়ে কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। আর এই অস্পষ্ট রহস্যময় ধারণা থেকেই গড়ে উঠেছিল রহস্যময়ের প্রতি ভয় ও ভক্তি। প্রকৃতির অনেক বিষয়, অনেক ঘটনা দেখে কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজে না পেয়ে রহস্যময় মনে হয়েছে। জোয়ার-ভাটা, সূর্যের উদয়-অস্ত, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি, গ্রহণ, ঝড়, বজ্রপাত, বন্যা, ভূমিকম্প—এমন অনেক কিছুকেই রহস্যময় শক্তির লীলা মনে হয়েছে।

বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ বিশপ কর্ডিনটন (Bishop Cordinton) এই সর্বব্যাপী রহস্যময় শক্তির নাম দিলেন 'মানা' (Mana)। বিশপ তাঁর 'দ্য মিলানেসিয়ানস' (The Melanesians) গ্রন্থে 'মানা' শব্দটি ব্যবহার করলেন। নৃতত্ত্ববিদের কোনও গ্রন্থে মানা'র সর্বব্যাপী শক্তিতে বিশ্বাস করতো। এবং এই শক্তিকে বলতো 'মানা'। বিশপ এও মনে করতেন, আদিম মানবগোষ্ঠী এই 'মানা' ধরনের কোনও অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস করতো, ভক্তি ও ভয় করতো। এর থেকেই উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি। 'সব কিছুরই প্রাণ আছে'—এমন ধারণার আগে-ই এসেছিল এই অতীন্দ্রিয় শক্তির ধারণা।

বিশপ-এর 'দ্য মিলানেসিয়ানস' গ্রন্থ প্রকাশের পরেই আর একটি গ্রন্থ নৃতত্ত্ববিদদের নজর কাড়লো। বইটির নাম 'Threshold of Religions', বাংলা করে বলতে পারি 'ধর্মের সূত্রপাত'। লেখক, ম্যারেট (Marret)। তিনি বললেন, রহস্যময় সর্বব্যাপী অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস থেকেই জাদু বিশ্বাসের জন্ম, উপাসনা-ধর্মের জন্ম। ম্যারেটও বিশপ-এর 'মানা' তত্ত্বকে স্বীকৃতি দিলেন।

এফ বি জেভন্স রবার্টসনের টোটেম প্রথার পক্ষে মত প্রকাশ করলেও 'উপাসনা-ধর্মের ইতিহাসের ভূমিকা' গ্রন্থে বললেন, মানা'র মতো অপ্রাকৃতিক রহস্যময় শক্তির প্রতি বিশ্বাস, আসলে জাদু বিশ্বাস। এই জাদু বিশ্বাসই হলো উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তির প্রথম ধাপ।'মানা'র ধারণা বা জাদু বিশ্বাস সর্ব-প্রাণ ধারণারও আগে আদিম মানুষের চিন্তায় এসেছিল।

জেমস ফ্রেজার (James Frazer) ও তাঁর 'Golden Bough' বা 'সোনার শাখা' গ্রন্থে জানালেন, আদিম মানুষের চিন্তার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে দেখতে পাবো জাদু বিশ্বাস থেকেই উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি। আদিম মানুষ প্রকৃতির কিছু কার্য-কারণ সম্পর্ক ধরতে পারে নি। কল্পনা করেছিল রহস্যময় অতিপ্রাকৃত শক্তি রয়েছে প্রকৃতির মধ্যেই। সেই শক্তিকে নিয়মে বাঁধা যায় না। কার্য-কারণ সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা বৃথা। এই রহস্যময় অতিপ্রাকৃত শক্তিকেই আদিম মানুষ 'জাদুশক্তি' বা 'magic' বলে ধরে নিল। অতিপ্রাকৃত শক্তিকে তুষ্ট করতে নানা রহস্যময় উপাসনা, আচার-পদ্ধতি গড়ে তুললো বিভিন্ন আদিম গোষ্ঠী। গড়ে উঠলো নানা সাংকেতিক জাদু আচার পদ্ধতি।

ফ্রেজার আরও বললেন, মানব বিবর্তনের নিয়ম অনুসারে আদিম গোষ্ঠীর কিছু মানুষ অপেক্ষাকৃতভাবে অন্যদের তুলনায় চিন্তায় বুদ্ধিতে এগিয়েছে! জাদুশক্তির নানা নিয়ম-কানুন ও রহস্যময় চিহ্ন ব্যবহার ইত্যাদির সাহায্যে অতীন্দ্রিয় শক্তিকে কাজে লাগানো যায়—এমন বিশ্বাসকে ভুল বলে মনে করলো চিন্তায় এগিয়ে থাকা মানুষ। অতীন্দ্রিয় শক্তিমান এক সত্তা যাকে আমরা 'ঈশ্বর' বলতে পারি, সেই ঈশ্বর উপাসনায় মন দেওয়াটাই তারা ঠিক পথ বলে মনে করলো। এ'ভাবে গড়ে উঠলো উপাসনা-ধর্ম। অর্থাৎ জাদু বিশ্বাসের বিরোধীতার মধ্য দিয়েই উপাসনা ধর্মের উৎপত্তি।

'উপাসনা ধর্ম' ও 'জাদু বিশ্বাস' তেল ও জলের মতো। কখনই মিলতে পারে না।

ফ্রেজারের এই মতের পুরোপুরি বিরোধিতা করলেন হার্টল্যান্ড (Hartland)। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Ritual and Belief' (বাংলায় বলতে পারি, 'আচার ও বিশ্বাস')-এ জানালেন, ফ্রেজার আদিম গোষ্ঠীর কিছু মানুষকে যতটা চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান বলে ধরে নিয়েছেন —বাস্তবে তা অসম্ভব। জাদু ও অতীন্দ্রিয় শক্তির মধ্যে পার্থক্য করার মত মানসিকতা আদিম বর্বর মানুষদের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। আদিম মানুষের বুদ্ধির ক্রমবিকাশ হয়েছে অত্যন্ত ধীরগতিতে। এই আদিম অবস্থায় জাদু-বিশ্বাস ও উপাসনা-ধর্মবিশ্বাসকে সরাসরি তেল-জলের মত মনে করলে, মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তার ক্রমবিকাশের তত্ত্বকেই অস্বীকার করতে হয়। আর এই অস্বীকারের অর্থ বিজ্ঞানকেই অস্বীকার।

আমরা কী পেলাম

উপাসনা-ধর্মের উদ্ভব নিয়ে আমরা বেশ কিছু বিশিষ্ট গবেষক পণ্ডিতদের মতামতের সঙ্গে ইতিমধ্যে পরিচিত হয়েছি। হয়তো এই অংশটা অনেকের কাছে কিছুটা অ্যাকাডেমিক বা ক্লাস-পাঠ্য বইয়ের মত তত্ত্ব ও তথ্যের কচকচানি-কণ্টকিত মনে হয়েছে। বইটিকে প্রামাণ্য করার এবং তত্ত্ব ও তথ্যগুলোর সঙ্গে পাঠক-পাঠিকাদের পরিচয় ঘটাবার একটা আন্তরিক তাগিদ অনুভব করেছি বলে-ই এই অংশের অবতারণা।

আমাদের মনে রাখতে হবে—পৃথিবী জুড়ে অসম বিকাশ একটা সমস্যা কিন্তু বাস্তব সত্য। ভারতের মত একটা দেশ যা পৃথিবীর অংশ মাত্র, সে'খানেও অসম বিকাশের সমস্যা আজও প্রকটভাবে রয়েছে। আমরা একই সঙ্গে নিউক্লিয়ার বোম তৈরির প্রযুক্তিকে কাজে লাগাচ্ছি, আবার জমিকে উর্বর করতে ভারতের কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ হিসেবে আমরা আজও নানা অশ্লীল আচার-অনুষ্ঠান করছি। বৃষ্টি নামতে প্রকাশ্যে নগ্ন হয়ে বৃষ্টি দেবতাকে লোভ দেখিয়ে মাটিতে নামাতে চাইছি।

'ভারতের সংস্কৃতি' বলে শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে যে প্রচার চালানো হয়, সেই সংস্কৃতি উচ্চবর্ণের ভারতীয়দের সংস্কৃতি, সর্বস্তরের ভারতীয়দের সংস্কৃতি নয়! শতকরা ৮০ ভাগ ভারতীয়-ই তপসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতিগোষ্ঠীর অথবা হতদরিদ্র মানুষ। এই সংস্কৃতি সেই শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের সংস্কৃতি নয়।

কয়েক হাজার বছরে অনেক কিছুই পাল্টেছে। পাল্টায়নি শুধু ভারতীয় ট্রাইব বা উপজাতি গোষ্ঠীর সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বহিরঙ্গের কিছুটা পরিবর্তন হলেও এখনও তারা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সুযোগ না পেয়ে রোগ সারাতে জাদুচিকিৎসা ও জাদুবিশ্বাসের সাহায্য নেয়। এখনও পানীয় জল বলতে ডোবার দুর্গন্ধময় পচা জল। এখনও প্রাথমিক শিক্ষা নেবার ভাবনা করার মত কোনও অবস্থা-ই নেই। এখনও এ'দের পরিবারের মহিলারা বারবার গণধর্ষণের শিকার হয় উচ্চবর্ণের 'বীরপুরুষ'দের হাতে। এখনও এক বেলা খাবার জুটলে বর্তে যায় ওরা। এখনও শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সামান্য গলা উঁচু করলে, সে'সব গলা কেটে গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে একটুও দেরি করে না উচ্চবর্ণেরা। এই বর্বরতা উচ্চবর্ণের সংস্কৃতি।

এমন অসম বিকাশ যে দেশে, যে পৃথিবীতে, সেখানে একই সঙ্গে সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটেনি। কয়েক হাজার বছর আগের হরপ্পার নগর সভ্যতা যেমন আমাদের সংস্কৃতি, তেমন-ই আন্দামানের আদিবাসীদের আদিম জীবনযাত্রাও আমাদের সংস্কৃতি।

গোটা পৃথিবীর মানব-প্রজাতির বিবর্তন বা অগ্রগমন একই সঙ্গে পরিচালিত হয়নি। মিশরে, ব্যাবিলনে, গ্রিসে হাজার হাজার বছর আগে যে সভ্যতার নিদর্শন আমরা পেয়েছি, হাজার হাজার বছর পরে, বর্তমানেও সেই সভ্যতার ধারে-কাছে পৌঁছবার অবস্থা নেই পৃথিবীর বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর।

বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ও উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে উপাসনা-ধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে বিভিন্নভাবে।

উপাসনা-ধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের একটা চিত্র আঁকতে কেউ কেউ পাথুরে যুগের একটা ক্যালেন্ডার তৈরি করেছেন। যেমন—

১. আদি প্রত্নপ্রস্তর যুগের ১ম পর্ব—১ লক্ষ বছর ও তার বেশি প্রাচীন।

২. আদি প্রত্নপ্রস্তর যুগের ২য় পর্ব—কম-বেশি ৪০ হাজার বছর থেকে ১ লক্ষ বছর প্রাচীন।

৩. মধ্য-প্রত্নপ্রস্তর যুগ—কম-বেশি ২০ হাজার থেকে ৪০ হাজার বছর আগে।

৪. প্রত্ন-প্রস্তর যুগের শেষ পর্যায়—কম-বেশি ১২ হাজার থেকে ২০ হাজার বছর প্রাচীন।

৫. মধ্য-প্রস্তর যুগ—কম-বেশি ৬ হাজার বছর থেকে ১২ হাজার বছর প্রাচীন।

৬. নব্য-প্রস্তর যুগ—কম-বেশি ৪,৫০০— থেকে ৬,০০০ বছর প্রাচীন।

এই পর্ব ধরে উপাসনা-ধর্মের বিকাশ বা সংস্কৃতির বিকাশ নিয়ে কোনও আলোচনা করলে তা হবে ভুল। সমস্ত দেশে তো দূরের কথা একই দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিকাশ একই সঙ্গে ঘটেনি, ঘটা সম্ভব নয়।

এক একটি সামাজিক বলয়ে অর্থাৎ এক একটি জাতি বা উপজাতি গোষ্ঠীর সামাজিক পরিবেশে এক এক ধরনের উপাসনা-ধর্ম-চিন্তা পালিত হয়েছে, হচ্ছে।

‘ধর্ম-দর্শন’ ও ‘হাঁসজারু’

প্রাচীন উপাসনা-ধর্মমতগুলোকে ধর্মগুরুরা ‘ধর্ম-দর্শন’ (Philosophy of Religion) বলে প্রচার চালাচ্ছেন।

‘দর্শন’ বলতে যা বুঝি (প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ে দর্শন-এর সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেছি) তাতে কোনও প্রাচীন উপাসনা-ধর্মকেই আমরা দর্শন বলতে পারি না। প্রাচীন বৈদিক যুগের উপাসনা-ধর্মকেও আমরা একই কারণে ‘দর্শন’ বলতে পারি না।

কিছু ধূর্ত অথবা মূর্খ ‘দর্শন’-এর সংজ্ঞাকে ধোঁয়াশায় ঢেকে উপাসনা-ধর্মকে ‘দর্শন’ বলে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। যতদিন দেশবাসীদের মধ্যে অজ্ঞানতা থাকবে, ততদিন ‘ধর্ম-দর্শন’ নামের ‘হাঁসজারু’টিও দিব্বি বেঁচে থাকবে।

স্কুলের প্রচলিত শিক্ষা অজ্ঞানতা দূর করে ভাবলে ভুল হবে। স্কুলে পুরাণের নানা দেব-দেবীদের গল্প, মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার আঁটোসাটো পরিবেশ, ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে বাইবেলের প্রচার আর স্কুল জীবনের বাইরের পরিবেশে বিজ্ঞান বিরোধী কুসংস্কার ছোটবেলা থেকেই এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে যে উত্তরণের পথ খুঁজে পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে।

ফলে বিশাল সংখ্যক উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যেও দেখা যায় যুক্তিবিন্যাসের অভাব। এটা ভারতীয় উচ্চশিক্ষিতদের একটা বড় অসুখ। পরিবেশগত ভাবে জন্ম থেকে ভক্তি ও বিশ্বাসকে এত বেশি করে জীবনে গ্রহণ করেছে যে, মুহূর্তে বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষাটুকু ভুলে গিয়ে রাহু-কেতু-তুক-তাক্-বশীকরণ-ঝাড়ফুক-মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদির কাছে আত্মসমর্পণ করতে একটুও লজ্জিত হয় না। এটা শুধু আমাদের দেশের সমস্যা নয়, পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর সমস্যা।

কথায় কথায় ইউরোপ আমেরিকাকে আমরা যতই গাল পাড়ি শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে এগিয়ে থাকা এ'সব দেশের সাধারণ মানুষ আবেগ সর্বস্বতার কাছে যুক্তিবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে না। আমাদের গাল পাড়াটা অনেক সময়ই হীনমন্যতাবোধের পরিচয় বহন করে।

কয়েক হাজার বছরে অনেক কিছুই পাল্টেছে। পাল্টায়নি শুধু ভারতীয় ট্রাইব বা উপজাতি গোষ্ঠীর সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বহিরঙ্গের কিছুটা পরিবর্তন হলেও এখনও তারা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সুযোগ না পেয়ে রোগ সারাতে জাদুচিকিৎসা ও জাদুবিশ্বাসের সাহায্য নেয়। এখনও পানীয় জল বলতে ডোবার দুর্গন্ধময় পচা জল। এখনও প্রাথমিক শিক্ষা নেবার ভাবনা করার মত কোনও অবস্থা-ই নেই। এখনও এ'দের পরিবারের মহিলারা বারবার গণধর্ষণের শিকার হয় উচ্চবর্ণের 'বীরপুরুষ'দের হাতে। এখনও এক বেলা খাবার জুটলে বর্তে যায় ওরা। এখনও শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সামান্য গলা উঁচু করলে, সে'সব গলা কেটে গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে একটুও দেরি করে না উচ্চবর্ণেরা। এই বর্বরতা উচ্চবর্ণের সংস্কৃতি।

এমন অসম বিকাশ যে দেশে, যে পৃথিবীতে, সেখানে একই সঙ্গে সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটেনি। কয়েক হাজার বছর আগের হরপ্পার নগর সভ্যতা যেমন আমাদের সংস্কৃতি, তেমন-ই আন্দামানের আদিবাসীদের আদিম জীবনযাত্রাও আমাদের সংস্কৃতি।

গোটা পৃথিবীর মানব-প্রজাতির বিবর্তন বা অগ্রগমন একই সঙ্গে পরিচালিত হয়নি। মিশরে, ব্যাবিলনে, গ্রিসে হাজার হাজার বছর আগে যে সভ্যতার নিদর্শন আমরা পেয়েছি, হাজার হাজার বছর পরে, বর্তমানেও সেই সভ্যতার ধারে-কাছে পৌঁছবার অবস্থা নেই পৃথিবীর বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর।

বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ও উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে উপাসনা-ধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে বিভিন্নভাবে।

উপাসনা-ধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের একটা চিত্র আঁকতে কেউ কেউ পাথুরে যুগের একটা ক্যালেন্ডার তৈরি করেছেন। যেমন—

১. আদি প্রত্নপ্রস্তর যুগের ১ম পর্ব—১ লক্ষ বছর ও তার বেশি প্রাচীন।

২. আদি প্রত্নপ্রস্তর যুগের ২য় পর্ব—কম-বেশি ৪০ হাজার বছর থেকে ১ লক্ষ বছর প্রাচীন।

৩. মধ্য-প্রত্নপ্রস্তর যুগ—কম-বেশি ২০ হাজার থেকে ৪০ হাজার বছর আগে।

৪. প্রত্ন-প্রস্তর যুগের শেষ পর্যায়—কম-বেশি ১২ হাজার থেকে ২০ হাজার বছর প্রাচীন।

৫. মধ্য-প্রস্তর যুগ—কম-বেশি ৬ হাজার বছর থেকে ১২ হাজার বছর প্রাচীন।

৬. নব্য-প্রস্তর যুগ—কম-বেশি ৪,৫০০– থেকে ৬,০০০ বছর প্রাচীন।

এই পর্ব ধরে উপাসনা-ধর্মের বিকাশ বা সংস্কৃতির বিকাশ নিয়ে কোনও আলোচনা করলে তা হবে ভুল। সমস্ত দেশে তো দূরের কথা একই দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিকাশ একই সঙ্গে ঘটেনি, ঘটা সম্ভব নয়।

এক একটি সামাজিক বলয়ে অর্থাৎ এক একটি জাতি বা উপজাতি গোষ্ঠীর সামাজিক পরিবেশে এক এক ধরনের উপাসনা-ধর্ম-চিন্তা পালিত হয়েছে, হচ্ছে।

‘ধর্ম-দর্শন’ ও ‘হাঁসজারু’

প্রাচীন উপাসনা-ধর্মমতগুলোকে ধর্মগুরুরা ‘ধর্ম-দর্শন’ (Philosophy of Religion) বলে প্রচার চালাচ্ছেন।

‘দর্শন’ বলতে যা বুঝি (প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ে দর্শন-এর সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেছি) তাতে কোনও প্রাচীন উপাসনা-ধর্মকেই আমরা দর্শন বলতে পারি না। প্রাচীন বৈদিক যুগের উপাসনা-ধর্মকেও আমরা একই কারণে ‘দর্শন’ বলতে পারি না।

কিছু ধূর্ত অথবা মূর্খ ‘দর্শন’-এর সংজ্ঞাকে ধোঁয়াশায় ঢেকে উপাসনা-ধর্মকে ‘দর্শন’ বলে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। যতদিন দেশবাসীদের মধ্যে অজ্ঞানতা থাকবে, ততদিন ‘ধর্ম-দর্শন’ নামের ‘হাঁসজারু’টিও দিব্বি বেঁচে থাকবে।

স্কুলের প্রচলিত শিক্ষা অজ্ঞানতা দূর করে ভাবলে ভুল হবে। স্কুলে পুরাণের নানা দেব-দেবীদের গল্প, মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার আঁটোসাটো পরিবেশ, ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে বাইবেলের প্রচার আর স্কুল জীবনের বাইরের পরিবেশে বিজ্ঞান বিরোধী কুসংস্কার ছোটবেলা থেকেই এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে যে উত্তরণের পথ খুঁজে পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে।

ফলে বিশাল সংখ্যক উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যেও দেখা যায় যুক্তিবিন্যাসের অভাব। এটা ভারতীয় উচ্চশিক্ষিতদের একটা বড় অসুখ। পরিবেশগত ভাবে জন্ম থেকে ভক্তি ও বিশ্বাসকে এত বেশি করে জীবনে গ্রহণ করেছে যে, মুহূর্তে বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষাটুকু ভুলে গিয়ে রাহু-কেতু-তুক-তাক্-বশীকরণ-ঝাড়ফুক-মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদির কাছে আত্মসমর্পণ করতে একটুও লজ্জিত হয় না। এটা শুধু আমাদের দেশের সমস্যা নয়, পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর সমস্যা।

কথায় কথায় ইউরোপ আমেরিকাকে আমরা যতই গাল পাড়ি শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে এগিয়ে থাকা এ'সব দেশের সাধারণ মানুষ আবেগ সর্বস্বতার কাছে যুক্তিবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে না। আমাদের গাল পাড়াটা অনেক সময়ই হীনমন্যতাবোধের পরিচয় বহন করে।

অধ্যায় ঃ পাঁচ

ভারতবর্ষের জাদু সংস্কৃতি

হে অন্ধ, রাত্রি নেমেছে

"বশীকরণ কবজে কাজ হয়?" ফোনে আমাকে এই প্রশ্নটা করেছিলেন আমারই এক প্রিয় কবি। আমি হতভম্ব? নন্দন-চত্তর দাপিয়ে বেড়ানো প্রখর বুদ্ধিজীবী হিসেবে চিহ্নিত মানুষটির এ কী ধরনের উদ্ভট চিন্তা?

প্রশ্নটা যে নেহাত হালকা চালে নয়, গভীর সমস্যার খাদ থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টার অঙ্গ—দু' চার কথায় সেটা বুঝে দুঃখ পেলাম। বোঝাবার চেষ্টা করলাম, "ও'সবে কিচ্ছু কাজ হয় না।"

—"তবে যে তান্ত্রিকরা রোজ পত্রিকায় গ্যারান্টি দিয়ে বশীকরণের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে?"

—"ব্যাপারটা হল, তোমাকে উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে বশ করে মোটা টাকা হাতিয়ে নেবার গ্যারান্টি। আসল সত্যিটা কী জান? যে যতবড় তান্ত্রিক, সে তত বড় প্রতারক।"

'নন্দন' চত্বরে ওই কবির সঙ্গে একদিন দেখা। উদাস দৃষ্টি। "কেমন আছ? তারপর তো আর ফোন পাইনি।" কথাগুলো বলতে বলতে স্বাভাবিক ভালোবাসার অভিব্যক্তি হিসেবে কবির দু'কাঁধে হাত রেখেছিলাম। হাত দুটো ওর বাহু ছুঁয়ে কনুইতে নামতে নামতে টের পেলাম, কবির ডান হাতে একটা ঢাউস তাবিজ। ওঁর পাঞ্জাবির হাতা আমার কাছে তাবিজকে লুকোতে পারেনি বুঝে, সামান্য লজ্জিতভাবে কবি স্বীকার করলেন, এক বশীকরণে সিদ্ধহস্ত মা'য়ের কাছ থেকে তাবিজটা নিয়েছেন। খরচ পড়েছে পঁয়তিরিশ হাজার।

কবির অব্যর্থ বশীকরণ তাবিজ ব্যর্থ হয়েছে। মেয়েটি এখন বিয়ে করে লন্ডনে।

এক দিনের ঘটনা। জবরদস্ত এক রাজনৈতিক নেতা একটা অনুষ্ঠানে আমাকে হাতের কাছে পেয়ে পাকড়াও করলেন। নেতাকে ঘিরে একগাদা চামচা, যেমনটা হয় আর কী। নেতা বললেন, "আপনার 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' পড়েছি। ভালই। কিন্তু আপনি যে'ভাবে অলৌকিক কিছুই নেই বলছেন, তা মানি কী করে? আমার সন্তান হচ্ছিল না। তখন ... তান্ত্রিক যজ্ঞ করে আমার ওয়াইফের গর্ভসঞ্চার করলেন। আপনি এর কী ব্যাখ্যা দেবেন?" হেঁ-হেঁ করে হাসলেন নেতা।

চামচারাও হেঁ হেঁ করে হাসতে হাসতে সমস্বরে চেঁচাতে লাগলেন, "এর কী ব্যাখ্যা দেবেন?"

আমার ঘাড়ে একটাই মাথা, তাই ব্যাখ্যা দিইনি।

আমার ভায়রার গলায় ক্যানসার ধরা পড়লো। ডাঃ আবিরলাল মুখোপাধ্যায় গলায় একটা বাইপাস অপারেশন করবেন, ঠিক হল। আবার চোখ বুজে দশ-পনেরো বছর ক্যানসারে না মরার নিশ্চিত গ্যারান্টি।

অপারেশনের আগের দিন ভায়রার দুই আত্মীয় শ্যালিকাকে নিয়ে আমার ফ্ল্যাটে এসে হাজির। তারপর আমার নির্বুদ্ধিতাকে নিয়ে এক হাত নিলেন। ওদের কাছে জানলাম, ক্যানসারে ছুরি ছোঁয়ালেই নাকি দ্রুত কষ্টকর মৃত্যু। শ্যালিকার বডি-ল্যাঙ্গুয়েজ বলে দিচ্ছিল, আমি যেন তাঁর বরকে আর একটু হলেই মেরে ফেলতে যাচ্ছিলাম। শিক্ষিত মূর্খ আর সবজানতা ভণ্ডদের সঙ্গে তর্ক করতে নেই। এতে সময় ও শরীর দুই-ই নষ্ট হয়। অতএব চুপ রইলাম।

ভায়রাকে ওঁরা নিয়ে গেলেন এক অলৌকিক মাতাজীর কাছে। তিরিশ হাজারের বিনিময়ে দিন তিরিশেক বেঁচে ছিলেন। শেষ পনেরো দিন কথা বন্ধ। শেষ দশ দিন খাওয়া বন্ধ। মৃত্যুর দু'দিন আগে থেকে চামচে দিয়ে গলায় ঢালা জলও গিলতে পারতেন না।

মন্ত্রশক্তি বা জাদুশক্তিতে আস্থা রাখা শিক্ষিতের অভাব নেই আমাদের দেশে। কলকাতার বেশ কয়েকটা টিভি চ্যানেল ইতিমধ্যেই 'তন্ত্র-চ্যানেল' হয়ে গেছে। টিভি খুললেই তান্ত্রিক-জোতিষীদের রমরমা। 'সরাসরি ফোনে' অনুষ্ঠান চলেছে ঝমঝমিয়ে। অনুষ্ঠান পরিচালকদের পক্ষ থেকে তান্ত্রিক-জ্যোতিষীদের নাকি অভয় দেওয়া হচ্ছে—বেয়াড়া প্রশ্ন এলে ফোন লাইন কেটে দেবার দায়িত্ব তাঁদের।

হাস্যময় বুদ্ধের পুতুল রাখলে পরিবারে সৌভাগ্য গড়াগড়ি দেবে—এমন হাস্যকর প্রচারে বিশ্বাস করে ফেংশুইয়ের দোকানে লাইন দেবার মত শিক্ষিতের অভাব আমাদের দেশে নেই।

মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস বা জাদু বিশ্বাসের ভারতীয় ঐতিহ্য অতি প্রাচীন।
বেদের যুগ থেকে এই ঐতিহ্য আমরা সমানে বহন করে চলেছি।
দেশ জুড়ে ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘোরাবার কর্মযজ্ঞ চলছে।
আমজনতাকে অন্ধ বানাবার প্রক্রিয়া চলেছে। অন্ধের
কিবা দিন, কিবা রাত। তবু মনে হয়,
কলজে ফাটিয়ে চিৎকার করি,
"হে অন্ধ, রাত্রি নেমেছে!"

ভারত জুড়ে জাদু বিশ্বাসের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন

ভারতে প্রায় পাঁচশো গুহা খুঁজে পাওয়া গেছে, যেগুলোতে রয়েছে হাজার হাজার গুহাচিত্র। এ'সব চিত্র প্রাগৈতিহাসিক যুগে আঁকা হয়েছিল। স্পেকটোগ্রাফি ইনফ্রারেড ফটোগ্রাফি, কার্বন ১৪ ইত্যাদি প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে এ'সব গুহাচিত্র রচনার কাল নির্ণয় করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের 'ভীমভেট্কা', 'মানোয়া ভান কি টেক্রি', 'চিতাডুংরি', 'পাঁচমারি', 'কব্রা', 'খারবাঈ', 'ভোঁরাবালি' প্রভৃতি পাহাড়ের গুহাগুলোয় পাওয়া গেছে অস্ত্র, কুডুল, ছুরি, ছোরা, খুন্তি ইত্যাদি গৃহস্থালির জিনিস, হাড়ের, শিংয়ের, দাঁতের, নানা গয়না আর দেওয়ালচিত্র। এগুলো আনুমানিক ১ হাজার থেকে ১০ হাজার বছরের পুরনো।

ভীমভেট্কায় চিত্রধারার উদ্ভবকাল কম-বেশি ১০ হাজার বছর। উত্তর কাশ্মীরের 'বুর্জহোম' পর্বতের গুহায় পাওয়া গেছে ৪ হাজার বছর আগের আঁকা দেওয়ালচিত্র। কর্ণাটকের বিভিন্ন পাহাড়ের গুহায় পাওয়া গেছে দুই থেকে আড়াই হাজার বছর আগের দেওয়ালচিত্র। ওড়িশার যোগীমঠ পাহাড়ের গায়ে পাওয়া গেছে দেওয়ালচিত্র। এ'সব গুহাচিত্রে আদিম শিল্পীরা এঁকেছেন নানা পশুর ছবি। যেমন—বাঘ, ভাল্লুক, গণ্ডার, হাতি, হরিণ, মোষ, বরাহ ইত্যাদি। আছে শিকারের ছবি। মধু সংগ্রহ, গাছে ওঠা, মাছ ধরা, ফাঁদ পেতে জন্তু ধরার মত নানা জীবিকার ছবি রয়েছে। রয়েছে দলবদ্ধ নাচ, নগ্ন নারী, পুরুষের-নারীর মিলন সম্পর্কের ছবি, পশু দেবতা, বনদেবতার ছবি। বিভিন্ন গুহায় পাওয়া গেছে নানা জাদু বিশ্বাসের ছবি।

উদাহরণ হিসেবে অন্তত একটি পাহাড়ের গুহাচিত্রকে আলোচনায় টানছি। মধ্যপ্রদেশের রইসেন জেলায় ভীমভেট্কা পাহাড়। বিন্ধ্য পর্বতমালার অংশ। এখানে পাওয়া গেছে আশ্চর্য সব আদিম চিত্রাবলী। ১৯৫৭ সালে পুরাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ওয়াকানকার ওই গুহাচিত্রগুলো খুঁজে পান। তখন এ'সবের নির্মাণকাল নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব হয়নি। তারপর গোটা পৃথিবীর পুরাতত্ত্ববিদদের নজর টানলো ভীমভেট্কা। প্রযুক্তি পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া গেছে গুহাচিত্রগুলো ৮০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তৈরি হয়েছিল।

ভীমভেট্‌কা ভূপাল থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটারের পথ। বাসে গেলে নামতে হবে ভিঁয়াপুর গ্রামে। সেখান থেকে পাহাড়ের পাদদেশে ১৫-২০ মিনিটের পথ। গ্রামের মানুষরা প্রায় সকলেই আদিবাসী। ওরা এখনও দুটো কাঠ ঘষে আগুন জ্বালে। ওদের বিশ্বাস, দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম হিড়িম্বাকে বিয়ে করে কিছু দিন এখানে বেটকা অর্থাৎ বাটিকা (বাড়ি) করে ছিলেন। আদিবাসীদের ভিয়াঁপুর হল ভীমপুর। অজ্ঞাতবাসের সময় পাণ্ডবরা নাকি কিছু দিন ভিঁয়াপুরের কাছে আস্তানা করেছিলেন। এখন জায়গাটার নাম পাণ্ডাপুর, অর্থাৎ পাণ্ডবপুর।

ভীমভেটকার গুহাগুলোয় যে সব চিত্র পাওয়া গেছে তাতে রয়েছে টোটেম হিসেবে

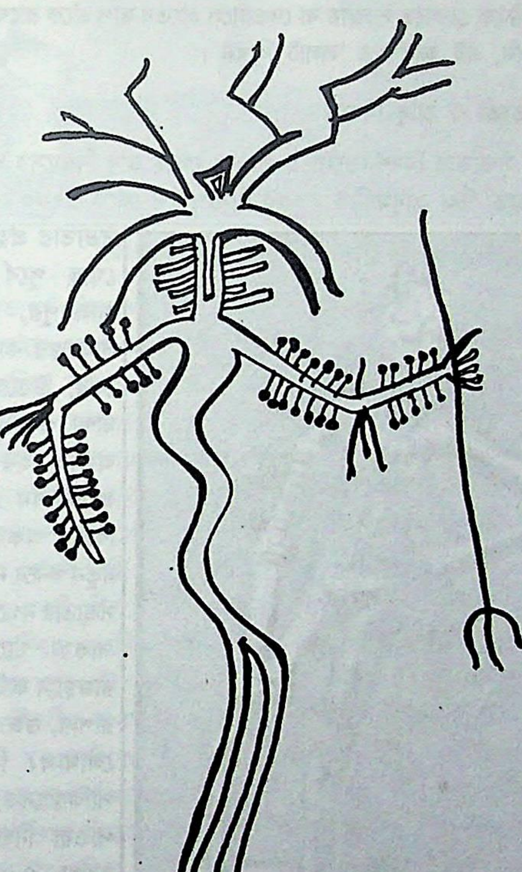

বরাহ ও বাঘের ছবি, শিকারের দৃশ্য এবং জাদুবিশ্বাসের নানা প্রতীক। পাওয়া গেছে এক আদিম জাদুকরের ছবি। মাথায় হরিণের শিং, দু'হাতে বাঁধা হাড়ের গয়না। বাঁ হাতে ত্রিশূল। নৃত্যরত জাদুকর। নৃতত্ত্ববিদদের অনেকেই যেমন ছবিটিকে জাদুকর এবং জাদুবিশ্বাসের প্রতীক বলে ধরে নিয়েছেন। আবার অনেকে এটিকে আদি নটরাজ এবং জাদুর দেবতা বলে চিহ্নিত করেছেন।

ভীমভেট্‌কায় গুহাগুলোতে অনেক হাতের ছাপের ছবি পাওয়া গেছে। হাতের ছাপকে জাদুশক্তির প্রতীক বলে মনে করাটা প্রায় বিশ্বজনীন। বিশ্ব জুড়ে প্রায় সব আদিম মানব গোষ্ঠীর মধ্যে এই বিশ্বাস ছিল। আজও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ অশুভ শক্তিকে ঠেকাতে দরজায় বা দেওয়ালে হাতের ছাপ এঁকে রাখে। এই আমাদের ভারত-দর্শন, এই আমাদের 'ললাট লিখন'।

হরপ্পা সভ্যতা ও জাদু বিশ্বাস

হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শনগুলোতে পাওয়া গেছে জাদু বিশ্বাসের বহু প্রতীক। এই হরপ্পা সভ্যতা ছিল আনুমানিক ২৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। এই

সভ্যতার প্রত্ননিদর্শন পাওয়া গেছে পূর্বে দিল্লির কাছে আলমপুর, পশ্চিমে ইরান সীমান্তের কাছে সুতকাগেন-দোর, উত্তরে জম্মুর কাছে মান্দা ও দক্ষিণে ভগতরব। অর্থাৎ হরপ্পা সভ্যতার প্রত্ননিদর্শন পাওয়া গেছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। নতুন নতুন খননে নতুন নতুন হরপ্পা সভ্যতার নগরের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন—রাজস্থানে কালিবঙ্গান, পাঞ্জাবে রূপার, গুজরাটে বন্দর শহর লোথাল। নিদর্শন মিলছে পাকিস্তানেও। এখনও পর্যন্ত পাওয়া নিদর্শনের ভিত্তিতে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োই সেরা। হরপ্পা সভ্যতার চরিত্র নগরকেন্দ্রিক। যে কোনও

নগর সভ্যতাই টিকে থাকে শস্য উৎপাদনের উপর। শহরগুলোতে শস্য আসতো আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষিজীবীদের কাছ থেকে। শহরগুলোতে সুনির্মিত শস্যভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে।

যা 'হরপ্পা সভ্যতা', তা-ই 'সিন্ধু সভ্যতা'। আমরা একই সঙ্গে 'সিন্ধু সভ্যতা'

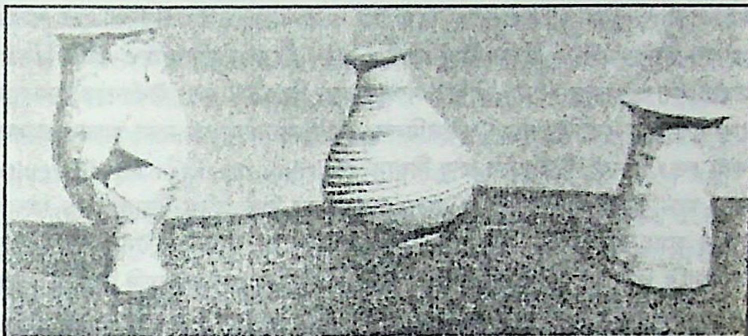

হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন এইসব মৃৎপাত্র

ও 'আর্য সভ্যতা' নিয়ে গর্ব অনুভব করি। অনেকে ভুল করে 'সিন্ধু সভ্যতা' ও 'আর্য সভ্যতা'কে এক ও অভিন্ন মনে করি। সিন্ধু অঞ্চলের লোকেরা উপমহাদেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলের সঙ্গে ফলাও ব্যবসা করতো, পারস্য উপসাগর ও মেসোপটেমিয়ার লোকদের সঙ্গে ফলাও বাণিজ্য চলতো। পারস্য উপসাগর ও মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার নানা নিদর্শন তার-ই স্পষ্ট প্রমাণ।

হরপ্পা যুগে তৈরি ব্রোঞ্জের নারী মূর্তি, নানা গয়না, পালিশ করা মাটির পাত্রের যে-সব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা দেখলে বোঝা যায় সে'যুগে শিল্পকলা কী বিশাল উন্নত ছিল। যে'সব নারী মূর্তি পাওয়া গেছে, তার বেশির ভাগই নগ্নিকা। হরপ্পা থেকে এমন একটি শীল বা শীলমোহর পাওয়া গেছে যার এক পিঠে এক নগ্ন নারী দু'পা দু'দিকে প্রসারিত। যোনি থেকে বেরিয়ে এসেছে গাছ বা শস্য। অনেক পুরাতাত্ত্বিকদের মতে এটি পুরাণে বর্ণিত শাকম্ভরীদেবী, শস্যদেবী বা বসুমতীর প্রাথমিক রূপকল্পনা। শীলটির অপর পিঠে খোদিত আছে, কাস্তেজাতীয় অস্ত্র হাতে একটি পুরুষ একটি নগ্ন নারীকে বলি দিতে যাচ্ছে। পুরাতাত্ত্বিকদের মতে ভূমিদেবী বা বসুমতীর উদ্দেশ্যে উর্বরতা কামনায় মানুষবলির ঘটনা এখানে খোদিত হয়েছে। এই নরবলি জাদুশক্তিতে বিশ্বাস থেকেই এসেছে। নারীর যোনি থেকে শস্যের উৎপত্তির চিত্রও নারীর উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখাটাও জাদুশক্তিতে বিশ্বাসের প্রতিফলন।

হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সব শীল পাওয়া গেছে তার মধ্যে

অদ্ভুত চেহারার নানা জন্তুর পাশাপাশি পরিচিত বাঘ, বরাহ, ষাঁড়, কুমির ইত্যাদির ছবিও আছে। পাওয়া গেছে পাথরের তৈরি অসংখ্য লিঙ্গ ও যোনি। লিঙ্গ ও যোনি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জাদু বিশ্বাসের প্রতীক।

'লিঙ্গ' শব্দটি অস্ট্রিক থেকে আসা। শব্দটির অর্থ পুরুষাঙ্গ এবং মাটি খোঁটার খুরপি। লাঙল শব্দটিও লিঙ্গেরই রূপ ভেদ। জমি, ভূমি, প্রকৃতিকে নারী রূপে কল্পনা অতিপ্রাচীন। পুরুষ ভূমিতে লাঙল চষে বীজ বপন করে। ভূমির উর্বরতা দেয় শস্য। আবার উর্বরা নারী পুরুষের বীজ বা বীর্য ধারণ করে সন্তানের জন্ম দেয়। একটা সময় শস্য ও মানুষ দুই-ই গোষ্ঠীর সম্পদ বলে বিবেচিত হত। উর্বরতার কামনায় সে-যুগে লিঙ্গ-যোনির পুজো, যৌনমিলন, যৌন আচরণমূলক নানা আচার পালন করা হত। এ'সবই 'উর্বরতার জাদু বিশ্বাস' (fertility magic or fertility cult) বলে মনে করেন পুরাতত্ত্ববিদরা। আজও ভারতের কিছু প্রান্তে বীজবপন ও ফসল ধরার সময় নানা যৌন আচরণের রেওয়াজ আছে। নাগা, ছোটনাগপুরের হো উপজাতি, ওড়িশার ভুঁইয়া, জয়পুরের পাঞ্জা, নীলগিরির কোটা ইত্যাদি উপজাতিদের মধ্যে ভাল ফসলের কামনায় নরনারীরা নানা যৌন আচরণ করে। উদ্দাম এই যৌন আচরণ বা যৌন মিলনকে তারা এক ধরনের 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' বা 'তুক'বলে মনে করে। অসমের বিহু উৎসব এক সময় ছিল ফসল কামনায় যৌন উৎসব।

হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য হলো শীলমোহরগুলো। ছোট, চৌকো বা

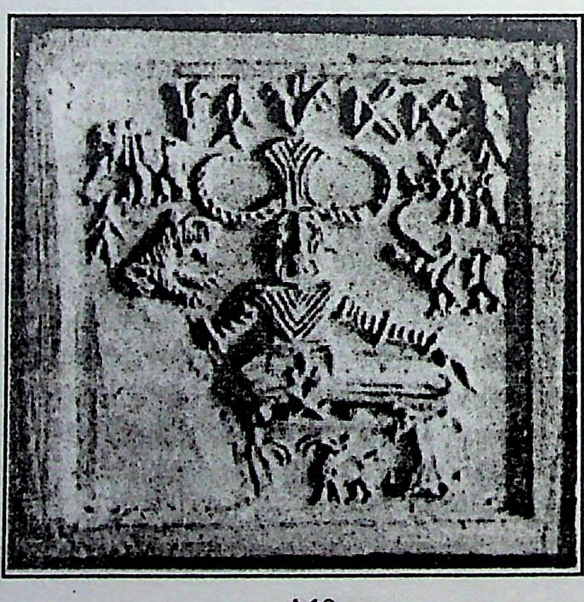

আয়তকার, চ্যাপ্টা। এইসব শীলমোহরে মানুষ ও পশুর নানা মূর্তি ও লেখা খোদাই করা আছে। হরপ্পা যুগে যে লিপির ব্যবহার ছিল, লেখাগুলো তারই প্রমাণ।

হরপ্পায় যে'সব শীল পাওয়া গেছে সে'সব দেখে কিছু নৃতত্ত্ববিদ মনে করেন যে, এইসব শীলের সঙ্গে জড়িত রয়েছে জাদু বিশ্বাস। অশুভ শক্তিকে আটকাতে, শুভ শক্তিকে জয় করতে ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করতে এই শীলগুলো তৈরি, এমনটা মনে করার মত যথেষ্ট কারণ রয়েছে। শীলগুলোর দু'পিঠে মানুষ পশু ও নানা ঘটনা খোদিত হয়েছে। সেই সঙ্গে খোদিত হয়েছে কিছু অক্ষর বা সাংকেতিক চিহ্ন। এইসব অক্ষর বা সাংকেতিক চিহ্নের অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। শীলমোহরগুলোর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, প্রায় চাকতিতেই ওপরের দিকে একটা করে ছিদ্র রয়েছে। কেন ছিদ্র? এগুলো কি তবে তাবিজ বা কবজের মত ধারণ করা হতো অশুভ শক্তিকে দূরে রাখতে ও শুভ শক্তির সাহায্য পেতে? জাদুশক্তির প্রতীক হিসেবে কি টোটেম, দেবতা বা ঘটনা খোদিত করা হত? অক্ষর বা সাংকেতিক চিহ্নগুলো কি কোনও জাদুশক্তির মন্ত্র বা সংকেত? 'শীলমোহর' বলে আমরা যে শব্দটি ব্যবহার করি, সেই শব্দটির অর্থ—এগুলো ছাপ মারার কাজে ব্যবহৃত হত। ছাপ মারার কাজে শীলমোহর ব্যবহারের পক্ষে কোনও প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। এগুলো পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হত—এমনটা ভাবার মতো কোনও প্রমাণ আজও মেলেনি।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ফাদার হেরাস, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রামাপ্রসাদ চন্দ, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পল্লব সেনগুপ্ত প্রমুখ ঐতিহাসিক, ভাষাতত্ত্ববিদ, পুরাতত্ত্ববিদ ও সমাজতত্ত্ববিদরা মনে করেন জাদু বিশ্বাসের প্রতীক হরপ্পার এইসব বহু শীল। শীলগুলোতে জড়িয়ে রয়েছে 'ফার্টালিটি কাল্ট' বা উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাস, বলি, লিঙ্গ ও যোনিপুজোর নানা স্মারক। এ'সব প্রতীক ও স্মারক থেকে আলোচ্য পণ্ডিতরা অনুমান করেছিলেন—পরবর্তীকালে

হিন্দু-উপাসনা ধর্মে শিব-শক্তির উপাসনা, যোগশাস্ত্র ও তন্ত্রের
যে প্রকাশ আমরা দেখেছি, তার আদিম
রূপ দেখা গিয়েছিল হরপ্পা
সভ্যতার কালে।

হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কার ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দে। তারপর হরপ্পা নিয়ে বিদেশে গবেষকরাও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে পল্লব সেনগুপ্তের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছিলেন যে, হরপ্পা সভ্যতার যুগে পাওয়া শীলগুলো ফার্টিলিটি কাল্ট'-এর স্মারক। এইসব বিদেশি গবেষকদের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন, মার্শাল ম্যাকে, এহরেনফেলস, স্টুয়ার্ট পিগট, হুইলার প্রমুখ।

চার হাজার বছর পরেও এ'দেশে দিব্বি টিকে আছে 'ফার্টিলিটি কাল্ট'। বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যার পরও লিঙ্গ-যোনির পুজোয় একটুও ভাঁটার টান আসেনি।

ভরা জোয়ার লেগেছে তন্ত্রে। সকালে খবরের কাগজের পাতা খুললেই তান্ত্রিক-জ্যোতিষীদের বিজ্ঞাপনের মিছিল দেখলে বোঝা যায়, বাঙালি সমাজ এগোচ্ছে পিছনের দিকে।

আদিম উপজাতি, আধুনিক উপজাতি ঃ একই কথা

আদিম উপজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে এ'যুগের উপজাতিদের উপাসনা-ধর্ম, চেতনার, জাদু বিশ্বাসের তেমন কোনও পার্থক্য নেই। পার্থক্য যতটা বহিরঙ্গের ততটা ধর্মবিশ্বাস, জাদু বিশ্বাসের নয়। আজও কৃষিজীবী আদিবাসীরা ভাল ফসল কামনায় কাম-মূলক তুক্-তাক্ করে থাকে। শস্য কামনায় ও রোগ-অশুভ শক্তি ইত্যাদিকে দূরে রাখতে বলি দেয়। সেটা নরবলি হলে আরও ভালো। নরবলি বে-আইনি হয়ে যাওয়ার পরও নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে এখনও গোপনে নরবলি হয়। এ অনেকটা রূপ কানোয়ারের সতী হওয়ার মত। হাজার লোকের সামনে ঘটনা ঘটলো, কিন্তু একটিও প্রত্যক্ষদর্শী মিললো না। স্থানীয় মানুষরা নরবলির খবর জানে। বলি উৎসবের কয়েকদিন আগে থেকেই মানুষ খুব সাবধানে থাকে। বাচ্চাদের আগলে রাখে। তবু বলি আটকায় না। ভক্তরা কাউকে না কাউকে বলির জন্য ঠিক পাকড়াও করে নেয়।

নিজেরাই হাঁড়িকাঠে মাথা দিতে চায়, এমন লোকও ছিল, আছে। তারা ভাবে এতে বিশাল পুণ্য হয়। সরাসরি মায়ের চরণে স্থায়ী জায়গা মেলে। আবার কাউকে নানা ধরনের ভোগের লোভ দেখিয়ে, ভোগের সুযোগ দিয়ে বলি দেওয়া হত। অসম ও মেঘালয়ে এক সময় এমন মানুষ প্রচুর মিলতো, যারা নিজেরাই ঘোষণা করতো, মা 'কা-মে-খা' বা কামাখ্যা তাদের রক্ত চেয়েছেন। এইসব ঘোষণাকারীদের বলা হতো 'ভোগী'। তাদের সমস্ত রকমের সুখভোগের ব্যবস্থা করা হতো। তার মধ্যে অপরিমিত মদ্যপান ও নিত্যমৈথুনের ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতো। তারপর তাদের সাধারণত অম্বুবাচীতে বলি দেওয়া হতো।

খাসি উপজাতিদের দেবী ছিলেন 'কা-মে-খা'। 'কা-মে-খা' হলেন দেবীর যোনি। শিবের লিঙ্গ যেমন বহু মন্দিরে পূজিত হয়, তেমনই কামরূপে যোনি পুজো হয়। কামরূপের এই যোনি দেবী ভারতের অবিতর্কিত (তন্ত্র-বিশ্বাসীদের কাছে) এক নম্বর তান্ত্রিক দেবী। এই 'কা-মে-খা'-ই পরবর্তীতে কামাখ্যা হয়েছেন। তিনি যে নতুন

মন্দিরে পূজিত হন, সেই মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে ১৪০টি নরবলি দেওয়া হয়। একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে এখনও ভারতের কোটি কোটি মানুষ বিশ্বাস করে যে অম্বুবাচিতে যোনিটি রজস্বলা হয়। ভক্তরা রজঃতে কাপড় ভিজিয়ে মাদুলি বা তাবিজ করে ধারণ করে। বিশ্বাস করে কামাখ্যার রজঃ সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে। অনেক অপরাধিরাই রজঃ থেকে তৈরি 'মহামৃত্যুঞ্জয়ী কবচ' ধারণ করে। বিশ্বাস করে, পুলিশ বা বিরোধী সমাজবিরোধীদের গুলিও হার মানবে এই কবচের সামনে। এ'সবই জাদু-বিশ্বাস।

কেরলের ভগবতী ও উত্তর ভারতের দেবী পার্বতী রজস্বলা হন বলে ভক্তরা বিশ্বাস করেন। এইসব জাদু বিশ্বাসের হাত ধরে হিন্দু উপাসনা-ধর্মের বিবর্তন ঘটেছে। জাদু বিশ্বাসের ভিতের উপর গড়ে উঠেছে তন্ত্র।

জাদু বিশ্বাসের পক্ষে যারা নানা ধরনের আচার-আচরণের বিধান দিত, সেই জাদুকররাই বর্তমান হিন্দু পুরোহিতদের পূর্বসূরি।

ধর্মীয় জাদু বিশ্বাস ও ম্যাজিক শো : দুই পৃথিবী

ম্যাজিক শো'তে জাদুকর বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে দর্শকদের মধ্যে নানা দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিয়ে নির্মল আনন্দ দেন। আদিম জাদু বিশ্বাস আদৌ এমন ধরনের কোনও ব্যাপার ছিল না। জাদুকররা বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে আদিম মানুষদের ঠকাবার মতো কোনও অবস্থাতেই ছিল না। তখন জীবন ধারণের উপকরণ ও হাতিয়ার ছিল অতি সামান্য। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা, অসুখ, জন্ম রহস্য ইত্যাদি বহুতর বিষয়ের কারণ খুঁজে পাওয়ার মত বুদ্ধির বিকাশ আদিম মানুষদের মধ্যে ঘটেনি। আধুনিক প্রযুক্তির বিষয়ে ওয়াকিবহাল কৃষক আজ ফসল ফলাতে জমির যত্ন নেয়, সার দেয়, জলসেচের ব্যবস্থা করে, বীজ বপন ও তারপরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলো নেয়। আদিম যুগে জমির উর্বরাশক্তির সঙ্গে নারীর উর্বরাশক্তিকে এক করে দেখা হত। নারীকে কৃষিভূমির সঙ্গে অভিন্ন ভাবা হত। লিঙ্গ ও তার ক্রিয়া লাঙল দেবার প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়েছিল। এই ধারণা থেকেই ভাল ফসলের জন্য ক্ষেতে সব সম্পর্ক ভুলে যৌন আচরণের রেওয়াজ ছিল এবং এখনও বহু আদিবাসী ও উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে এই আচরণ বিদ্যমান।

চাষের জন্যে, পানের জন্যে জল চাই। জলের জন্য আমরা একসময় পুকুর কাটতাম, কূয়ো কাটাতাম। এলো টিউবওয়েল, ডিপ-টিউবওয়েল, শ্যালোপাম্প, বৃষ্টি আনতে বনসৃজন, বিমানের সাহায্যে মেঘে নুন ছড়ানো, আরও কত কী! আদিম যুগে প্রাকৃতিক জলাশয় ছিল পানীয় জলের ভাণ্ডার। বৃষ্টি জলাশয়ে জল ঢালতো,

জল ঢালতো জমিতে। বৃষ্টির অভাবে পানীয় জলের যোগানে টান পড়তো। খরায় জমি হত ফুটি-ফাটা। তখন জলের জন্য এক মাত্র ভরসা ছিল বৃষ্টি। আদিম মানুষ মেঘের কাছে, দেবতার কাছে প্রার্থনা করতো— মেঘ দাও। এই মেঘ-দেবতাকে বা বৃষ্টি-দেবতাকে পুরুষ ভেবে নিয়ে নগ্ন নারী দেহের লোভ দেখাতো। ভাবতো, নারীদেহের লোভে বৃষ্টি ঝাঁপিয়ে পড়বে। আজও ভারতের বহু উপজাতি গোষ্ঠীর নারীরা বৃষ্টি নামাতে নগ্ন হয়ে বৃষ্টিকে আহ্বান জানায়। এ'ও জাদু বিশ্বাস!

বিয়ের অনুষ্ঠানে বিধবা হাজির থাকলে নববিবাহিতা বিধবা হবে—এমন জাদু বিশ্বাস এখনও অনেক হিন্দুর মধ্যে রয়েছে।

গর্ভবতী মহিলার সাধভক্ষণ অনুষ্ঠানে পুত্রবতীদের আমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয় এই বিশ্বাস থেকে যে, গর্ভবতীর সুপ্রসব হবে। এ'ও জাদুবিশ্বাস ছাড়া কিছু নয়।

রোগ নিরাময়ে রাস্তায় তুক্ করে রাখার রেওয়াজ এখনও আছে। তুক্ করা হয় এই বিশ্বাসে যে, কেউ তুক্ ডিঙোলে অসুখ তার সঙ্গে যাবে। রোগী সেরে উঠবে।

শত্রুকে হত্যা করতে তার কুশপুতুল তৈরি করে শত্রুর চুল বা পোশাকের টুকরো ঢুকিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার জাদু বিশ্বাস এখনও অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে।

সন্তানকে কুনজর থেকে রক্ষা করতে কপালের পাশে কাজলের টিপ এঁকে দেওয়া, কড়ে আঙুল আলতো করে কামড়ে দেওয়া, এখনও আমাদের সমাজে দিব্বি জাঁকিয়ে বসে রয়েছে।

ব্যবসাকে কুনজর থেকে বাঁচাতে লঙ্কা লেবু দোকানে ঝুলিয়ে রাখা, দোকানকে চোরেদের হাত থেকে বাঁচাতে রাতে দোকান বন্ধের সময় একটা কাগজে আগুন জ্বেলে দোকানের বন্ধ দরজার সামনে তিনবার ঘোরানো, এ'সবই জাদু বিশ্বাস।

নতুন বাড়ি হচ্ছে, একটা বাঁশের মাথায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ঝাঁটা, ঝুড়ি ও জুতো। নজর না লাগে?

আদিম জাদু বিশ্বাসের একটি বৈশিষ্ট্য হল—জাদু প্রক্রিয়া ছিল গোষ্ঠীর সকলের উপকারের কথা চিন্তা করে। আজও পিছিয়ে থাকা আদিবাসী ও উপজাতি গোষ্ঠীতে জাদু বিশ্বাসের প্রক্রিয়া সমবেত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। জমিতে ফলন বাড়াতে, বৃষ্টি নামাতে, সমবেত জাদু অনুষ্ঠান হত, হয়।

সমাজ যখন থেকে একটু একটু শ্রেণীবিভক্ত হয়ে পড়লো, তখন ব্যক্তিস্বার্থও মাথা তুলতে লাগলো। জাদু বিশ্বাসকে ব্যবহার করা হতে লাগলো নিজের বা পরিবারের স্বার্থে। নিজের ব্যবসা, নিজের বাড়ি, নিজের পরিবারকে কুনজর থেকে বাঁচাতে ব্যবহৃত হতে লাগলো জাদু বিশ্বাস। প্রাচীন জাদু বিশ্বাস এক সময় নিজস্ব প্রয়োগ পদ্ধতি ও তাৎপর্য হারিয়ে ধনিক-শ্রেণী ও জাদুকর বা পুরোহিত শ্রেণীর

স্বার্থে গোপন বিদ্যার রূপ পেল। পুত্র কামনায়, রোগ আরোগ্য কামনায়, শত্রু জয়ের কামনায়, নারী ভোগের কামনায়, এমনি হাজারো কামনায় হোম-যজ্ঞ ও তান্ত্রিক পুজোপদ্ধতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। যাজ-যজ্ঞের বেদী তৈরি করা হতে লাগলো বিভিন্ন দেবী বা ভগবতীর 'ভগ' বা যোনির প্রতীক হিসেবে।

অথর্ব বেদ এমনই এক গুহ্যবিদ্যার আকর, যেখানে আদিম জাদু বিশ্বাসকে ব্যক্তিস্বার্থে প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। জাদুকররাই নাম পাল্টে হয়ে গেল মুনি-ঋষি-পুরোহিত।

আদিম মানবগোষ্ঠী জাদুবিশ্বাসের যে বীজ বপন করেছিল, আজ তাই পল্লবিত হয়ে বৃক্ষ। এটাই হিন্দু ধর্মের অনন্যতা। ভারত আজও জাদুর দেশ রয়ে গেল। আর জাদুকররা হয়ে গেল ত্রিকালজ্ঞ মুনি-ঋষি-অধ্যাত্মবাদী-'মিথ'।

অধ্যায় ঃ ছয়

তন্ত্রের প্রথম ধাপ যোগ, তারপর ...

একই অঙ্গে এত রূপ

'যোগ' ব্যাপারটা নিয়ে আমি ধন্ধে ছিলাম দীর্ঘকাল। যোগ কি আসলে যন্ত্রপাতি ছাড়া আসনের সাহায্যে কিছু ব্যায়াম পদ্ধতি? শরীরকে সুস্থ রাখার কিছু আসন ও মুদ্রার পদ্ধতি মাত্র? নাকি এর বাড়তি কিছু? যোগী হলে কি জলের উপর দিয়ে সত্যিই হেঁটে যাওয়া যায়? কয়েক'শো বছর নীরোগ অবস্থায় বেঁচে থাকা যায়? যৌবনকে ধরে রাখা যায় আমরণ?

"হ্যাঁ, যায়।" কথাটা জোরের সঙ্গে আমাকে বলেছিলেন 'সিদ্ধ-যোগী' বালক ব্রহ্মচারী। আরও বলেছিলেন, "তোরা যে'সব ঘটনাকে অলৌকিক বলে মনে করিস, সে'সবই করতে পারেন একজন সিদ্ধ-যোগী। জলে হাঁটা কীরে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ত্রিভুবন ঘুরে আসতে পারেন তাঁরা।"

"এখনকার যোগ-ব্যায়াম আর ঋষিদের নির্দেশিত 'যোগ' কি একই ব্যাপার?" জিজ্ঞেস করেছিলাম যোগ-ব্যায়ামের জাতীয় বিচারক ডাঃ শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়কে। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় সোজা-সাপটা জানালেন, "এ'যুগের যোগ আর ঋষিদের আমলের যোগ একই ব্যাপার। যোগ হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ সাধন করা যায়। এখন সবারই সময়ের অভাব। তাই শরীরকে সুস্থ রাখার মত কয়েকটা সোজা যোগ আমরা শেখাই। আমার 'যোগ-বিজ্ঞান ও রোগ মুক্তি' বইতে লিখেছি, পতঞ্জলির আমলের যোগ হল এ'যুগের যোগেরই একটা বিস্তৃত রূপ। যোগ মৃত্যু ও জরাকে জয় করতে পারে। এই যে আমার কোনও অসুখ হয় না, তার কারণ যোগ।"

ডাঃ শান্তিরঞ্জন একবার খুবই অসুস্থ হলেন। ডাক্তার-হাসপাতাল করলেন। শান্তির কথাগুলো আমার কাছে জোলো হয়ে গেল। 'কথার কথা' হয়ে গেল।

কমল ভাণ্ডারী এক সময়ের ভারতের সেরা 'বডি বিল্ডার' ছিলেন। যোগে আকৃষ্ট হলেন। 'যোগ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া'র সম্পাদক হলেন। তাঁর কথায়, "সব শাস্ত্রের সার যোগ শাস্ত্র।"

যোগ নিয়ে কথা বলেছিলাম চিত্ত গড়াই-এর সঙ্গে। তিনি তখন যোগ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার নির্বাচিত জাতীয় বিচারক। কথা বলেছি যোগ সাধক ও বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতির সহ-সভাপতি ডাঃ সৌমেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে। দেখলাম যোগের কয়েকটা বিষয়ে ডাঃ চট্টোপাধ্যায়, কমল ভাণ্ডারী, চিত্ত গড়াই ও ডাঃ দাস একমত। ওঁরা মনে করেন (১) ভারতীয় মুনি-ঋষিরাই যোগের আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়মের প্রবর্তক। (২) মহাদেব, পশুপতিনাথ বা শিব-ই যোগের আদি দেবতা ও স্রষ্টা। (৩) প্রাচীন মুনি-ঋষিরা মানুষের শরীর বিজ্ঞানের খুঁটি-নাটি সব কিছু জানতেন। বিভিন্ন স্নায়ুতন্ত্র, শিরা-উপশিরার কার্যকারিতা জানতেন। (৪) যোগশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্র দুই-ই বুঝেছিল, মস্তিষ্ক থেকে সুষুম্নার মধ্যে (মেরুদণ্ডের মধ্যে) অবস্থিত স্নায়ুতন্ত্রের সব কেন্দ্র ও মর্মস্থানে একটি শক্তিনাড়ী বা ব্রহ্মনাড়ীর আশ্রয়ে আত্মা থাকে। (৫) মানুষের দেহের ভিতর ছটি চক্র থাকে, যাকে বলে 'ষটচক্র'। এই ছটি চক্র ভেদ করে চিত্তকে মস্তিষ্কে নিয়ে যেতে পারলে মহাশক্তি অর্জন করা যায়, যোগ সিদ্ধ হওয়া যায়।

এইসব শুনে বেশ শঙ্কিত হয়েছিলাম। এই চার বিশিষ্ট যোগবিদ্‌দের দু'জন ডাক্তার। তারপরও তাঁরা বুঝতে চাইছেন না—যোগ দর্শনটাই দাঁড়িয়ে আছে ভুল 'অ্যানাটমি' জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে। ডাক্তারী বিদ্যার 'অ্যানাটমি' জ্ঞান যোগীদের ভুলের পায়ে বিসর্জন দিলেন? এই ভুল শারীর বিদ্যে দিয়ে রোগ সারাবার চেষ্টা করলে তার পরিণতি কী হবে ভেবে শঙ্কিত হয়েছিলাম।

'অবমানব' পত্রিকার সম্পাদক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। হিজড়েদের নানা অধিকার নিয়ে কথা-টথা বলেন। একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। একদিন আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির বেলেঘাটার অফিসে এলেন এক 'অবমানব'কে নিয়ে। কথায় কথায় জানালেন, হিজড়েদের শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ-ই পুরুষ। কিন্তু কেউ পরীক্ষা করতে গেলে ধরতে পারবে না। আমরা একটা গুহ্য যোগাসনের সাহায্যে লিঙ্গকে শরীরের ভিতর ঢুকিয়ে নিতে পারি।

হটযোগে এমন একটা আসনের কথা পড়েছি, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। হটযোগের ক্ষমতার পরীক্ষা নেওয়ার সুযোগ পেয়ে বললাম, "করে দেখাও।" দেখাতে পারেননি সোমনাথ।

আসলে যোগের নানা ফল লাভের যে'সব কথা প্রাচীন মুনি-ঋষি অর্থাৎ জাদু-পুরোহিতরা বলে গিয়েছিলেন, তা ঠিক নয়। কিছু কিছু আসন শরীরকে সুস্থ রাখার পক্ষে যথেষ্ট কার্যকর হতেই পারে। কিন্তু আসন করে অদৃশ্য হওয়া যায়, জরা ও মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা যায়, এমন আজগুবিতে বিশ্বাস করার মত কিছু বাল্যখিল্য

মানুষ এখনও আছেন, দুঃখ ও শঙ্কার কথা এটাই।

আমাকে পাকিয়েছিলেন স্কুলের ভৌমিক স্যার। ফর্সা গোলগাল রসগোল্লা-মার্কা চেহারা। একেবারে রসে টইটম্বুর। তিনিই শুনিয়েছিলেন রামী-চণ্ডীদাসের গল্প। বুঝিয়েছিলেন, চণ্ডীদাস ও রামী রজকিনীর মধ্যে কোনও প্রেমের সম্পর্ক ছিল না। ছিল বিশুদ্ধ কামের সম্পর্ক। চণ্ডীদাস শৈব মতে রামীকে বিয়ে করেছিলেন।

অনেক যোগী-তান্ত্রিক রমণের জন্য রমণী রাখতেন। তাকেই শোভন আকার দিতে বলা হত 'শৈব-বিবাহ'। একসময় অনেক বাঙালি জমিদার ও বাবুরা যোগ ও তন্ত্র নিয়ে মেতেছিলেন। তাঁদের সাধনার ভৈরবী ছিল নিচুজাতের মেয়েরা।

এইসব সাধন-সঙ্গিনীদের যোগাড় করে দিত এক শ্রেণীর দূত বা দূতি। যোগ ও তন্ত্র মতে এমন পবিত্র কাজে সাহায্য করার জন্য পুণ্য লাভের কথা বলা হয়েছে। এইসব সাধন সঙ্গিনী নারীদের যোগাড় করা হত সাধারণভাবে ধোপা, গোয়ালা, নাপিত, চণ্ডাল, বেশ্যা—এইসব সম্প্রদায় থেকে।

সাংখ্য যোগ থেকে তন্ত্র, যেখানেই গভীরে ঢুকবেন, দেখবেন ওদের মূল কথা এক-ই—মানুষের দেহ-ই বিশ্বপ্রকৃতির সব রহস্যের আধার। সৃষ্টির মূলে রয়েছে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন। প্রকৃতিই হল নারী-শক্তি। নারী-পুরুষের মিলন-ই সাধনা। মিলনের চরম আনন্দ-ই পরম-ব্রহ্ম। মিলনেই সৃষ্টি। যোগ ও তন্ত্রে কামজ আরাধনা ছাড়া সিদ্ধির কোনও উপায় নেই। দেহের আত্মাই ঈশ্বর। নিজের আত্মাকে সুখী করাই ঈশ্বরকে সুখী করা। মিলনে যে সুখ, তার তুল্য সুখ আর কিছুতে নেই।

যোগ আর তন্ত্র হল 'গুহ্য তত্ত্ব'। মানে, গোপন তত্ত্ব। এ'সব নিয়ে আলোচনা গোপনে করতে হয়। এর সাধনাও গোপনে করতে হয়। এ'নির্দেশ যোগ ও তন্ত্রের।

আমার কলেজে-সহপাঠী ছিল বিমল। পদবি—মনে নেই। একদিন আমাকে ও আর এক সহপাঠী তপনকে শোনালো পরিবারের এক গভীর সমস্যার কথা। পরিবার বলতে—বিমল, মা-বাবা আর এক বোন। বোন ক্লাশ টেনের ছাত্রী। বাবা তান্ত্রিক। সমস্যাটা বাবা আর বোনকে নিয়ে। বাবা ভৈরবতন্ত্র মতে বোনকে ভৈরবী করে সাধনা করেন।

তপন অবাক? বাবা-মেয়েতে তন্ত্র-সাধনা করে, এতে সমস্যা কোথায়?

ভৌমিক স্যারের কল্যাণে আমি আগেই পেকেছি। তাই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গা গুলিয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে তপনও সমস্যার কদর্যতা ও গভীরতা বুঝতে পেরেছে। শুনলাম, বিমল আর ওর মা বাধা দেওয়ার সমস্ত রকম চেষ্টা করে ব্যর্থ। শেষ

ভরসা হিসেবে লজ্জার মাথা খেয়ে পড়শিদের সাহায্য চেয়েছেন। তারপরও পড়শিরা কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেননি। কেচ্ছা শুনতে ওঁদের যতটা উৎসাহ দেখা গেছে, সাহায্য চাইতেই ততটাই কুঁচকে গেছেন। বিমলের কথায়—আসলে বাবার তন্ত্রক্ষমতার ভয়ে ওঁরা কেউ বাবার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করেন না। ওঁরা বাবাকে ঘৃণা করেন, আবার ভয়ও করেন।

তন্ত্রের নামে অজাচার চলছে প্রায় প্রকাশ্যে।

কিছু বছর আগেও তান্ত্রিকদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বিশেষ ধারণা কাজ করতো। তান্ত্রিক মানে শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ায়। মড়ার উপর বসে সাধনা করে। মদ-মড়ার আধ পোড়া মাংস ইত্যাদি অখাদ্য-কুখাদ্য খায়। ভৈরবী রাখে। কী সব গোপন সাধনা করে। মারণ উচ্চাটন-হঠযোগ ইত্যাদি করে। পিশাচ-সিদ্ধ এ'সব লোকদের দৃষ্টি থেকে যত দূরে থাকা যায়, ততই মঙ্গল। এখন তান্ত্রিকদের সম্বন্ধে ধারণাটা পাল্টে দিয়েছে কলকাতার কিছু দৈনিক পত্রিকা। যে পত্রিকা যত বড়, তান্ত্রিকদের বিজ্ঞাপনের মিছিলও সে পত্রিকায় তত বড়। এঁদের কত না উপাধির বহর? যেমন—তন্ত্রভৈরব, তন্ত্র-অ্যাস্ট্রোপামিস্ট, তান্ত্রিকাচার্য, তন্ত্রসম্রাট, তন্ত্রবিদ, তন্ত্রবিশারদ, তন্ত্রজ্ঞানী, তন্ত্ররত্ন, তন্ত্রসিদ্ধ তান্ত্রিক, পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক, হঠযোগী তান্ত্রিক ইত্যাদি। এঁদের ছবি সহ বিজ্ঞাপন থাকে। ছবি দেখলে আদৌ ভয় করে না। সাজু-গুজু চেহারা। অনেকেই যেন যাত্রার আসর থেকে উঠে আসা চরিত্র। একটু বেশি রকম নাটুকে। মহিলা তান্ত্রিকের সংখ্যা কম নয়। এইসব পুরুষ নারী তান্ত্রিকদের অনেকেই এসেছেন বিভিন্ন জগৎ থেকে। কেউ ছিলেন যাত্রা দলের ফালতু, কেউ সিনেমার এক্সট্রা, কেউবা এক সময়ের গেঞ্জির মডেল, আবার কেউবা নাকি ছিলেন কলগার্ল, এখন বিগতা যৌবনা। কেউ ঢপের 'ডাক্তার', কেউ স্কুলের গণ্ডি পেরুতে না পারা 'ডক্টরেট'। উপাধিগুলো হয় স্বঘোষিত, নতুবা মোটা টাকায় কেনা।

এইসব তান্ত্রিক-জ্যোতিষীরা বশীকরণ মন্ত্রে সব্বাইকে বশ করতে পারেন। আবার বেয়াড়া যুক্তিবাদী বা পোষ না মানা মিডিয়া-ম্যানকে সামলাতে বশীকরণ মন্ত্রের বদলে পোষা মস্তানদের উপর ভরসা করেন। ৯০ দিনে গ্যারান্টি দিয়ে রোগ সারাবার বিজ্ঞাপন দেন এবং নিজে অসুস্থ হলে দামী নার্সিংহোমে ভর্তি হন।

এইসব তান্ত্রিকদের সঙ্গে কম টিভি অনুষ্ঠানে তো মুখোমুখি হলাম না। ঝামা-ঘষা মুখ নিয়ে এঁরা নির্লজ্জের মত যে সব কথা আমাকে বলেছেন, তার মোদ্দা অর্থ হলো—আপনারা যুক্তিবাদ নিয়ে যতই চেঁচান, আমাদের হাঁড়িকাঠে গলা বাড়িয়ে

দেওয়ার মত পাঁঠার অভাব কোনও দিনই হবে না। ওরা যদি গলা বাড়িয়ে দেয়, আমাদের খাঁড়া চালাতে দোষটা কোথায়?

এইসব তান্ত্রিকদের অনেকেই আবার টিভি ক্যামেরার সামনে ও বিজ্ঞাপনে এ'কথা বলেন যে, নকল তান্ত্রিকদের থেকে সাবধান, আমি ছাড়া সব তান্ত্রিক-জ্যোতিষীই প্রতারক, ইত্যাদি জাতীয় কথা।

'তারা' টিভি চ্যানেলে ডঃ সন্দীপন চৌধুরীর এমন-ই একটা বক্তব্য ছিল—তিনি ছাড়া আর সবাই প্রতারক।

উত্তরে ওই অনুষ্ঠানেই বলেছিলাম—আমরা বলি, যে যত বড় তান্ত্রিক বা জ্যোতিষী, সে তত বড় প্রতারক।

বীরভূম আমাকে টানে। এই টানের অনেকটাই বাউল গান আর বাউলদের জীবনচর্যার কারণে। বীরভূমের মাটির গন্ধ যে সাহিত্যিকের কলমে পেয়েছি, তিনি তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর জামাতা ডাঃ বিশ্বনাথ রায় ও আমি গল্প করছিলাম তারাশংকরবাবুর পাকপাড়ার বাড়িতে। কথায় কথায় এক সময় এলো আউল-বাউল ও সহজিয়াদের প্রসঙ্গ। তারাশংকরবাবুর কাছেই সেদিন প্রথম জানলাম, আউল-বাউল-সহজিয়া-বৈষ্ণবরা দেহতত্ত্ববাদী। তারা মনে করে—যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাহা আছে দেহভাণ্ডে। পরম ব্রহ্মকে, পরম সত্যকে জানার জন্য ধর্মীয় নানা আচার-অনুষ্ঠান তাদের কাছে মূল্যহীন। দেহকে জানা, সৃষ্টি তত্ত্বকে জানার জন্যে নারী-পুরুষের মিলন হল স্বাভাবিক উপায়। মিলন থেকেই সৃষ্টি। মিলনেই আনন্দ। মিলনেই পূর্ণ জ্ঞান। আউল-বাউল-সহজিয়াদের উৎপত্তি সহজযানী বৌদ্ধ ধর্ম থেকে। সহজযানী বৌদ্ধরা বজ্রযান বৌদ্ধদের নিয়ম-কানুন-আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করে দেহকেই সব সাধনার উৎস, লক্ষ ও মাধ্যম বলে গ্রহণ করেছিল।

বঙ্গদেশে পাল রাজাদের আমলে সহজযান বৌদ্ধদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। পাল রাজাদের আমলেই অতীশ দীপঙ্কর 'বজ্রযান সাধন' গ্রন্থ লিখেছিলেন। তান্ত্রিক গ্রন্থের টীকাকার প্রজ্ঞাবর্মনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পাল রাজারা। রাজা ধর্মপাল পঞ্চাশটা বৌদ্ধ মঠ তৈরি করে দিয়েছিলেন। রাজা দেবপালও কিছু বৌদ্ধবিহার তৈরি করেছিলেন। পাল রাজারাই বৌদ্ধ ধর্মের একটা সহজ-সরল চেহারা দিতে চেয়েছিলেন। তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও হিন্দুদের মূর্তি পুজোর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং বুদ্ধদেবের মূর্তি পুজোর প্রচলন করেছিলেন। সহজযান ও দেহতত্ত্ববাদ বঙ্গদেশে জনপ্রিয় হওয়ার পিছনে পাল রাজাদের অবদান সবচেয়ে বেশি। দেহতত্ত্ববাদীরা শেষ পর্যন্ত তান্ত্রিক।

আউল-বাউল-সহজিয়া-বৈষ্ণবদের দেখলে আমার কিশোর মনেও কোনও ভয়

বীভৎস রসের উদয় হত না। বরং বাউলরা সে'দিন থেকে আজও আমার মন টানে সমান ভাবে। আমার মনের মতো অনেক মানুষই আজও বাউল গানের টানে, বাউল মনের টানে কেন্দুলি মেলায় ভিড় জমান।

পরে জেনেছি, রামকৃষ্ণও তন্ত্র-সাধক ছিলেন। তন্ত্র-সাধনার মাধ্যমেই তাঁর 'সিদ্ধি' লাভ বা 'ব্রহ্ম' লাভ। তন্ত্র-সাধকের ভৈরবী চাই। তন্ত্র-সাধিকার চাই তান্ত্রিক। তন্ত্রে দীক্ষাগুরুর কোনও জাত-বিচার নেই, নারী-পুরুষ ভেদ নেই। রামকৃষ্ণের দীক্ষাগুরুর যোগ সঙ্গী ও ভৈরবী ছিলেন যোগেশ্বরী।

এ'সবই লেখা আছে রামকৃষ্ণ মিশনের নিজস্ব প্রকাশন বিভাগ 'শ্রীরামকৃষ্ণ বেদ মঠ' থেকে প্রকাশিত স্বামী প্রজ্ঞানন্দর লেখা 'তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা' বইটিতে।

যোগ ও তন্ত্রের একই অঙ্গে এত রূপ! যতই জেনেছি ও দেখেছি ততই অবাক হয়েছি। হরপ্পা যুগ, বৈদিক যুগ ঘুরে আধুনিক যুগ পর্যন্ত তন্ত্রের নানা রূপ ছিল ও বহাল তবিয়তে আছে। এখনও যোগ ও তন্ত্রের বই-পত্তর প্রচুর বিক্রি হয়। যাঁরা কেনন, তাঁদের প্রায় সকলেই ওসব বইয়ের ধোঁয়াশায় ভরা কথা পড়তে পড়তে, হোঁচোট খেতে খেতে বুকসেল্ফে সাজিয়ে রেখে বাঁচেন। যাদের কিছু করে খাওয়ার ক্ষমতা নেই, তাঁরা তান্ত্রিক জ্যোতিষী সেজে বসেন। বিজ্ঞাপন দেন। মাস গেলে চার লাখ থেকে চল্লিশ লাখ যা খুশি রোজগার করেন লাইন দেওয়া 'শিক্ষিতদের' পকেট কেটে।

মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার-ই ইতিহাস। সাময়িকভাবে বার বার পিছু হাঁটার কুচেষ্টাকে নিষ্ফল করে দিয়ে সমাজ শেষ পর্যন্ত এগিয়েই চলেছে—এটাই ইতিহাস। যোগ ও তন্ত্রের অর্বাচিন ও বিকৃত ধারণা একদিন মানুষ বর্জন করবেই। এটাই মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের পরিণতি।

বৈদিক-ধর্মের গোড়ার কথা

ভারতবর্ষের প্রাক-বৈদিক উপাসনা-ধর্ম ছিল মূলত লিঙ্গ ও যোনির পুজো এবং নারী-পুরুষ মিলনসর্বস্ব যোগ ও তন্ত্র-সাধনা। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, এইসব দেহ-সর্বস্ব সাধনা এসেছিল উর্বরতামূলক জাদু-বিশ্বাস থেকে।

মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য লিঙ্গ ও যোনির মূর্তি। পাওয়া গিয়েছে যোগভঙ্গিতে বসা দেবতা-মূর্তি। যোগ সাধনা যে প্রাক্ বৈদিক যুগে ছিল এইসব যোগী-মূর্তি দেখে তা অনুমান করতে অসুবিধে হয় না। তন্ত্রের প্রবেশ যোগের হাত ধরেই।

হরপ্পা সভ্যতার আনুমানিক সময় ২৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

এই সময়ের শীলগুলোতে বিভিন্ন ক্ষোদিত মূর্তির সঙ্গে লিপিও খোদিত ছিল। এমন শীল পাওয়া গেছে হাজার দু'য়েক। লিপিগুলোর পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। তবে এ'বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে, হরপ্পার যুগে লিপি বা বর্ণমালা ছিল।

আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আর্যভাষী জনগোষ্ঠীর একাধিক শাখা ইরান থেকে আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ইন্দো-ইয়োরোপীয় জনগোষ্ঠীর শাখা ইরানে বসবাস শুরু করেছিল। এরাই আর্যভাষী। এদের

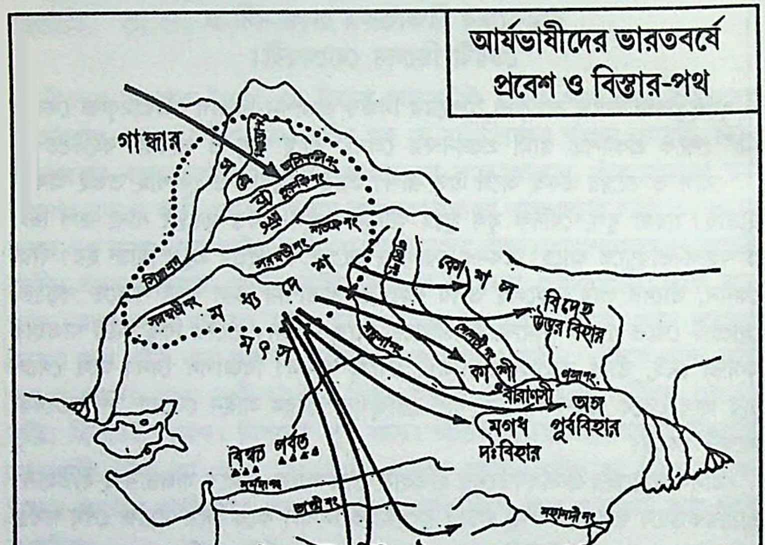

অন্তত দু'টি শাখার একটি ঢুকেছিল খাইবার গিরিপথ দিয়ে কাবুল উপত্যকায়। অন্য শাখাটি ঢুকেছিল হিন্দুকুশ পর্বতমালার গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে।

'আর্য' আসলে কোনও জাতিগোষ্ঠীর নাম নয়। একটি গোষ্ঠী-ভাষার নাম। আর্য শব্দটি আমরা ভুল ভাবে ব্যবহার করছি বলে মনে করেন রোমিলা থাপার থেকে ইরফান হাবিবের মত পণ্ডিত ঐতিহাসিকরা।

আর্যভাষীরা লোহার ব্যবহার জানতো। ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতো। যাযাবর জাতি হিসেবে পশুপালন ও মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতো। কৃষি জানতো না। লিপি বা বর্ণমালা ছিল অজানা। তাই আর্যভাষীদের সাহিত্য ছিল 'শ্রুতি'। অর্থাৎ একজন গুরু বেদ বা অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যের মন্ত্র বা স্তোত্র বা সূক্ত আবৃত্তি করতেন, ছাত্রকুল সমস্বরে তাই পাঠ করতেন। বৈদিকযুগের উচ্চবর্ণের মানুষরা সম্ভবত ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে লিপি আবিষ্কার করেছিলেন। হরপ্পা যুগের পরবর্তীতে ভারতে প্রথম লিপি যা পাওয়া যায়, তা ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের। ওইসব লিপি পড়ে মনে হয় ৫০০ খ্রিস্টাব্দে লিপি ছিল।

মনু ছিলেন বৈদিক যুগের অর্থাৎ আর্য ভাষাগোষ্ঠীদের ধর্মীয় আইন গ্রন্থের প্রথম প্রণেতা। মনুস্মৃতির টীকাকার কুল্লুকভট্ট বলেছেন—শ্রুতি দু'রকমের। (১) তান্ত্রিক, (২) বৈদিক। তান্ত্রিক ধারাটি ছিল নারী-পুরুষের দৈহিক মিলনের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মকে জানার প্রক্রিয়া। এরা লিঙ্গ ও যোনির পুজো করতো।

বৈদিক ধারাতে যদিও বহু দেবতা ছিলেন, তাঁদের সন্তুষ্ট করতে নানা প্রার্থনা মন্ত্র যেমন ছিল, তেমনই যাগ-যজ্ঞের প্রচলন ছিল। ঠিক-ঠাক ভাবে যজ্ঞ করলে অভিষ্ট ফল পাওয়া যেত। এ'ক্ষেত্রে দেবতাদের ভূমিকা ছিল গৌণ। এটাই ছিল বৈদিক ধর্মের মূল ধারা।

বৈদিক যুগের ঋষি বা জাদুপুরোহিতরা শুরুতে যোগ সাধনা বা তন্ত্র সাধনাকে মোটেই ভালোভাবে নেয়নি। বরং এইসব ধর্মীয় বিশ্বাসকে তাদের নিয়ে আসা ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরোধী বা শত্রু বলে মনে করেছিল। বৈদিক সাহিত্য কৌষীতকি উপনিষদে (৩,১) আমরা তার পরিচয় পাচ্ছি। সেখানে দেবরাজ ইন্দ্র যোগীদের নেকড়ের মুখে ছুড়ে ফেলছেন। নেকড়েরা যোগীদের ছিঁড়ে খাচ্ছে। আমরা ঋক্‌বেদে পাচ্ছি, লিঙ্গ ও যোনি-উপাসকদের নগর ধ্বংস করছেন ইন্দ্র। যোগীদের শাস্তি দিতে ছুড়ে ফেলছেন নেকড়ের মুখে।

· ঋক্‌বেদের আনুমানিক রচনাকাল ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে। অন্যান্য বৈদিক সাহিত্য ঋক্‌বেদের পরে রচিত। রামায়ণ, মহাভারতের ঘটনাবলীর সময়কাল ১০০০ থেকে ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

মহাভারতের অনুসাশনপর্বে দেখতে পাচ্ছি—কৃষ্ণের কাছে অভিমন্যু এই বলে শিবের প্রশংসা করছেন যে, শিবই একমাত্র দেবতা যার লিঙ্গ সর্বত্র পূজিত হয়।

এ'থেকে আমরা বুঝতে পারি যে,

বৈদিক মানুষরা যে'সব দেব-পূজায় বিশ্বাস নিয়ে সিন্ধু অঞ্চলে পা রেখেছিল, সময়ের সঙ্গে তাতে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল প্রাক্-বৈদিক যুগের মানুষদের ধর্মীয় বিশ্বাসের। অনুপ্রবেশের শুরুতে প্রাচীনপন্থী বৈদিকদের সঙ্গে নব্য-বৈদিকদের দ্বন্দ্ব অবধারিতভাবে এসেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাক-আর্য-যুগের লিঙ্গ যোনির পুজো ও যোগ-তন্ত্র ইত্যাদি বৈদিক ধর্মীয় বিশ্বাসে ঢুকে পড়েছিল।

ঋক্‌বেদের দেবতারা

ভারতবর্ষের প্রাক-বৈদিক যুগের হরপ্পা সভ্যতা বা সিন্ধু সভ্যতা ছিল কৃষিনির্ভর। মহেঞ্জোদরো, হরপ্পার মত বহু শহরের নিদর্শন পাওয়া গেলেও, সেইসব শহর ঘিরে ছিল বহু গ্রাম। গ্রামের মানুষদের মূল জীবিকা ছিল চাষ। এই কৃষি উৎপাদিত ফসল-ই ছিল শহরগুলোর বেঁচে থাকার অক্সিজেন।

কৃষি-নির্ভর এই সমাজে নারী প্রাধান্যের পরিচয় 'পাওয়া গেছে। সেই সময়কার সমাজের ধারণায় নারী ছিল শক্তিময়ী প্রকৃতি। নারী সক্রিয় ও পুরুষ নিষ্ক্রিয়। জন্মদানের ক্ষেত্রেও পুরুষের ভূমিকাকে গৌণ বলে মনে করা হত। তার কারণ আদিম সমাজে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না। সুতরাং সন্তানের বাবাকে চিহ্নিত করা ছিল অসম্ভব। মা'কে যেহেতু জন্মদাত্রী হিসেবে চিহ্নিত করা যেত, তাই মাকে ঘিরেই গড়ে উঠতো পরিবার। ফলে সমাজে মাতৃ প্রাধান্য ছিল স্পষ্ট। এখনও মেঘালয় ও অসমের খাসি সমাজে, গারো সমাজে কেরলে নায়ারদের মধ্যে মাতৃপ্রাধান্য টিকে রয়েছে। একাধিক পতি নিয়ে ঘর করার রীতি এখানও নায়ারদের মধ্যে আছে। কেরালার কানিয়ান, মান্নান, মুদ্‌বর, রেড়্ডি, চেরুমান, তেলেগু, যোগী, মাদুরার কল্লান, মধ্যপ্রদেশের ভুঁইয়া, চামার, কর্কু, গোওরি, বারি, হোসেঙ্গাবাদের জাদাম, সিমলার পার্বত্য এলাকায়, হিন্দুকুশের চিত্রলে মাতৃ প্রাধান্য বর্তমান রয়েছে।

আর্যভাষী যারা সিন্ধু-উপত্যকায় এসেছিল তারা হরপ্পা সভ্যতার তুলনায় ছিল যথেষ্ট-ই অসভ্য। আর্যভাষীদের জীবিকা ছিল পশুপালন ও শিকার। পশুখাদ্যের খোঁজে যাযাবর জীবন মেনে নিতে হয়েছিল। যাযাবর জীবনের দীর্ঘ-যাত্রপথে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হত। নিজেদের পশু-সম্পদ যেমন লুণ্ঠিত হত, তেমনই সুযোগ পেলে তারাও লুটপাঠ করতো। এই সময়টাই ছিল এমন। এই সময় গ্রিসেও 'বাণিজ্য' ও 'লুণ্ঠন' ছিল সমার্থক শব্দ। বণিকরা সুযোগ পেলেই অন্য গোষ্ঠীর সম্পদ

লুঠ করতো। অবস্থাই আর্যভাষীদের সমাজকে পুরুষতান্ত্রিক করেছিল। পরিণতিতে তাদের পূজার দেবতারাও ছিলেন পুরুষ।

বৈদিক সভ্যতার প্রাচীন সাহিত্য ঋক্‌বেদে যে'সব দেবতার উল্লেখ আছে, তাঁরা প্রধানত তিন শ্রেণীর। (১) মর্তের বা পৃথিবীর দেবতা, (২) আকাশের বা অন্তরীক্ষের দেবতা, (৩) স্বর্গ বা দ্যুলোকের দেবতা।

পৃথিবীর দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন পৃথিবী ও অগ্নি। আকাশের দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রুদ্র, বায়ু, বরুণ এবং পর্জন্য বা মেঘ ইত্যাদি। স্বর্গের দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মিত্র, বিষ্ণু, আদিত্য, উষা, অদিতি, পূষন বা পুষা, অশ্বিদ্বয় (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) ইত্যাদি।

এইসব দেবতাদের পরিচয় পাওয়ার পর বুঝতে অসুবিধে হয় না, বৈদিক যুগের শুরুতে 'প্রকৃতির সব কিছুরই প্রাণ আছে'—এমন চিন্তার প্রভাব ছিল। বৈদিক সাহিত্য প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর উপর দেবত্ব আরোপ করেছিল। দেবতারা ছিলেন মানুষের মতো দেখতে। উষা চির-যৌবনা, মোহময়ী, সুন্দরী। লঘু পরিচ্ছদ পরেন। প্রেমিককে নিজের স্তন দেখিয়ে মুগ্ধ করতে তৎপর। ইনি সূর্যের প্রেমিকা এবং একই সঙ্গে মা। ঋক্‌বেদের কুড়িটি সূক্তে তাঁর স্তুতি করা হয়েছে।

পূষণ একজন সূর্যদেবতা। মাথায় জটা, মুখে ছাগলের মত দাড়ি। অগ্নিদেবতার পরনে পুরোহিতের পোশাক। ইন্দ্র থেকে সূর্য সবারই চেহারায় মানবত্ব আরোপ করা হয়েছিল। তবে তাদের অনেকেরই হাত ছিল দুয়ের অধিক। বহু কাজ বহু হাতে সামলাবার দায়িত্ব কল্পনা করে হাতের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল।

ঋক্‌বেদে ২০০ সূক্তে অগ্নির স্তব করা হয়েছে। পার্থিব দেবতার মধ্যে অগ্নি প্রধান। অগ্নি হলেন দেবতা ও মানুষের যোগাযোগকারী দেবতা। অগ্নি তাঁর রথে দেবতাদের যজ্ঞস্থলে নিয়ে আসেন। তাঁর মুখ দিয়েই দেবতারা যজ্ঞভোগ গ্রহণ করেন। তিনি প্রবীণ, প্রাচীন কিন্তু চির-নবীন।

আকাশের দেবতা রুদ্র নিয়ে বৈদিক সাহিত্যে নানা রকমের কথা বলা হয়েছে। ঋক্‌বেদে বলা হয়েছে রুদ্র একই সঙ্গে রুদ্র ও শিব। একই সঙ্গে ভয়ানক ও মঙ্গলময় (১০/৯২/৯ ঋক্‌বেদ)। রুদ্র বা শিব তিন প্রধান দেবতার অন্যতম। ঋক্‌বেদে আরও বলা হয়েছে, এই দেবতা স্বল্পে তুষ্ট, কল্যাণকারী, রোগ নিরাময়কারী। আবার ক্রুদ্ধ হয়ে ধ্বংসকারী। প্রলয় কালে ইনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংস করেন। শিব স্বয়ম্ভূ।

ঋক্‌বেদে আবার অগ্নিকেও রুদ্র বলা হয়েছে। সম্ভবত অগ্নির সবকিছুকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করার ক্ষমতার জন্য রুদ্র বলা হয়েছে।

যজুর্বেদে বলা হয়েছে রুদ্র মুক্তিদাতা, ভেষজ চিকিৎসক দেবতা। এঁর কণ্ঠ নীল। শরীরের রং লাল। গৃহপালিত পশুদের রক্ষাকারী। রুক্ষ স্বভাব। ধ্বংসের দেবতা।

উপনিষদে রুদ্র বলছেন—আমিই সর্ব প্রথমে আগত। আমার পূর্বে এবং আমার উপরে কেউ নেই। আমিই সর্বোচ্চ। আমি চিরন্তন ও আমি চিরন্তন নই। আমি ব্রহ্মা, আমি ব্রহ্মা নই। আমিই পৃথিবীর পালক। আমিই প্রাণী জগতের নিয়ন্তা। প্রলয় কালে আমিই ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করি। আমার আদি নেই, অন্ত নেই, আমি অনাদি। আমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র এবং শিব।

ঋক্‌বেদে ইন্দ্র দেবরাজ নামে বিখ্যাত। তিনি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। বাইরের আক্রমণ থেকে দেবতাদের রক্ষা করেন। যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। তিনি অজেয় (ঋক্‌বেদ ১০/১৩৩/২), শত্রুদমনকারী, রাক্ষস ধ্বংসকারী।। ইন্দ্রের গায়ের রঙ, চুল, দাড়ি, রথ সবই সবুজ রঙের। তার অস্ত্র বজ্র, ধনুর্বাণ, অঙ্কুশ ও কাঁটাযুক্ত জাল। সোমরস ইন্দ্রের প্রিয় পানীয়। তিনি বহুভোজী ও চিরযুবা। ইন্দ্র ঝড় ও বজ্রের দেবতা। তিনি অসুর ও অনাবৃষ্টি বিনাশকারী শক্তি।

বেদ অনুসারে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও বায়ু একই দেবতার নাম। একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

আকাশের বা অন্তরীক্ষের দেবতা হলেন বায়ু। বায়ুকে তুষ্ট করতে অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচিত হয়েছে। বেদের কোনও কোনও জায়গায় বায়ু ও ইন্দ্রকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

রামায়ণে বলা হয়েছে হনুমানের জন্ম বায়ুর বীর্যে। বানররাজ কেশরীর স্ত্রী অঞ্জনাকে দেখে বায়ু কামতাড়িত হন এবং অঞ্জনাতে উপগত হন। এর ফলে হনুমানের জন্ম।

মহাভারত অনুসারে কুন্তির মন্ত্রে বায়ু কুন্তির কামনা মেটাতে বাধ্য হন। ফলে ভীমের জন্ম।

বরুণ জলের দেবতা। বেদে অনেক জায়গায় মিত্র ও বরুণকে একই সঙ্গে স্তব করা হয়েছে। ঋক্‌বেদের রচয়িতারা আকাশকে জলময় কল্পনা করতেন। আকাশ ও সমুদ্রের মিলন রেখায় বরুণের বাসস্থান বলে বিশ্বাস করতেন। বরুণ জলবিন্দুর মত শ্বেতবর্ণ, মৃগের মত বলবান, বৃষ্টি দ্বারা ত্রিলোক আর্দ্র রাখেন। বারুণী নামের সুরা তাঁর প্রিয় পানীয়। বেদে বরুণকে সহস্রলোচন বলা হয়েছে। খাণ্ডব দাহনের সময় অগ্নিকে সাহায্য করেছিলেন অর্জুন। তাতে খুশি হয়ে বরুণ অর্জুনকে দিয়েছিলেন গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণীর ও কপিধ্বজ রথ। কৃষ্ণকে দিয়েছিলেন চক্র ও গদা।

মহাভারতে বলা হয়েছে, উর্বশীকে দেখে কামনায় মিত্র-বরুণের শুক্রপাত হয়। সেই শুক্র থেকেই অগস্ত্য ও বশিষ্টের জন্ম হয়।

মহর্ষি উপথ্যের স্ত্রী ভদ্রাকে দেখে বরুণ কামনাপীড়িত হন ও অপহরণ করেন। উপথ্য ভদ্রাকে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন। বরুণ সেই অনুরোধ রক্ষা না

করায় উপথ্য সমস্ত জলরাশি পান করে ফেলেন। ভীত বরুণ তখন ভদ্রাকে ফিরিয়ে দেন।

বৈদিক সাহিত্যে আমরা দেখেছি—কখনও বরুণ ও ইন্দ্রকে এক, কখনও বা স্বতন্ত্র বলে কল্পনা করা হয়েছে। সব দেবতা-ই যে কল্পনা এ'সব কাহিনী তারই প্রমাণ।

স্বর্গের দেবতা বিষ্ণু-ই নারায়ণ। তিন প্রধান দেবতার অন্যতম। কাশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বিষ্ণুর জন্ম। বিষ্ণুর দুই-স্ত্রী—লক্ষ্মী ও সরস্বতী। পুত্র কামদেব। বিষ্ণুর নিবাস বৈকুণ্ঠে। বাহন গরুড়। বিষ্ণু ত্রিলোকের পালক। তিনি মধু ও কৈটভ নামের দুই দানবকে হত্যা করে তাদের মেদ থেকে মেদিনী বা পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন (বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ইতিহাস-ই পাল্টে দিলেন মুনি-ঋষিরা, নারায়ণের স্রষ্টারা)।

প্রলয়কালে সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় নারায়ণ রূপে তিনি যখন শেষনাগের উপর শুয়ে ছিলেন, তখন তাঁর নাভি থেকে একটি পদ্ম জন্ম নেয়। ওই পদ্ম থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি। বিষ্ণুর চারটে হাত। হাতগুলোতে রয়েছে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম দানবদের ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিষ্ণু অবতার হিসেবে জন্ম নিয়েছিলেন অবতাররা হলেন—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম এবং বুদ্ধ।

বুদ্ধই শেষ অবতার (নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধকেও ঈশ্বর বানিয়ে ছাড়লেন ধান্দাবাজ জাদু-পুরোহিতরা)। এই নয়টি জন্ম তাঁর হয়ে গেছে। কলিযুগে পাপে যখন পৃথিবী পূর্ণ হবে, তখন কল্কি অবতার হয়ে জন্ম নেবেন বিষ্ণু।

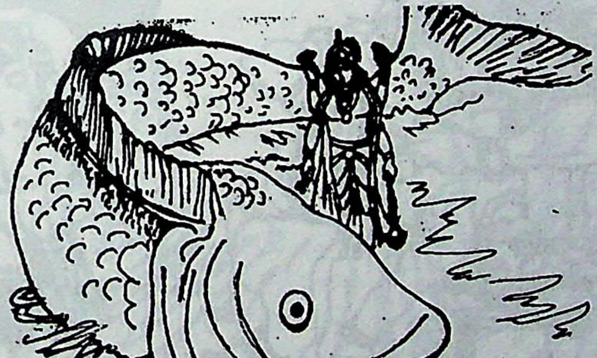

মৎস্য

কূর্ম

বরাহ

নৃসিংহ

বামন

পরশুরাম

রাম

বলরাম

বুদ্ধ

কল্কি

'আদিত্য' একজন দেবতার নাম নয়। আদিত্য হলেন বারো দেবতার নাম। কাশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বারোটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। অদিতির এই বারো পুত্র আদিত্য বা দ্বাদশ আদিত্য নামে পরিচিত। এই বারো আদিত্য হলেন—বিবস্বান, অর্যমা, পুষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র ও উরুক্রম।

কালিকা পুরাণে দ্বাদশ আদিত্যের কাহিনী আছে। তবে সেখানে বিধাতা বাদ। যুক্ত হয়েছে সোম-এর নাম।

ঋক্‌বেদের এক জায়গায় আমরা পাচ্ছি, অদিতি পুত্র আদিত্যের সংখ্যা বারো ছিল না। ছিল ছয়। তাঁরা যথাক্রমে মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশু।

তৈত্তিরীয়ে আট আদিত্যের কথা বলা হয়েছে। এঁরা হলেন, মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান।

শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—বারো আদিত্য হল বারো মাসের প্রতীক।

পুরাণ মতে সূর্য-ই আদিত্য। সূর্যের স্ত্রী সংজ্ঞা সূর্যের তেজ সহ্য করতে পারতেন না। সংজ্ঞা তাঁর দুঃখের কথা বাবা বিশ্বকর্মাকে জানালেন। বিশ্বকর্মা সূর্যের বা আদিত্যের তেজ কমাতে সূর্যকে বারো টুকরো করলেন। এই বারো সূর্যই বারো মাসে আকাশ পরিক্রমা করেন। বৈশাখের সূর্যের নাম তপন। জৈষ্ঠে ইন্দ্র। আষাঢ়ে রবি। শ্রাবণে গভস্তি। ভাদ্রে যম। আশ্বিনে হিরণ্যরেতা। কার্তিকে দিবাকর। অগ্রহায়ণে চিত্র। পৌষে বিষ্ণু। মাঘে অরুর। ফাল্গুনে সূর্য। চৈত্রে বেদজ্ঞ।

পূষণ বা পুষা সূর্যেরই একটি রূপ বলে বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত হয়েছে। ঋক্‌বেদে পুষাকে তুষ্ট করার মন্ত্রের উল্লেখ আছে। অনেক জায়গায় পুষা পূজিত হয়েছেন ইন্দ্র, ভগ ও সূর্য রূপে। এই ধর্মগ্রন্থগুলোয় আদিত্য নিয়েই কী গোলমাল? এ বলে

আমার কথা সত্যি, ও বলে আমার?

বেদের এইসব দেবতাদের অনেকেই একটু আদল পাল্টে বা সামান্য নাম পাল্টে রয়েছেন ইরানিয় ধর্মগ্রন্থ 'আবেস্তা'য়। মিত্র, বরুণ, সোম ও ইন্দ্র দেবতারা আবেস্তায় আছেন। 'মিত্র' আবেস্তায় 'মিথ্র' হয়েছেন। বরুণ ও আবেস্তার অসুর, একই ধরনের ক্ষমতা ও গুণের অধিকারী। ইরানিয়রাও অগ্নি পূজা করেন। আবেস্তায় 'মন্ত্র' হয়েছে 'মনথ্র', 'যজ্ঞ' হয়েছে 'যশ্ন', 'আহুতি' হয়েছে 'আযুইতি'। এমন মিলের যেন শেষ নেই।

যৌন-উশৃঙ্খলার পথ ধরে তন্ত্র

বৈদিক যুগের পুরুষরাই ছিল পরিবার ও সমাজের মাথা। তারা কামাসক্ত, বহুপত্নীক, অজাচারী ছিল। এইসব কামুক, অসদাচারী পুরুষদের পায়ের তলায় স্ত্রীদের পড়ে থাকতে বাধ্য করতে চেয়েছিল বৈদিক সমাজ। এই চাওয়াকে বাস্তব রূপ দিতে সে'সময়কার আইনি গ্রন্থ মনুসংহিতায় বিধান দেওয়া হয়েছে—পতি সদাচারহীন, পরস্ত্রীর সঙ্গে যৌন-সম্পর্কযুক্ত বা গুণহীন হলেও সতী স্ত্রী সেই পতিকে দেবতার মতই পুজো করবে। (৫ : ১৫৪)

বৈদিক যুগের দেবতারা ছিলেন সেই সমাজের-ই সৃষ্টি। ফলে ৩৩ কোটি দেবতার জন্য ৬০ কোটি বারবণিতা নিয়ে ছিল স্বর্গের সংসার। দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, সুপ্রিয়ার মত ৬০ কোটি কামকলা-পটিয়সী বারবণিতা ছিল। তারপরও দেবতারা অজাচারি ও ধর্ষক ছিলেন।

ব্রহ্মা নিজের মেয়ে শতরূপাকে দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারেননি। মনুসংহিতার রচয়িতা মনুর জন্ম ব্রহ্মা ও শতরূপার মিলন থেকে। মৎস্য পুরাণে এমনটাই লেখা হয়েছে।

উষার কথায় আমরা আগেই এসেছি। উষা হলেন প্রজাপতি কন্যা। প্রজাপতি উষার রূপে কামাসক্ত হন এবং মিলিত হতে চান। তখন উষা মৃগীরূপ ধারণ করেন। প্রজাপতি মৃগরূপ ধারণ করে মিলিত হন। (মৈত্রায়নি সংহিতা ৪/২/২২)

সম্ভবত উষা ও প্রজাপতি পশুদের মৈথুনের উত্তেজনা উপভোগ করতে পশুর মত মিলিত হয়েছিলেন। এমনটা ভাবার কারণ, তখন পশুর মত করে মিলিত হওয়া এবং স্ত্রী-পশুকে মৈথুন করার উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে আছে। আছে মনুসংহিতাতেও।

ইন্দ্র থেকে কৃষ্ণ প্রত্যেকেই ছিলেন কামপ্রিয়। রামায়ণ অনুসারে ইন্দ্র গৌতম ঋষির স্ত্রীকে প্রতারিত করে সঙ্গমে লিপ্ত হন গৌতমের ছদ্মবেশ ধারণ করে। জলন্ধরের স্ত্রী বৃন্দা ও শঙ্খচূড়ের স্ত্রী তুলসীকে প্রতারিত করে বিষ্ণু তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

সপ্তর্ষির সাত স্ত্রীকে দেখে অগ্নি কামার্ত হয়ে পড়েন। সপ্তর্ষিরা হলেন মারীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ। তাঁদের স্ত্রীরা হলেন যথাক্রমে কলা, অনসূয়া, ক্ষমা, হবির্ভূ, সন্নতি, শ্রদ্ধা ও অরুন্ধতি।

চন্দ্র দক্ষের সাতাশটি মেয়েকে বিয়ে করে এবং ৬০ কোটি অপ্সরা নামের বারবণিতাদের নিয়ে ফস্টি-নস্টি করেও তাঁর বিকৃত কামের আগুন নেভাতে পারেন না। দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারার রূপে এমন-ই কামনাতাড়িত হলেন যে, সমস্ত নীতি ভুলে গুরুপত্নীকে অপহরণ করলেন। একে কী বলবো? ধর্ষণ! এর পরিণতিতে যে সন্তান হয়, তার নাম বুধ।

পদ্মপুরাণ অনুসারে (৫/৩১/১৪) শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী'র সংখ্যা ষোল হাজার একশো। এরা সকলেই গোপবালা ছিলেন না। নানা দেশ থেকে এইসব সুন্দরীদের অপহরণ করে এনে নিজের 'হারেমে' পুরেছিলেন। এই প্রতিটি সুন্দরীর যৌবনই তিনি ভোগ করতেন। ভাবা যায়!

'শামান' বা জাদুপুরোহিতদের মুনি, ঋষি ইত্যাদি বলা হত — সে'কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এইসব জাদু-পুরোহিতরা কাম-ক্রোধ ইত্যাদির ঊর্ধ্বে ছিলেন না।

পান থেকে চুন খসলে মুনি, ঋষিরা রাগে কাঁপতে কাঁপতে শাপ দিতেন। বিয়ে করতেন। তারপরও রাজাদের আমন্ত্রণে হাজির হতেন রানিদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে। সুন্দরী অপ্সরা বা বারবনিতা দেখলে এতই উত্তেজিত হতেন যে রেতঃপাত হয়ে যেতো।

এইসব জাদু পুরোহিতরা বিয়ে করতেন প্রচুর সম্পদ যৌতুক নিয়ে। অর্থাৎ কামনা বাসনা ত্যাগ করার কোনও লক্ষ্মণ তাঁদের জীবনচর্চায় দেখা যেত না। তবে তাঁরা ভোগজীবনের ঊর্ধ্বে—এমন একটা মুখোশ পরে থাকতেন। যেটাকে সোজা কথায় বলে ভণ্ডামী। সেই ভণ্ডামীর ট্রাডিশন-ই কী আমরা আজও বহন করে চলেছি?

রাজা থেকে সাধারণ মানুষ, দেবতা থেকে ঋষি সব্বাই বেদের যুগে যৌন-উচ্ছৃঙ্খলায় মত্ত ছিলেন। বৈদিক সাহিত্য এ কথাই বলে।

এ'সবই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয় বৈদিক সমাজের দুটি বৈশিষ্ট্যকে। এক : যৌন-শক্তিধর হওয়াটা প্রধান একটি গুণ হিসেবে গণ্য হত। বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদ ডঃ অতুল সুরের কথায়, "মৈথুন ধর্মটাই সেকালের সনাতন ধর্ম ছিল।" (দেবলোকের যৌনজীবন, ডঃ অতুল সুর, প্রথম সংস্করণ পৃষ্ঠা ৬২) দুই : বৈদিক জাদু পুরোহিতরা প্রাক-বৈদিক যুগের মাতৃপ্রাধান্যের শিকড় সমাজ

থেকেউপড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। মেয়েদের মৈথুন-যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তাই ব্রহ্মার বাণী বলে প্রচার করা হয়েছে—নারীরা পুরুষদের মৈথুনের জন্যই সৃষ্ট। তোমরা মৈথুন কর্ম চালিয়ে যাও। প্রজা উৎপাদন কর। তাতেই আমি তুষ্ট।

পুরুষদের বহুবিবাহ, বউয়ের থেকে বরের বয়স অনেক বেশি হবার প্রথা, সতীদাহ, বৈধব্যজীবনকে সব সুখ থেকে সরিয়ে রেখে ক্ষয়ের মধ্য দিয়ে শেষ করার প্রথা, দেবতাজ্ঞানে পতি সেবার নীতি—এ'সবই বৈদিক সমাজ চাপিয়ে দিল। কিন্তু এত কিছুর পরও মাতৃপ্রধান্যের সমস্ত স্মারক ধুয়ে মুছে সাফ করতে পারেনি বৈদিক সমাজপতিরা।

বৈদিক যুগে সমাজে যৌন-উশৃঙ্খলা ছিল। প্রবলভাবেই ছিল। সুতরাং বৈদিক সমাজ যে নারী পুরুষের মিলনের মধ্যে ব্রহ্মকে খুঁজে পাবার নামে নারীদেহ খুঁজে বেড়াবে—এমনটাই ছিল অনিবার্য। হরপ্পা যুগের উর্বরতামূলক জাদু বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ছিল স্বাভাবিক পরিণতি। জাদু বিশ্বাসকে তন্ত্রের রূপ দিয়েছিল বৈদিক জাদু-পুরোহিতরাই।

হরপ্পা যুগের জাদু বিশ্বাস ছিল সামাজিক, প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হত। বৈদিক যুগে তা হল গুহ্য বা গোপন সাধনার বিষয়। সহজ-সরল নারী-পুরুষের মিলনে যুক্ত হল ভণ্ডামী। ধর্মের নামে বিকৃতকামীদের ভণ্ডামী।

সাংখ্য ও দেহতত্ত্ব

'সাংখ্য' মতবাদের প্রবর্তক কপিল মুনি, একথা আমরা আগেই জেনেছি। এও জেনেছি সাংখ্য ভারতবর্ষের প্রাচীনতম দর্শন হিসেবে বহু পণ্ডিতদের দ্বারা স্বীকৃত। সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী—এও আমরা জানি। সাংখ্য বেদ বিরোধী, মনু বিরোধী, কার্য-কারণ সম্পর্কে বিশ্বাসী অসাধারণ এগিয়ে থাকা একটি মতবাদ। কিন্তু যে কথা আগে আলোচনা করা হয়নি, তা হল সাংখ্য দুটি পরম সত্তাকে স্বীকার করে। এক : পুরুষ, দুই : প্রকৃতি বা নারী। বিষয়টি নিয়ে একটু ছোট করে আলোচনা করে নিই আসুন।

সাংখ্য বৈদিক সাহিত্য হলেও বেদ বিরোধী এবং বস্তুতান্ত্রিক মতবাদ এতো আগেই বলেছি। সাংখ্য মতে দুই-পরম সত্তা পুরুষ ও প্রকৃতি কেউ কারও উপর নির্ভরশীল নয়। দুই সত্তাই স্বনির্ভর। পুরুষ হল চৈতন্যস্বরূপ। জাগতিক সব কিছুর উর্ধ্বে। দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তু মানে ভোগ্য বস্তু ভোগ করে চৈতন্যময় আত্মা বা পুরুষ। পুরুষ এই প্রকৃতিজাত বস্তুর ভোক্তা। চৈতন্যময় আত্মা পরমাত্মার কোনও অংশ নয়। পরমাত্মার সঙ্গে যুক্তও নয়। যত দেহ তত আত্মা। তাই এক আত্মা যখন সুখ ভোগ করে, তখন আর এক আত্মা দুঃখ ভোগ করছে। পরমাত্মার অংশ হিসেবে আত্মা যদি সব দেহে বিরাজ করতো, তাহলে সব আত্মাই একই সঙ্গে সুখ বা দুঃখ ভোগ

করতো। একই সঙ্গে ঘুমতো বা জেগে থাকতো। যেহেতু প্রত্যেকের আত্মাই ভিন্ন, কোনও পরমাত্মার অংশ নয়,তাই ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্যময় পুরুষের ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

প্রকৃতি হল শাশ্বত, চিরন্তন। জগতের সব কিছুর সৃষ্টির মূল কারণ। পুরুষের ভোগের উদ্দেশ্যেই প্রকৃতির সৃষ্টি।

সাংখ্যে প্রকৃতিকে জড় ভাবার পরও তাকেই সৃষ্টির মূল কারণ বলা হয়েছে। আবার প্রকৃতিকে নারী রূপে কল্পনা করা হয়েছে (সাংখ্যসূত্র ৩, ৬৮)।

সাংখ্য বলছে— যেমন স্ত্রী-পুরুষের মিলনে সন্তান জন্মায়, তেমনই প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনেই সবের সৃষ্টি (সাংখ্যকারিকা ২১)।

সাংখ্য অনুসারে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুরুষের একটা ভূমিকা আছে বটে, কিন্তু পুরুষের ভূমিকা নিষ্ক্রিয়।।

পুরুষের বীজ থেকেই যখন সৃষ্টি, তখন প্রকৃতি বা নারীকে সক্রিয় এবং পুরুষকে নিষ্ক্রিয় বলার কারণ কী? পুরুষকে সাংখ্য এভাবে চিত্রিত করায় শঙ্করাচার্য প্রশ্ন তুলেছিলেন।

সাংখ্যের এমন ভাবনার পিছনের সম্ভাব্য কারণ এমনটাও হতে পারে—

১৮৭১-এর ভারতবর্ষের জনগণনার হিসেবটার দিকে প্রথমে একটু চোখ রাখি আসুন। সেখানে দেখানো হয়েছিল ১৮৬০ লক্ষ ভারতীয়দের মধ্যে আর্য বংশীয় উচ্চবর্ণের মানুষ ১৬০ লক্ষ। অর্থাৎ মোট ভারতবাসীর প্রায় ৯ শতাংশ মাত্র। বাকিরা অ-আর্য। শুধু ট্রাইবালদের অর্থাৎ উপজাতির সংখ্যাই ছিল আর্য-বংশীয়দের চেয়ে বেশি। সংখ্যাটা ১৮০ লক্ষ।

এই হিসেব থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, এদেশে যখন আর্যভাষীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তখন অ-আর্যভাষীদের সংখ্যা ছিল আরও বেশি। অ-আর্য রমণীদের অপহরণ করেই আর্যভাষীরা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়ে ছিল। সুতরাং আর্য সাহিত্যের যুগে ভারতীয়দের মধ্যে আর্যভাষীদের সংখ্যা যে ১৮৭১ সালের তুলনায় আরও কম ছিল এটা বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না।

অ-আর্যভাষীদের সমাজে নারী প্রাধান্য বেশি ছিল, এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। সাংখ্য রচয়িতারা আর্যভাষী হলেও তাঁদের চোখের সামনে নারীতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে উপস্থিত ছিল। মাতৃপ্রধান সমাজে পরিবারের প্রধান মা। বাবার অবস্থান বহিরাগতের মতো। সন্তানরা মায়ের বংশ পরিচয়ে পরিচিত হত। নারীদের যৌন স্বাধীনতা ছিল। সাধারণভাবে সন্তানের জন্মদাতা'কে চিহ্নিত করা মা ছাড়া কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে মাতৃবংশধারার পাশাপাশি মাতৃকেন্দ্রিক উত্তরাধিকার রীতি প্রচলিত ছিল। পিতার সন্তান উৎপাদনে ভূমিকা থাকলেও স্ত্রী ও পরিবারে তার ভূমিকা নেহাতই নিষ্ক্রিয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রীর ভূমিকা যেমন সন্তান উৎপাদন ছাড়া নিষ্ক্রিয়।

সে সময় অ-আর্যভাষীদের মধ্যে দেবতাদের চেয়ে দেবী পূজার প্রচলন ছিল বেশি। দেবতা বলতে প্রধান ছিলেন শিব। শিবের লিঙ্গকে সৃষ্টি বীজের উৎস হিসেবে পুজো করা হত। একই সঙ্গে যোনিরও পুজো হত। বরাহপুরাণে দুর্গাকে কিরাত রমণী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শবররা শিকারজীবী উপজাতি। শিবও উপজাতিদের দেবতা। চামার সম্প্রদায়ের প্রধান দেবী 'ধরতি মাতা'। ভীলদের প্রধানা দেবী 'মাতা'। রাজস্থানের উপজাতিদের দেবীরা হলেন—অন্নপূর্ণা, শাকম্ভরী, মাতাজননী। এইসব হিন্দুদেবীদের নাম হিন্দু উপাসনা ধর্মের প্রভাবের ফল। প্রাচীন দেবীরাই নতুন নামে পরিচিতা হয়েছেন। রাজস্থানের দেবী গৌরী, ইনি শস্যদেবী। পাঞ্জাব, রাজস্থান ও গুজরাটে পুজো পান দেবী ভবানী ও দেবী শীতলা। বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের পুজো পান প্রধানত দেবীরা। এঁরা হলেন 'সর্না বুড়ি', 'চণ্ডা', 'ঠাকুরানী মা', 'কালী', 'জ্বালামুখী', 'ডাকিনী', 'অঙ্গারমতী', 'বুড়িয়া মাঈ', 'বনসুরী দেবী', 'নাগিনী মাতা', 'মনসা মাতা', 'দিদিঠাকরুণ' ইত্যাদি। দক্ষিণভারতে দেবীর সংখ্যা আরও বেশি। হ্যাঁ দেবীর সংখ্যা। দেবতারা তুলনায় খুবই সংখ্যালঘু। এইসব দেবীদের নামের পিছনে 'আম্মা' অর্থাৎ 'মা' শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণেই সমাজে দেবের চেয়ে দেবীর প্রভাব বৈদিক যুগে ছিল আরও বেশি।

সাংখ্য রচয়িতারা সমাজের চারপাশের মাতৃপ্রাধান্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অ-আর্যভাষীদের উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাস, কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত নারী-পুরুষ মিলনের জাদুবিশ্বাসও প্রভাব ফেলেছিল।

লিঙ্গ ও যোনি পুজোর মধ্যে দার্শনিক যৌন-দ্বৈতের ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন সাংখ্য রচয়িতারা। তাঁরা নারী-পুরুষের মিলনের মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনকে খুঁজে পেয়েছিলেন। সাংখ্যের এই তত্ত্বের উপরই দাঁড়িয়ে আছে যোগ ও তন্ত্র।

যোগদর্শন

যোগ দর্শনের স্রষ্টা পতঞ্জলি নামের এক জাদু পুরোহিত। তিনি ১৯৪টি সূত্রে যোগধারাকে সংগ্রহ করে তুলে ধরেছিলেন। পতঞ্জলি তাঁর রচনার বহু পরিভাষিক শব্দার্থ বৌদ্ধতন্ত্র থেকে নিয়েছিলেন। যোগ দর্শনের সঙ্গে সাংখ্য দর্শনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যোগদানকে 'সাংখ্য-পরিশিষ্ট' বলা হয়। যোগ দর্শনের স্রষ্টা ও টীকাকাররা মনে করেন, যোগ দর্শনই সাংখ্য দর্শনকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে।

যোগীশ্বর যাজ্ঞবাল্ক্য যোগের আটটি অঙ্গের কথা বলেছেন, যা 'যোগাঙ্গ' নামে

খ্যাত। এগুলো হল (১) 'যম' অর্থাৎ কতকগুলো নিষেধ, (২) 'নিয়ম' অর্থাৎ পালনীয় বিধান, (৩) 'আসন' অর্থাৎ কিছু দৈহিক ব্যায়াম পদ্ধতি, (৪) 'প্রাণায়ম' অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, (৫) 'প্রত্যাহার' বিষয় চিন্তা থেকে ইন্দ্রিয়কে তুলে নেওয়া, (৬) 'ধারণা' অর্থে একাগ্রতা, (৭) 'ধ্যান' বা কোনও একটি বিষয়ে চিন্তাকে গভীরভাবে স্থাপন করা, (৮) 'সমাধি' বাহ্যজ্ঞানহীন ধ্যান।

যোগ বিশ্বাস করে, যোগাঙ্গের আসন, প্রাণায়ম, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি দ্বারা বহু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়। আর অষ্টাঙ্গ সিদ্ধ হলে তো কথাই নেই।

যোগ সিদ্ধ হলে কী কী হয় বলার চেয়ে বলা ভালো, কী না হয়?

'খেচরী মুদ্রা' একটি যোগাসন পদ্ধতি। বলা হয়েছে খেচরী সাধনের দ্বারা ব্যাধি, জরা, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণাকে জয় করা যায়। মৃত্যুকে জয় করে অমর হওয়া যায়। 'যায়' তো দৃষ্টান্ত কোথায়?

না, কোথাও নেই।

'খেচরী মুদ্রা' শেখানো হয়েছে যোগের আকর গ্রন্থগুলোতে। জিভকে ভিতর দিক দিয়ে ঠেলে দুই ভ্রু'র ভিতরের দিকে দু'দণ্ড রাখতে পারলেই সিদ্ধি লাভ। না, সঙ্গে কোনও মন্ত্র মনে মনেও আওড়াতে হবে না।

মহামুদ্রা সাধনে যক্ষা ও কুঠে রোগের বিনাশ হয়। শীতল কুম্ভক আসন করলে প্লীহা ও উদররোগ, জ্বর, পিত্তবিকার বিনাশ হয়। এই আসনের বাড়তি গুণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা থাকে না। বিষাক্ত সাপ শরীরে বিষ ঢাললেও তা কাজ করে না। কোনও যোগী রাজি হবেন নাকি এমন একটা পরীক্ষা দিতে? আসলে এইসব যোগীরা যা বলেন, তাতে নিজেরাই বিশ্বাস করেন না।। তাই পরীক্ষা দেবার মত একজন যোগীও এগিয়ে আসবেন না, জানি। শীতল কুম্ভক অবশ্য খুবই সোজা আসন। জিভকে দু'ঠোঁটের মাঝে রেখে ঠোঁট ও জিভ পাখির ঠোঁটের মত করতে হবে। এবার জিভের ফাঁক দিয়ে বায়ু টানতে হবে। বায়ু ছাড়তে হবে নাক দিয়ে ধীরে ধীরে।

কামদেব তুল্য রূপলাবণ্য লাভের উপায়ও আছে যোগের আকরগ্রন্থে। আসনটার নাম 'সীৎকারী কুম্ভক'। সব কিছুই শীতল কুম্ভকের মতো। শুধু বায়ু টানার সময় 'সীৎ' ধরনের শব্দ করতে হবে। সীৎকারী কুম্ভকের বাড়তি গুণ—আলস্য, ক্ষুধা, তৃষ্ণা থাকে না। অষ্টাঙ্গ সিদ্ধ হলে ত্রিলোক ভ্রমণ করা যায়।

মহাদেবের নির্দেশিত দশটি মুদ্রা আয়ত্ত করতে পারলে ইচ্ছে মতো শরীরকে পরমাণুর মতো সূক্ষ্ম আকারে নিয়ে যাওয়া যায়। আকাশে ভ্রমণ করা যায়। ইচ্ছে মতো যে কোনও ক্ষমতা লাভ করা যায়।

শিব বা আদিনাথ অর্থাৎ মহাদেব চুরাশি রকমের আসনের কথা বলেছেন। তার মধ্যে চারটি আসন 'সারস্বরূপ' অর্থাৎ প্রধান। আসনগুলো হল—সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, সিংহাসন ও ভদ্রাসন।

মুদ্রার মধ্যে খেচরী ও শব্দ উৎপাদনের মধ্যে 'নাদ' বা নাভী থেকে তুলে আনা শব্দকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

নাসনং সিদ্ধসদৃশ্যং কুম্ভ কেবলোপমঃ।
না খেচরীসমা মুদ্রা না নাদসদৃশো তনয়ঃ।।৪০

নাদধ্বনি নিয়ে একটি প্রচলিত ধারণা শিকড় গেড়ে রয়েছে বিশেষ করে নায়ক, অভিনেতা ও হিন্দু উপাসনা-ধর্মের 'পণ্ডিত'দের মধ্যে। নাদধ্বনি অর্থাৎ নাভি থেকে ধ্বনিকে তুলে আনতে পারলে তা গভীর ও লা-জবাব হয়। 'ওঁ' ধ্বনিকে নাভি থেকে তুলে এনে উচ্চারণ করলে ব্রহ্ম লাভ হয়। শব্দ থেকে ব্রহ্ম লাভ হয় বলেই 'শব্দ পরম ব্রহ্ম' বলা হয়।

নাদধ্বনি নিয়ে অনেক ভাল ভাল কথা চালু রয়েছে, সঙ্গে রয়েছে গোড়ার গলদ। আসলে নাভি বা পেটে যে বায়ু থাকে, তাকে কখনই স্বর-নালিতে আনা যায় না। পেটের বায়ু শুধু পায়ু দিয়েই বের হতে পারে, যাকে আমরা বলি 'পাদ'।

এটাই শরীর বিজ্ঞানের কথা। আমরা কথা বলার সময় স্বরযন্ত্র দিয়ে যে বায়ু বের হয়, তা আসে ফুসফুস থেকে। উদ্গার উঠে আসে কণ্ঠনালি দিয়ে। স্বরনালি ও কণ্ঠনালি এক নয়। নাদধ্বনির মিথ্যে কতদিন যে সত্যিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে আমাদের মাথায় চেপে থাকবে কে জানে? আমরা কবে যে 'সবজান্তা'র ভণ্ডামী ছেড়ে সত্যি জানতে আগ্রহী হবো, কে জানে?

শুক্র বা বীর্য সম্পর্কে যোগ

"চিত্তায়ত্তং নৃণাঃ শুক্র শুক্রায়ত্তং চ জীবিতম্।
তস্মাচ্ছুক্রং মনশ্চৈব রক্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ।।"

অর্থাৎ, "মানুষের জীবন শুক্রের অধীন। শুক্র ক্ষয় হলেই জীবন ক্ষয়। অতএব সাধক যত্ন সহকারে শুক্র রক্ষা করবে।" শুক্র সম্পর্কে এমন যোগ-শিক্ষা বিজ্ঞান বিরোধী এবং অবশ্যই অশিক্ষা।

আমি এমন অনেক পুরুষের সমস্যার কথা শুনেছি, যাঁরা বিবাহিত, কিন্তু মিলনে অক্ষম। লিঙ্গে স্ফীতি বা দৃঢ়তা আসে না। এই ধরনের অক্ষমতার পিছনে নানা কারণ থাকতে পারে। তার জন্য নানা প্রশ্ন করতে হয়। যেমন :—

(১) সমস্যাটা বিয়ের আগেই ছিল? নাকি বিয়ের পর হয়েছে?
(২) স্ত্রীর সঙ্গে বয়সের পার্থক্য কেমন?

(৩) স্ত্রীর সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক কেমন?

(৪) স্ত্রীকে পছন্দ করেন কি না?

(৫) স্ত্রীর তুলনায় নিজেকে ছোট মাপের মানুষ মনে করেন কি না?

(৬) সমকামী ছিলেন বা আছেন কি না?

(৭) অজাচারে লিপ্ত আছেন কি না?

(৮) নারী-পুরুষের মিলন বিষয়ে কোনও ঘৃণা আছে কি না?

(৯) ড্রাগে আসক্ত কি না?

(১০) কিডনির কোনও অসুখ আছে কি না?

(১১) ব্লাড-সুগারের পেসেন্ট কি না?

(১২) হস্তমৈথুন বা স্বপ্নদোষ বিষয়ে রোগীর ধারণা?

(১৩) বীর্যপাতে শরীর ক্ষয়—এ'কথায় বিশ্বাস করেন কি না?

প্রায় সকলেরই উত্তর—তাঁরা বিশ্বাস করেন হস্তমৈথুনে, স্বপ্নদোষে অথবা কোনওভাবে বীর্যক্ষয় হওয়া মানেই শরীর-স্বাস্থ্য-স্মৃতি নষ্ট হওয়া। এসবই তাঁরা জেনেছেন স্বামীজীদের লেখা যোগের কোনও বই পড়ে, অথবা স্কুলের টিচার বা জিমের ইনস্ট্রাকটারের কাছ থেকে। আমাদের সময়েও ব্যায়াম সমিতির ইনস্ট্রাকটররাও এমন সব বিজ্ঞান-বিরোধী হিজিবিজি উপদেশ দিতেন। আমরাও এক সময় ভাবতাম—সত্যিই বুঝি চল্লিশ দিনে এক ফোঁটা বীর্য তৈরি হয়।

এইসব সাময়িকভাবে পুরুষত্বহীন রোগীদের বোঝাতে হয়েছে, স্বামীজীদের বীর্য সম্পর্কে বক্তব্য সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-বিরোধী।

**হস্তমৈথুন বা স্বপ্নদোষ যৌবনের স্বাভাবিক ঘটনা, যেমন স্বাভাবিক ঘটনা বিবাহিত জীবনে গড়ে ওঠা যৌন সম্পর্ক।
বীর্যপাতের কিছুক্ষণের মধ্যেই বীর্যভাণ্ড আপনা থেকেই পূর্ণ হয়ে যায়।**

অতি মাত্রায় হস্তমৈথুন থেকে যৌন-বিকার আসতে পারে। পরিমিতি রেখে যৌন মিলন যেমন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিরই প্রকাশ, তেমন স্বমৈথুনও মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিরই অঙ্গ।

মেয়েদের মধ্যেও হস্তমৈথুন বা স্বমৈথুন সহজাত প্রবৃত্তির-ই প্রকাশ। যা স্বাভাবিক তাই সুন্দর। পরিবর্তে একে অস্বাভাবিক, নোংরা ব্যাপার, গোপন করার ব্যাপার, চেপে রাখার বিষয় বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা শুধু মূর্খ নয়, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে চাপতে শিখিয়ে মানসিক রোগী তৈরির অপরাধেও অপরাধী। এইসব বিকৃতকাম ভণ্ডদের আমরা যতদিন পুজো করবো, ততদিন এই জাতির অগ্রগামীতার কথা চিন্তা করাও বোকামি।

যোগ ও কুলকুণ্ডলিনী

'যোগ' হল তন্ত্র সাধনার এক রহস্যময় পথ। যোগী পতঞ্জলি যোগের প্রণেতা। ঋষি বেদব্যাস এই যোগের ভাষ্যকার। এইসব যোগীরা অনাদিনাথ বা শিবকেই যোগ বিদ্যায় উপদেশ দানকারী বলে উল্লেখ করেছেন। শিবই চুরাশি রকমের আসনের শিক্ষা দিয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান যোগসাধনের গুণগান গেয়েছেন। গীতায় যোগ মাহাত্ম আছে। অতএব, হিন্দু-'উপাসনা' ধর্মে বিশ্বাসীদের কাছে প্রশ্নাতীত পরম সত্য হল 'যোগ'।

মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগের উপায়ের নাম যোগ। এইজন্য কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত করার কথা বলা হয়েছে যোগে।

যোগ মতে 'কুণ্ডলিনী' শক্তিকে জাগ্রত করতে যোগীকে 'ষটচক্র' ভেদ করতে হয়। যোগ বা তন্ত্রশাস্ত্র বিশ্বাস করে প্রতিটি মানব দেহে ছটি চক্র আছে। চক্র ছটির অবস্থান গুহ্যে, লিঙ্গমূলে, নাভিতে, হৃদয়ে, কণ্ঠে ও ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে। ছ'টি চক্রের নাম গুহ্যে মূলাধারচক্র থেকে পর্যায়ক্রমে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও জ্ঞানচক্র। মস্তিষ্কে আছে সহস্রদল পদ্ম। যোগের বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মূলাধারচক্র কে একের পর এক ছটি চক্র ভেদ করে কুণ্ডলিনী শক্তিকে মস্তিষ্কে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মাথার খুলির নীচে রয়েছে সহস্রদল পদ্ম কুঁড়ি। কুঁড়ির

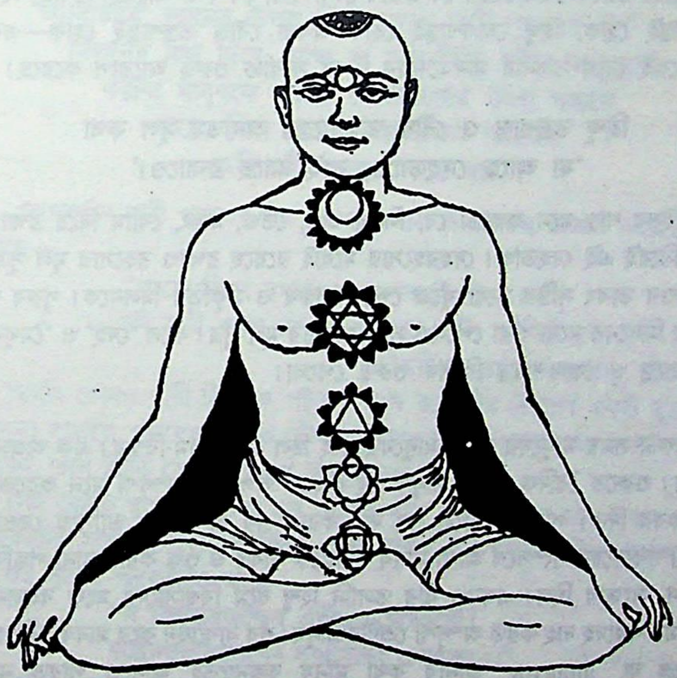

ওপর ফণা মেলে থাকে সাপ। যার লেজ রয়েছে গুহ্যে যোগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে, বা বলতে পারি তন্ত্র প্রক্রিয়ার সাহায্যে সাপের ফণাটি সরিয়ে দিতে সক্ষম হলেই মস্তিষ্কে হাজারটা রঙিন পাপড়ি মেলে ফুটে উঠবে পদ্ম। এই যে সাপ বা মহাশঙ্খিনীশক্তি, ইনিই মহামায়া, মহাশক্তি। পদ্মের কর্ণিকা বা বীজকোষে রয়েছেন ব্রহ্মস্বরূপ শিব।

ষট্চক্র ভেদ করে সাপের ফণা সরিয়ে মস্তিষ্কের সহস্রদল পদ্মকে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই নাকি ঘটবে ব্রহ্মদর্শন, মিলবে চির আনন্দ, মিলবে মোক্ষ।

প্রাক্-আর্য বা প্রাক্-বৈদিক যুগে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো থেকে যে সব সিল ও মূর্তি পাওয়া যায় তাতে সে সময় যে যোগসাধনা ছিল, তা বোঝা যায়। বৈদিক যুগে প্রথম দিকে যোগের প্রতি বিরূপতা থাকলেও পরবর্তীকালে যোগসাধনা বা যোগদর্শন বৈদিক শাস্ত্রে গৃহীত হয়। পতঞ্জলির 'যোগসূত্র' ষড়দর্শনের অন্যতম দর্শন হিসেবে গণ্য হয়। পতঞ্জলি তাঁর সূত্রে যোগ শক্তির মহিমা কীর্তন করেছেন। যোগ সিদ্ধিতে বা যোগ বিভূতিতে নাকি পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর ভাষা-জ্ঞান লাভ হয়, নিজেকে অদৃশ্য করা যায়, খিদে ও তৃষ্ণা নিবারণ করা যায়, আকাশে ভ্রমণ করা যায়, অন্যের দেহে প্রবিষ্ট হওয়া যায়, সর্বজ্ঞ হওয়া যায়, ইষ্ট-দেবতার সঙ্গে মিলিত হওয়া যায়। পতঞ্জলির যোগে বৌদ্ধতন্ত্রের যে প্রভাব দেখা যায়, সে কথা আগেই বলেছি। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রই হোক, হিন্দু যোগশাস্ত্রই হোক অথবা বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রই হোক—এরা প্রত্যেকেই যোগ সাধনায় মানবদেহের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র ও বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রের অন্যতম মূল কথা 'যা আছে দেহভাণ্ডে, তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে।'

এইসব শাস্ত্র মনে করতো যে, ক্ষিতি অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড তাই নিয়েই এই দেহভাণ্ড। দেহরহস্যের মধ্যেই রয়েছে ব্রহ্মাণ্ড রহস্যের মূল সূত্র। ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ সৃষ্টির মধ্যে খুঁজে পেলো পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনকে। পুরুষ ও নারীর মিলনের মধ্যে ওঁরা পেলেও সৃষ্টি রহস্যের মূল সূত্র। ফলে 'দেহ' ও 'মৈথুন' তন্ত্র-শাস্ত্রে ও যোগ-শাস্ত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেলো।

একটা সময় মানুষের কাছে মানুষের দেহ ছিল এক পরম-বিস্ময়। এক অজানা বিস্ময়। শুরুতে বৈদিক যুগের মানুষ শব দেহকে অপবিত্র, অস্পৃশ্য মনে করতো। শব কবর দিত। পরবর্তী কালে শব দাহ করার পর বা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হতো। শবদেহের সংস্পর্শে আসা মানব শরীরকে পবিত্র ও শুদ্ধ করার নানা পদ্ধতি, প্রকরণ, সংস্কার ছিল। এখনও যার তলানি হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীদের মধ্যে বহমান। সে সময় শবদেহ দাহ করত অস্পৃশ্য শ্রেণীর মানুষ। শব ব্যবচ্ছেদ করে মানব শরীরের গঠনতন্ত্র বা anatomy জানার কথা মানুষ কল্পনাতেই আনতে পারত না।

মানবদেহের 'অ্যানাটমি' বর্ণনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ঋষি ও যোগীরা। তাঁরা নাকি যোগবলে মানব শরীরের ভিতরে ঢুকে 'অ্যানাটমি' দেখে এসে, শরীরে ছটি চক্রের অবস্থান ও সেই চক্রগুলির মধ্যে নানা দেব-দেবীদের অবস্থান, মাথার খুলির নীচে হাজার পাপড়ির পদ্মফুল এবং একটা সাপের অবস্থান বর্ণনা করেছিলেন। কেউ এই 'অ্যানাটমি' বর্ণনার মধ্যে রূপক আবিষ্কারের চেষ্টা করলে তাকে আমরা অবশ্যই যোগের অ-আ-ক-খ না জানা মূর্খ বলে চিহ্নিত করে করুণা প্রদর্শন করতে পারি মাত্র। কারণ তন্ত্রশাস্ত্রের যে কোনও বই গভীরভাবে পড়লেই দেখা যাবে মানব শরীরে অ্যানাটমি বলে তাঁরা যা বলে গেছেন বা লিখেছিলেন, সেগুলো সত্যি বলেই বিশ্বাস করতেন এবং এখনও করেন। এর মধ্যে রূপক সৃষ্টির কোনও চেষ্টা আদৌ ছিল না। তাঁদের এই বিশ্বাস এসেছিল অসম্পূর্ণ জ্ঞান বা অজ্ঞতা থেকে। তাঁরা হয়তো বা কোনওভাবে মানুষের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ বা ঘিলু দেখেছিলেন এবং ঘিলু দেখে হাজার পাপড়ির পদ্মের 'অস্তিত্ব' খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁরা হয়তো মৃত মানুষের অন্ত্র নিয়ে কুকুর বা শিয়ালের টানাটানি দেখেছিলেন। অন্ত্রের সঙ্গে সাপের চেহারাগত মিল থাকায় মানব দেহে সাপের অবস্থান আছে—এমনটাই বিশ্বাস করেছিলেন।

'যোগ' দর্শনটাই দাঁড়িয়ে আছে মানবদেহের সম্পূর্ণ ভুল গঠনতন্ত্র বা 'অ্যানাটমি' জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে। নারী-পুরুষের দীর্ঘ দেহ মিলনের মধ্য দিয়ে মোক্ষ বা সাধনসিদ্ধি ঘটার অদ্ভুতুড়ে কল্পনা মানুষকে চূড়ান্ত যৌনভোগের নেশা ধরাতে পারে, কিন্তু কোনও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী করতে পারে না।

যোগদর্শনে নারী পুরুষের দীর্ঘ মিলনের নানা উদ্ভট তত্ত্ব দেওয়া আছে। বলা আছে—

"পুংসো বিন্দুং সমাকুঞ্চ্য সম্যগভ্যাসপাটবৎ।
যদি নারী রজো রক্ষেদ্ বজ্রোল্যা সাপি যোগিনী।।"

('নারীনাং, ব্রজাসাধনফলম্', হটযোগ)

অর্থাৎ কোনও নারী ঠিকঠাক পটুতার সঙ্গে বজ্রোলীর (বিশেষ একটি মুদ্রা বা আসন) সাহায্যে পুরুষের বিন্দুকে (বীর্যকে) টেনে নিয়ে নিজের রজঃ রক্ষা করতে পারেন, তবে তিনি যোগিনী (বলে গণ্যা) হন।

সেই বৈদিক যুগে মনে করা হত শুক্রের সঙ্গে রজঃ মিলিত হলে সন্তান হয়। শুক্রকীটের সঙ্গে ডিম্বকোষের মিলন থেকে জন্ম—এই বিজ্ঞান ছিল অজানা।

ওই সূত্রের পরবর্তীতে আছে—

"স বিন্দুস্তদ্রজশ্চৈব একীভূয় স্বদেহগৌ।
বজ্রোল্যভাসযোগেন সর্ব্বসিদ্ধিং প্রযচ্ছতঃ।।"

অর্থাৎ বিন্দু ও রজঃ এক হয়ে সর্বপ্রকার সিদ্ধি দান করে।

পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়ে পুরুষের সঙ্গে দীর্ঘ-মিলন দ্বারা পুরুষের বীর্য ধারণ করে একজন যোগিনী যে কোনও মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ দর্শনমাত্র জানতে পারে।

কুণ্ডলিনী আয়ত্ত করার আরও একটি পদ্ধতির উল্লেখ আমরা পাচ্ছি। সেখানে বলা হয়েছে—

"কুণ্ডলিনীপ্রবোধাৎ জীবপ্রকৃত্যোঃ সঙ্গমঃ।
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে বালরণ্ডাং তপস্বিনীম্।
বলাৎকারেণ গৃহ্নীয়াত্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং বদম্।।
ইড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা দনী।
ইরাপিঙ্গলয়োর্মধ্যে বালরণ্ডাং চ কুণ্ডলী।।

(হটযোগ-প্রদীপিকা, পৃষ্ঠা ১৩১)

অর্থাৎ গঙ্গা যমুনার মধ্যে এক কুমারী রয়েছেন। তিনি কুমারী স্বভাবসুলভ সঙ্কোচবশত পুরুষ সহবাসে কুণ্ঠিতা। সঙ্গম প্রয়াসী হয়ে তাকে বলাৎকার দ্বারা গ্রহণ করলে কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হবে। শেষ দুটি লাইনে বলা হয়েছে ইড়া-ই ভগবতী গঙ্গ া এবং পিঙ্গলা-ই যমুনা। এই দুয়ের সংযোগস্থলে (মূলাধারস্থ সুষুম্নাদ্বারে) রয়েছেন সেই কুমারী, যাকে ধর্ষণ করতে হবে। অর্থাৎ সোজা বাংলায় লিঙ্গ মূলে কুমারী কল্পনা করে, ধর্ষণ করতে হবে। যাকে বলে ধর্ষণ কল্পনায় হস্তমৈথুন। হস্তমৈথুন করার কথা অবশ্য সোজাসুজি ভাবে তন্ত্রে আছে। নারীকে পাওয়া না গেলে বিকল্প হিসেবে নারীকে সঙ্গম করছে কল্পনা করে হস্তমৈথুনের কথা বলা হয়েছে।

উ-ফ! কী ভয়ংকর! ধর্মে ধর্ষণ-সমর্থন? এ'জন্যেই এদেশে এত ধর্ষণ হয়।

যোগের চার বিভাগ

যোগকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) লয়যোগ, (২) রাজযোগ, (৩) হঠযোগ (৪) মন্ত্রযোগ।

• লয়যোগ

ব্যাসদেব লয়যোগের প্রথম সাধক। লয়যোগীরা মনে করেন মাথার খুলির নীচে রয়েছে সহস্রদলপদ্ম। এই সহস্রদলপদ্মে চিত্তের লয় বা মিলন ঘটিয়ে মোক্ষলাভ বা ব্রহ্মলাভ হয়। অর্থাৎ, মনে মনে নারীর সঙ্গে মিলন কল্পনা করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। 'ব্যাস' বেদ বিভাগকর্তা। পুরাণে বলা হয়েছে, পুরাণসকল "ব্যাসাদিমুনিভিঃ রচিতম্"। অর্থাৎ পুরাণ সকল ব্যাসমুনিগণের দ্বারা রচিত। পুরাণে আঠাশ জন ব্যাস-এর পরিচয় পাই। তাতে মনে হয় আঠাশজন মুনি ও ঋষি 'ব্যাস' উপাধি পেয়েছিলেন। এবং এই ব্যাসগণ শ্রীকৃষ্ণের অংশ।

• রাজযোগ

ভগবান পতঞ্জলি, মহর্ষি দত্তাত্রেয় প্রভৃতি যোগীরা রাজযোগের প্রথম সাধক।

এঁরা নানা আসন ও মুদ্রার সাহায্যে বায়ু গ্রহণ না করে থাকতে পারতেন। এই যোগসিদ্ধরা ইচ্ছেমতো আকাশে উড়তে পারতেন, অদৃশ্য হতে পারতেন, যে কোনও পশু-পাখির ভাষা বুঝতে পারতেন। যে কোনও অলৌকিক ঘটনা ছিল করায়ত্ত।

● হটযোগ

গোরক্ষ মুনি, মার্কণ্ডেয় মুনি হটযোগের সাহায্যে যে কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারতেন। গোরক্ষ মুনির মতে যোগাঙ্গ ছয় প্রকারের। (১) আসন, (২) প্রাণায়ম, (৩) প্রত্যাহার, (৪) ধারণা, (৫) ধ্যান, (৬) সমাধি।

মার্কণ্ডেয় মুনির মতে যোগাঙ্গ অষ্টবিধ। যোগী যাজ্ঞবাল্ক্য মুনি অষ্টাঙ্গ যোগবিধির কথা বলেছেন। ছয়টি যোগাঙ্গের সঙ্গে আরও দুটি যোগবিধি তাঁরা যুক্ত করেছিলেন। বিধি দুটি হলো (১) যম, (২) নিয়ম।

● মন্ত্রযোগ

মন্ত্রযোগের প্রণেতা ভৃগু, কাশ্যপ, প্রচেতা, মহাত্যাগী, প্রবর, দধীচি, জমদগ্নি ইত্যাদি ঋষিরা প্রধান। এরা যোগ ও মুদ্রার সঙ্গে মন্ত্র-প্রয়োগের কথা বলেছেন। বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞে যোগমুদ্রার পাশাপাশি বিভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ করা হত। দু'য়ের ফলে শত্রু দমন, মারণ-উচ্চাটন, রোগ নিবারণ ইত্যাদি অনেক কিছুই করা যেত বলে মনে করা হত।

গীতায় ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন—পাপী, তাপী, বিলাসী, সন্ন্যাসী, ভোগী, ত্যাগী, সকলেই যোগের অধিকারী।

ছেলেবেলায় পথের পাঁচালীতে দেখেছি, অপু শূন্যে ওড়ার ক্ষমতা পেতে শকুনের ডিম, পারদ আর কীসব হিজিবিজি যোগাড় করেছিল অনেক কষ্ট করে। আমার বালক মনও অপুর সঙ্গী হয়েছিল। ভাবতাম যদি অদৃশ্য হওয়ার বা ওড়ার ক্ষমতা এমনি করে আমিও পেয়ে যাই....। ও সব ছেলেমানুষী ভাবনা আজ আর আমাকে রোমাঞ্চিত করে না, বরং এমন শিশুসুলভ ভাবনার কথা ভাবলে হাসি পায়। আমাদের সমাজে এমন অনেক মানসিকভাবে নাবালক রয়েছেন, যাঁরা এখনও ছোট্ট অপুর বিশ্বাসকে 'পরম সত্য' বলে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। বিশ্বাস করেন যোগের হিজিবিজি পাগলামিতে।

আর যা-ই হোক, 'যোগ' কোনওভাবেই 'দর্শন' নয়, যত-ই কেউ যোগ'কে 'দর্শন' বলে গলা ফাটাক না কেন।

অধ্যায় ঃ সাত

বৈদিক সাহিত্য, জাদু-বিশ্বাস, যজ্ঞে যৌনাচার

সত্য খোঁজে মুক্তমন, হিসেব কষে ভণ্ড

বৈদিক সাহিত্য, বৈদিক ধর্ম ও আর্যভাষীদের নিয়ে গত একশো বছরে কম বই প্রকাশিত হয়নি। এইসব বইয়ের লেখক দু'শ্রেণীর। (১) ধর্মগুরু, স্বামীজী ইত্যাদি, (২) তথাকথিত দার্শনিক, ইতিহাস-গবেষক, ধর্ম-গবেষক, সমাজ-বিজ্ঞানী ইত্যাদি।

২য় শ্রেণীর বইগুলোর লেখার ধারাকেও প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) নিজের ইচ্ছে মতো করে বৈদিক ধর্ম ও আর্যভাষীদের হাজির করতে, আদর্শ মডেল হিসেবে হাজির করতে, একেশ্বরবাদী হিসেবে হাজির করতে, গৌরবের শিখরে তুলতে যতটা নামতে হয় নেমেছেন লেখকরা। কতটা চাপবেন, কতটা ছাপবেন— এ' ক্ষমতা লেখকের হাতের মুঠোয়। সেই ক্ষমতার অপব্যবহারেও তাঁরা ক্ষান্ত হননি। ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়েছেন ইচ্ছে মতো। চড়া মেক-আপ দিয়ে প্রাচীন বৈদিক ঐতিহ্যের কথা পরিবেশন করে পাঠক-পাঠিকাদের মোহাবিষ্ট করে রাখতে চেয়েছেন। আর এঁরাই হলেন মূলস্রোত। এঁরা বৈদিক ঐতিহ্য আমাদের একান্ত আপন ও মহান ঐতিহ্য বলে চিত্রিত করে আমজনতার আবেগ জয় করেছেন। 'জাতিয়তাবাদী' হিসেবে গ্রহণীয় হয়েছেন, শ্রদ্ধা পেয়েছেন। (২) আরও একটি ধারা ক্ষীণ হলেও আছে, তাঁরা বৈদিক সাহিত্যকে, বৈদিক যুগের ভাল কিছুকে প্রাপ্য মর্যাদা দিতে নারাজ। তাঁরা বেদের যুগের নানা কুসংস্কারকে তুলে ধরে নিন্দা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে দায়িত্ব খালাস করেছেন।

অকারণ প্রশংসা ও অকারণ নিন্দা— কোনওটাই ভাল নয়। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লেখা আমাদের সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আবার সত্যকে জানতে ও গ্রহণ করতে অনেক উদার হতে হয়, মুক্তচিন্তার মানুষ হতে হয়। আজও আমরা এত বেশি ব্যক্তি-স্বার্থ ও ভিত্তিহীন অহমিকাবোধের দ্বারা পরিচালিত হই যে, স্বার্থ-হানিকর বা অহমিকাবোধে আঘাত দেয়—এমন সত্যকে প্রত্যাখ্যান করি।

আমার-ই প্রতিবেশী এম টেক ইঞ্জিনিয়র তরুণ আমাকে বললেন, তাঁর ঠাকুরদা

যোগ বলে একটু একটু করে শূন্যে উঠে যেতেন। আমি এর কী ব্যাখ্যা দেবো, জানতে চাইলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, "ঠাকুরদা কি বেঁচে আছেন? তিনি আমার সামনে শূন্যে উঠে দেখতে পারলে, আমিও করে দেখাবো, ব্যাখ্যাও দেবো।"

আমার কথা শুনে শিক্ষা-দীক্ষা ভুলে তরুণটি হঠাৎ চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন, "ঠাকুরদা মারা গেছেন। বাবা নিজের চোখে ঠাকুরদার এই যোগ-ক্ষমতা দেখেছেন। বাবা কি তবে মিথ্যে বলেছেন?"

যেন যাঁরা মিথ্যে কথা বলেন, তাঁদের বাবা-মা হওয়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। একজন এম টেক, সত্যকে গ্রহণ করতে চাইছেন না, আর তাঁর বাড়ির ড্রইরুমে একটা ওয়ালম্যাটে শিবের ছবির তলায় লেখা রয়েছে, "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।" এ শুধু একজন এম টেকের সমস্যা নয়, আমাদের সামাজিক সমস্যা। পরিবারে পরিবারে ঢুকে গেছে প্রগতিশীল সাজার হুজুগ।

বৈদিক সাহিত্য আমাদের রামায়ণ মহাভারতের মতো দুটো আসাধারণ মহাকাব্য দিয়েছে, এটা সত্যি। বৈদিক সাহিত্য আমাদের রসায়ন ও আয়ুর্বেদের প্রাথমিক জ্ঞানের সূচনাকারী, এও সত্যি। বেদ আমাদের নৃত্যকলা ও কামকলার বর্ণপরিচয়, স্বীকার করি। বেদের যুগের দেবতারা যজ্ঞশক্তির কাছে ক্ষমতাহীন, এ'কথা বেদ-ই শিখিয়েছে। যোগেও যৌনাচারের ভয়ংকর রকমের ছড়াছড়ি। এ'সব বৈদিক সাহিত্য পড়লেই জানা যায়।

বেদের যুগের মুনি-ঋষি ও দেবতারা এতই কামুক ছিলেন যে, কন্যা, পরস্ত্রী, অনিচ্ছুক নারী, স্বর্গের বারবনিতা যে কোনও নারী দেখলেই খেপে উঠতেন। এমনকী, সুন্দরী দেখলে দেবতা থেকে এইসব ঋষিরা এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়তেন যে, যজ্ঞস্থানেই বীর্য বের করে ফেলতেন।

বৈদিক সাহিত্যে এ'সব পর্ন-বর্ণনা পড়ে শিউরে উঠেছি, এ'ও সত্যি।

আমরা যাদের মুনি-ঋষি বলি, সে'সব জাদু পুরোহিতরা যোগের মাধ্যমে শরীর সুস্থ রাখার কিছু কিছু আসন যেমন শিখিয়েছেন, তেমনই শারীর-বিজ্ঞানের নামে বিজ্ঞান বিরোধী পাগলামো শিখিয়েছেন, এ'ও তো সত্যি।

শক্তি-উপাসক, তান্ত্রিক স্বামীজীরা একদিকে ব্রহ্মচর্যের নামে বিজ্ঞান বিরোধী কু-শিক্ষা দিয়েছেন, আর এক দিকে তাঁদের তন্ত্রই বলছে—"যত নারী তত শক্তি।" যত বেশি নারীর সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হবে, তত বেশি শক্তির অধিকারী হবে।

কেন আমরা স্ববিরোধিতার ভণ্ডামী, না জেনে জানার ভণ্ডামী নিয়ে বাঁচবো?

কেন আমরা বৈদিক যুগের ভালোকে 'ভালো', খারাপকে 'খারাপ' বলার আগে লাভ-ক্ষতির হিসেব কষতে বসবো? মুক্তমনই সত্য জানার একমাত্র পথ। বলিষ্ঠ সততাই সত্যি বলার একমাত্র শক্তি।

বৈদিক সাহিত্যের গপ্পো ও দুই ডাক্তার

হিন্দু উপাসনা ধর্মে বিশ্বাসীদের অনেকের কাছেই 'বেদ' মানে যেন 'শেষ কথা'। 'বেদবাক্য' শব্দটার উৎপত্তি এই থেকে। শিক্ষার সুযোগ পাওয়া অনেক মানুষও বিশ্বাস করেন বেদে বিজ্ঞানের সব কথা লেখা আছে। বিদেশের বিজ্ঞানীরা নতুন কী করেছে? বেদ থেকেই তো সব টুকে মেরেছে। রসায়ন-বিজ্ঞান থেকে চিকিৎসা-বিজ্ঞান, সবেরই শেষ কথা বলে গেছে বেদ।

'সংহতি' একটি বইয়ের নাম। লেখক প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য। অন্য পরিচয়—বর্ধমান শহরের সিংদরজায় তাঁর পঞ্চমুণ্ডির আসন। আসনে বসেন, তন্ত্র সাধনা করেন। বইটিতে লেখা রয়েছে, বৈদিক যুগে ক্ষেপণাস্ত্র থেকে ক্লোনিং সবই ছিল। ক্লোনিং নিয়ে একটি বাক্যের উদ্ধৃতি তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না। "ভগবৎ চণ্ডীতে উল্লেখ্য রক্তবীজ উপাখ্যান হতে এটাও ধারণা করা যায় যে সেই যুগের মানুষ ক্লোনিং পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে একটি মানুষের শুধুমাত্র এক ফোঁটা রক্ত হতেই অনুরূপ একটি সম্পূর্ণ মানুষ তৈরি করতে পারত।"

বিজ্ঞান-বিরোধী এই বইটি প্রসঙ্গে একজন লেখক লিখিতভাবে জানিয়েছেন, বইটি "অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা ইত্যাদির উচ্ছেদে সাহায্য করবে।" লেখকের মতামত বইটিতে ছাপা হয়েছে। গভীর পরিতাপ ও শঙ্কার বিষয় এই যে, লেখকের নাম ডা. ভবানীপ্রসাদ সাহু।

আর এক চিকিৎসক গৌতম সাহা, এম. বি. বি. এস. (ক্যাল) 'সংহতি' প্রসঙ্গে একই ধরনের প্রশংসা করে লিখেছেন,"অনেক পৌরাণিক কাহিনী ও শাস্ত্রীয় বিধির আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা ছড়ানো রয়েছে পরিচ্ছদে পরিচ্ছদে!"

এইসব ডাক্তারদের এমন শিক্ষার জন্যেই কি আমরা আমজনতা এক একটা ডাক্তার তৈরি করার খরচ যোগাই!

বৈদিক সাহিত্য নিয়ে এমন আজগুবি, ছেলেমানুষী লেখা বইয়ের সংখ্যা কম নয়। এই বঙ্গের সবচেয়ে নামী পাক্ষিক সাহিত্য পত্রিকাতেও বৈদিকযুগ নিয়ে, বৈদিক সাহিত্য নিয়ে ছেলেমানুষী বোকাবোকা লেখা আজ পর্যন্ত কম প্রকাশিত হয়নি।

আসুন বরং দেখি বেদে কী আছে? বৈদিক সাহিত্য-ই বা কী?

বেদ

বেদ—চারটি। ঋক, সাম, যজু, অথর্ব।

- **ঋক্‌বেদ**—এতে আছে দেবতাদের উদ্দেশে রচিত নানা স্তোত্র। ঋক্‌বেদের

পাঁচটি শাখার নাম আমরা জানতে পেরেছি। (১) শাকল (২) বাষ্কল (৩) আশ্বলায়ন (৪) সাংখ্যায়ন (৫) মাণ্ডুক। বর্তমানে ঋক্‌বেদের শাকল শাখাটিই শুধু টিকে আছে। এখন যে ঋক্‌বেদ পাচ্ছি, তাতে আছে ১০২৮টি সূক্ত বা অধ্যায়। ১০২৮টি সূক্তে দশ হাজারের উপর শ্লোক রয়েছে। শ্লোকগুলোতে দেবতার গুণগান ও তাঁদের করুণাভিক্ষা করা হয়েছে। এই দেবতারা তিন শ্রেণীর। স্বর্গের দেবতা, যাঁদের মধ্যে প্রধান মিত্র, পুষা, বিষ্ণু, উষা, আদিত্যগণ। আকাশের দেবতা, যথা ইন্দ্র, রুদ্র, বায়ু, পর্জন্য ও মরুদ্‌গণ। পৃথিবীর দেবতা, যথা অগ্নি, সোম পৃথিবী ইত্যাদি। ঋক্‌বেদের একটি বৈশিষ্ট্য হল, প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে যেমন দেবত্ব আরোপ করেছিল, তেমনই মানবত্ব আরোপেরও প্রয়াস ছিল।

● সামবেদ—সামবেদকে বলা যায় ঋক্‌বেদ-এ রচিত স্তোত্রগুলোর স্বরলিপির গ্রন্থ। এতে স্তোত্রগুলোর গায়নবিধি ও আবৃত্তিবিধি তুলে ধরা হয়েছে। সামবেদের মোট তিনটি শাখা। (১) কৌথুম (২) রাণায়নীয় (৩) জৈমিনীয় বা তালবকার সামবেদের কৌথুম শাখাই বেশি প্রচলিত। সাম শব্দের অর্থ হল গান। সামবেদের ঋক্ বা স্তবকগুলোকে 'যোনি' আখ্যা দেওয়া হয়। যজ্ঞবেদিকেও 'যোনি' আখ্যা দেওয়া হয়। পুরুষ ও প্রকৃতিতত্ত্ব এবং জাদুবিশ্বাসের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে 'যোনি' শব্দটির ব্যবহার যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

● **যজুর্বেদ**—এতে আছে নানা যাগ-যজ্ঞের বিস্তৃত নিয়মাবলী, পদ্ধতি ও অনুশাসন। যজুর্বেদ দু'ভাগে বিভক্ত। (১) শুক্ল, (২) কৃষ্ণ। শুক্ল যজুর্বেদের একটিমাত্র শাখাই আমরা পেয়েছি। শাখাটির নাম—বাজসনেয়। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের চারটি শাখা। (১) কাঠক-সংহিতা, (২) কপিষ্টল-কঠ-সংহিতা, (৩) তৈত্তিরীয় সংহিতা বা আপস্তম্ব সংহিতা (৪) মৈত্রায়ণী সংহিতা। যজুর্বেদের মন্ত্রগুলো স্থানবিশেষে শ্লোকে ও স্থান বিশেষে গদ্যে রচিত।

● অথর্ববেদ—প্রাচীনত্বে ঋক্‌বেদের প্রায় সমকালীন। অথর্ববেদের প্রাচীন নাম 'অথর্বঙ্গিরস'। অথর্ববেদের দুটি শাখার খোঁজ আমরা পেয়েছি। (১) শৌনক, (২) পৈপ্পলাদ। অথর্ববেদে আছে—তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, মারণ-উচ্চাটন, গৃহবন্ধন, গ্রামবন্ধন, বশীকরণ ইত্যাদির প্রয়োগ পদ্ধতি। অথর্ববেদে আছে নারীর সুপ্রসবের জন্য মন্ত্র, জ্বর সারাবার, মন্ত্র, হৃদরোগ ও কুষ্ঠ সারাবার মন্ত্র, শত্রুনাশ, দস্যুনাশ, দীর্ঘায়ুলাভের মন্ত্র, বিবাদে জয়ের মন্ত্র, ক্রিমিরোগের শান্তি-মন্ত্র, শত্রুসেনা সম্মোহন পদ্ধতি, যক্ষ্মানাশ মন্ত্র, শত্রুপত্নীকে বন্ধ্যা করার মন্ত্র ইত্যাদি। পাশাপাশি অথর্ববেদে বিভিন্ন রোগ সারাতে নানা রকম গাছ-গাছড়া ও ধাতুর ব্যবহারের কথা আমরা পেলাম, পেলাম রসায়ন শাস্ত্র। এই বেদে আছে রোগ চালান করে দেওয়ার জন্য রোগটির কাছে, অথবা অপদেবতা বা দেবতার কাছে প্রার্থনা। অথর্ববেদ 'যোগ-দর্শন' বা 'তন্ত্র দর্শন-এর

মূল উৎস, যা আগাপাশতলা কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস ব-ই কিছুই নয়।.

ঋক্, সাম, যজু ও শেষ পর্যন্ত মোটাদাগের কুসংস্কার-ই।

বেদের ব্যাখ্যা দিতে তৈরি হয়েছিল ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহ। এইসব গ্রন্থে আছে নানা যজ্ঞের কথা এবং যজ্ঞকে মহাজাগতিক শক্তি হিসেবে গণ্য করার কথা।

উপনিষদ

বেদের যুগ ছিল উচ্চবর্ণদের সুবর্ণ যুগ। 'খাও-পিও-মৌজ কর'। কাজ করবে শূদ্র দাসেরা। কৃষি প্রধান সমাজ ব্যবস্থায় বেগার শ্রম দিতেন দাস-দাসীরা। প্রতিটি উৎপাদন কণা তুলে নিত উচ্চবর্ণের দাস-প্রভুরা। শ্রেষ্ঠীদের ব্যবসায় রক্ত ঝরিয়ে আয় করতেন দাসরা। কিন্তু সেই আয়ের একটি কড়িতেও তাঁদের অধিকার ছিল না। কাজের কোনও বাঁধা-ধরা সময় নেই। দাস-দাসীদের চব্বিশ ঘণ্টাই ছিল কাজের সময়। যে কোনও সময় ডাক পড়লেই হল। দাসপ্রভুরা দয়া করে উচ্ছিষ্ট অন্ন, ছিন্ন বস্ত্র ও শোয়ার জন্য খড়ের আঁটি দিয়ে দাসেদের যত দিন পারা যায়, নিংড়ে নেওয়ার জন্য বাঁচিয়ে রাখতো। উচ্চবর্ণের লোকদের কাজের মধ্যে কাজ ছিল লাম্পট্য—মনুসংহিতা ও আর্য-সাহিত্যই তার প্রমাণ।

শারীরিক ও মানসিকভাবে চূড়ান্ত অত্যাচারিত শূদ্র-দাসেদের মধ্যে ক্ষোভ অবশ্যই ছিল, যেমনটি ছিল আর প্রতিটি দেশের দাসেদের ক্ষেত্রে। তবে সে সময় অন্যান্য দেশের দাসদের সঙ্গে আমাদের দেশের শূদ্র-দাসদের পার্থক্য ছিল দুটি। (এক) অন্যান্য দেশে যুদ্ধ-বন্দি ও বন্দিকালে হওয়া সন্তান দাস হতেন। এ-দেশে বর্ণ বিভাজনের মধ্য দিয়ে ধর্ম দাস সৃষ্টি করেছিল। (দুই) অন্যান্য দেশে দাস প্রভুদের তুলনায় দাসরা ছিলেন সংখ্যালঘু। আমাদের ভারতবর্ষে শূদ্র দাসরা সংখ্যায় ছিলেন দাস-প্রভুদের তুলনায় বহুগুণ। এদেশের শূদ্র-দাসদের মধ্যে যে একটা ক্ষোভ ছিল, তারই প্রমাণ, সনাতন হিন্দু ধর্ম ছেড়ে শূদ্রদের ব্যাপক হারে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ।

বেদ ও মনুর অনুশাসনের প্রতি শূদ্রদের অনাগ্রহ, সন্দেহ, ক্ষোভ দেখে আর্য শাসক ও পুরোহিতগোষ্ঠী বিপদের গন্ধ পেলেন। ধোঁয়া থেকে আগুন সৃষ্টি হওয়ার আগেই ধোঁয়ার উৎপত্তিতে জল ঢেলে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করলেন।

এমনই এক প্রয়োজনীয় মুহূর্তে উচ্চবর্ণদের এই সংকটে উদ্ধারকর্তার ভূমিকায় হাজির হলেন পাঞ্চালের রাজা জৈবলি ও ব্রাহ্মণ উদ্দালক আরুণি (গৌতম)। তাঁরা তৈরি করলেন ছান্দোগ্য উপনিষদ (৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে)। 'উপনিষদ' শব্দের অর্থ হল—'গুরু কর্তৃক শিষ্যের নিকট বর্ণিত রহস্য।' ছান্দোগ্য উপনিষদে জৈবলি ও আরুণি নিয়ে এলেন এক নতুন মতবাদ, 'জন্মান্তরবাদ'। পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম হিসেবে সনাতন হিন্দু উপাসনা ধর্মে যুক্ত হল 'জন্মান্তর' বিশ্বাস। ভারতবর্ষের হিন্দু

উচ্চবর্ণরা পেল এক অসাধারণ কার্যকর অহিংস অস্ত্র। শিক্ষার সুযোগ পাওয়া উচ্চবর্ণের মানুষরা শূদ্র দাসদের কানে দিল 'অব্যর্থ সত্যবাণী'—ঈশ্বরের বিধান মেনে এই জন্মের প্রভুদের প্রফুল্ল চিত্তে সেবা করলে, প্রভুর সম্পদে লোভ না করলে, কোনও ঈর্ষা পোষণ না করলে, পরের জন্মে সে জন্মাবে উচ্চবর্ণে। আর, এ জন্মে শূদ্র জীবনের এই যে কষ্ট ভোগ, তা পূর্বজন্মেরই 'কর্মফল' মাত্র।

উপনিষদের এই 'জন্মান্তরবাদ' ও কর্মফল ভারতবর্ষের দাস শ্রমিকদের মাথায় 'সার্থকভাবে' ঢোকানো গিয়েছিল। এই দেশের জনসমষ্টির বেশিরভাগই ছিলেন দাস। সংখ্যাধিক্যের এই সুবিধে থাকা সত্ত্বেও দাসেরা বিদ্রোহ করেননি। কারণ, আগামী জন্মে আবার দাস হতে চাননি। পরিবর্তে পূর্বজন্মের কর্মফলকে মনে নিয়ে দাস-প্রভুদের খুশি রেখে আগামী জন্মের সুখের জীবনকে সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। আমরা

**পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দাস-বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে দেখেছি।
কিন্তু আমাদের দেশে জ্বলতে দেখিনি। এই মহান দেশে
দাস-বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে দেয়নি
জন্মান্তরবাদের জলকামান।**

শুধু কি তাই? উপনিষদ মৃত্যুর পর মানুষকে স্বর্গসুখের ভয়ংকর মিথ্যে প্রলোভন দেখিয়ে অত্যাচারিত, শোষিত মানুষদের প্রতারিত করেছে।

বেদ তৈরি করেছিল স্থূল কুসংস্কার। উপনিষদ তৈরি করেছিল সূক্ষ্ম কুসংস্কার, যা বেদের কুসংস্কারের চেয়েও বহুগুণ শক্তিশালী। এই আপাত নিরীহ সূক্ষ্ম কুসংস্কারই আজও দুঃখপীড়িত মানুষদের ক্ষোভে জল ঢেলে চলেছে।

শোষিত মানুষদের মহাশত্রু হিসেবে আমরা অবশ্যই চিহ্নিত করতে পারি 'কুখ্যাত ত্রয়ী' জৈবলি, উদ্দালক আরুণি ও আরুণি শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য-কে। সবচেয়ে, দুঃখ ও শঙ্কার ব্যাপারে এই যে, বর্তমান ভারতের বহু তথাকথিত বিদ্বান, পণ্ডিত ও দার্শনিক এই 'কুখ্যাত ত্রয়ী'-কে দর্শনের প্রথম প্রদর্শক সর্বজ্ঞ বলে মনে করেন এবং প্রচার করেন। জানি না, তাঁদের এই প্রচারের পিছনে কতটা অজ্ঞতা, কতটা 'ইগো' ও কতটা শ্রেণীস্বার্থ কাজ করে। কিন্তু যেটাই কাজ করুক, এটা খুবই দুঃখের যে, তাঁরা শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার পরও (যেখানে আজও ভারতের প্রচুর মানুষ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় না) অশিক্ষিতের মত হাস্যকর বক্তব্য বুক ফুলিয়ে প্রচার করেন। শঙ্কার কারণ এই যে, এইসব তথাকথিত শিক্ষিতদের অজ্ঞতা অথবা উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমজনতার অনেকেই বিভ্রান্ত হবেন। বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ স্পষ্টতই ডিগ্রির তক্‌মার প্রতি আমজনতার মোহাবিষ্টতা।

উপনিষদ-এর নিষ্ঠুরতা

উপনিষদ কি পরিমাণ নিষ্ঠুর অথবা নির্বোধ, তারই প্রমাণ হিসেবে উপনিষদ থেকে কয়েকটা লাইন এখানে তুলে দিলাম।

আগেই বলেছি, উপনিষদ হল—শিষ্যকে বলা গুরুর উপদেশাবলী। প্রকৃত চোর ধরার জন্য অব্যর্থ পদ্ধতি হিসেবে গুরু শিষ্যকে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করতে বলছেন তা এইরকম; "সৌম্য? একবার শান্তিরক্ষক চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে ধরে আনল। তাকে আদেশ করা হল, 'মন্ত্রপুত তপ্ত কুঠার স্পর্শ করো।' সে যদি সত্যি অপরাধী হয়, এবং মিথ্যা দ্বারা অপরাধ ঢাকার চেষ্টা করে, তবে সে তপ্ত কুঠারে দগ্ধ হবে। যদি সে নির্দোষ হয়, তবে কুঠারের অগ্নি তাকে পোড়াবে না। অপরাধী হলে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। নির্দোষ হলে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে। (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬/১৬/১-২)।"

একটা সময় কোনও শূদ্রকে হত্যা করতে হলে তাঁর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ এনে এই ধরনের পরীক্ষার ফাঁদে ফেলা হত। সম্পত্তির মালিক উচ্চবর্ণদের জন্য এই তপ্ত কুঠারের পরীক্ষা নেওয়া হত না। এই পরীক্ষা শুধুমাত্র শূদ্র দাসেদের বেলাতেই প্রয়োগ করা হত। ভাবুন তো ওই 'কুখ্যাত ত্রয়ী' বে-পসন্দ মানুষ হত্যার জন্য ধর্মের নামে কী ভয়ংকর ও নিষ্ঠুর ফাঁদ পেতেছিল?

উপনিষদ-এর বিভাজন এবং...

উপনিষদ-এর তেরটি ভাগ আছে। অর্থাৎ, উপনিষদ তেরটি। এগুলো ৭০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১০০ খ্রিস্টপূর্বে রচিত। তেরটির নাম (১) ঈশ (২) ছান্দোগ্য (৩) বৃহদারণ্যক (৪) ঐতরেয় (৫) তৈত্তিরীয় (৬) প্রশ্ন (৭) কেন (৮) কঠ (৯) মুণ্ডক (১০) মাণ্ডুক্য (১১) কৌষীতকি (১২) মৈত্রী (১৩) শ্বেতাশ্বতর।

উপনিষদগুলো বাগাড়ম্বর, হাস্যকর ও বিজ্ঞান-বিরোধী নানা তথ্যের জঞ্জাল। জগৎ ও জীবন সৃষ্টির এক আজগুবি তথ্য দিয়ে বলা হয়েছে, "আমি থেকে যেমন স্ফুলিঙ্গের উদ্ভব, তেমনই এই আত্মা থেকে উদ্ভব হয় প্রাণ, লোক, দেব এবং বস্তুসমূহের।" (বৃহদারণ্যক, ২/১/১০)
এই 'আমি' কে? আত্মা।

আর এক জায়গায় সৃষ্টির বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "আত্মাই প্রথম পুরুষ। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি নিজেকে ব্যতীত দ্বিতীয় কাউকে দেখতে পেলেন না। তিনি উচ্চারণ করলেন 'সোহং' (আমিই একমাত্র)। অতঃপর তাঁর নাম হল 'অহং' 'যা আমরা নিজেদের নামোচ্চারণের আগে বোধ করি। .... তিনি আতঙ্কিত হলেন,

আজও তাই নিঃসঙ্গ ব্যক্তিকে আতঙ্ক গ্রাস করে। .... তিনি দ্বিতীয় সত্তাকে কামনা করলেন .... নিজ আত্মা ও শরীরকে দ্বিধাবিভক্ত করলেন, সৃষ্টি হল পতি ও পত্নী ....।'' (বৃহদারণ্যক, ১/৪/১-৪)

আবার ছান্দোগ্যতে সৃষ্টি বর্ণনায় আমরা পাচ্ছি, ''সৃষ্টি প্রথমে এক অদ্বিতীয় ভাবরূপেই ছিল, তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে চাইলেন, তাই অগ্নি তথা তেজ উৎপন্ন করলেন। তেজ ইচ্ছা করলেন এবং জল সৃষ্টি হল .... জল থেকে সৃষ্টি করলেন ... অন্ন।'' (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬/২/১-৪)

ছান্দোগ্যতে আমরা পরলোক তত্ত্বে 'পিতৃযান' ও 'দেবযান'-এর পরিচয় পেয়েছি। পিতৃযান তত্ত্বে দেওয়া আছে মৃতের আত্মা বা চেতনা মৃত্যুর পর কোথায় কোথায় কত দিন করে অবস্থান করে। তারপর চন্দ্রলোকে যায়। সেখান থেকে মেয়াদ শেষে আবার আত্মা ফিরে আসে। ফেরাটা এইরকম—চন্দ্রলোক, আকাশ, পিতৃলোক, দক্ষিণায়ন মাস, কৃষ্ণপক্ষ, রাত্রি, তারপর কায়াহীন এবং সব শেষে স্ত্রী-যোনিতে

দেবযান-এ যেতে পারলে আত্মাকে আর ফিরতে হয় না। দেবযানের যাত্রী আত্মাকে প্রথম যেতে হয় আলোর দেবতার কাছে। সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে যেতে হয় দিনের দেবতা, শুক্লপক্ষের দেবতা, বর্ষার দেবতা, আদিত্য, চন্দ্র, বিদ্যুতের দেবতার কাছে। এখান থেকে আত্মাকে নিয়ে যাওয়া হয় ব্রহ্মার কাছে। এ-বার যাত্রা শেষ।

পৃথিবীর বাইরে যেমন আকাশ আছে, শরীরের ভিতর তেমনই না কি আকাশ আছে। আছে অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী এবং জ্যোতির্মণ্ডল। এ-সবই আছে শরীরে মধ্যে একটি ছোটে কমলা রঙের ঘরে বা হৃদয়ে।

হৃদয়াকাশে একত্রিত এই দ্যুলোক-ভূলোককে স্মরণের মধ্যেই তাই ব্রহ্ম উপাসনা করা যায়। হৃদয়কে বা মনকে ব্রহ্ম জেনেই উপাসনা করার উপদেশ রয়েছে ছান্দোগ্যতে।

ঐতরেয় উপনিষদ-এ আবার এসেছে সৃষ্টিতত্ত্ব। বলা হয়েছে, ''প্রথমে একমাত্র এই আত্মাই জীবিত ছিল। আত্মা মনে মনে ইচ্ছা করলেন ''লোকপাল সৃষ্টি করব। জল থেকেই এক পুরুষকে তুলে তিনি তার দেহে কম্পন সৃষ্টি করে তাকে তপ্ত করলেন। তপ্ত করার পর তার মুখ বিকশিত হল। মুখ থেকে নির্গত হল বাণী, তা থেকে অগ্নি সৃষ্টি হল। নাসারন্ধ্র থেকে নির্গত হল নিঃশ্বাস, নিঃশ্বাস থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে বায়ু। চক্ষু থেকে সৃষ্টি হল দৃষ্টিশক্তি, তা থেকে সূর্য। কর্ণযুগল থেকে হল শ্রবণক্ষমতা, শ্রুতি থেকে দিশা। ত্বক থেকে রোম, রোম থেকে ওষধি বনস্পতি। হৃদপিণ্ড স্ফুরিত হলো, তা থেকে সৃষ্টি হলো মন থেকে চন্দ্র।'' (ঐতরেয় উপনিষদ, ১/১-৩)

আমরা উপনিষদ পড়ে জানলাম, প্রাণ সৃষ্টির রহস্য, যা বিবর্তনবাদের উল্টো দিকে চলেছে। আমরা জানলাম, প্রাণ থেকেই সূর্য, চন্দ্রর সৃষ্টি রহস্য, যা মহাকাশ বিজ্ঞানের উল্টোপথের পথিক।

আমরা জানলাম, বায়ু, অগ্নির সৃষ্টি রহস্য! তারপরও হিন্দু দার্শনিকরা কেন যে আজও নিজেদের যুক্তি বিচারকে নির্ভুল প্রমাণ করতে ভুলে ভরা উপনিষদের দোহাই পাড়েন, সেটাই রহস্য? আর একটা মজার কথা হল, উপনিষদ আবার নিজেদের জাহির করতে বেদের দোহাই পাড়ে।

উপনিষদের প্রতিটি বিভাগই এই ধরনের বিজ্ঞান বিরোধী, অদ্ভুতুড়ে, অর্থহীন ভাষায় ঠাসা। একই সঙ্গে ঠাসা কুসংস্কারে।

'গীতা' উচ্চবর্ণের স্বার্থগন্ধী

ভগবদ্‌গীতা নিয়ে যাঁরা গদ্গদ, তাঁরা উপনিষদ ও গীতা পড়লে দ্বিধাহীনভাবে বুঝতে পারবেন, কৃষ্ণ অর্জুনের জন্য উপনিষদরূপী গাভী থেকে গীতামৃত দোহন করেছিলেন।

বৈদিক যুগে বেদ পাঠ করা তো দূরের কথা, শোনাও ছিল শূদ্রদের পক্ষে ভয়ংকর রকমের অপরাধ। পরবর্তীকালে বেদ ও উপনিষদের কিছু কথা উচ্চবর্ণের স্বার্থে শূদ্রদের মাথায় ঢোকাবার প্রয়োজনেই তৈরি করা হল 'গীতা'। এই গীতা পাঠ করা বা পাঠ শোনা শূদ্রদের পক্ষে অপরাধের বদলে পুণ্যকর্ম বলে ঘোষিত হল।

শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া উপদেশের নামে শূদ্রদের মাথায় আত্মা সংক্রান্ত নানা ভুল ধারণার পাশাপাশি আরও একটা ভুল ধারণা গুঁজে দেওয়া হল—কাজ করে যাও, ফলের আশা করো না।

গীতা পুরোপুরিভাবেই উচ্চবর্ণদের পক্ষে স্বার্থরক্ষাকারী উপদেশে ভরপুর।

পুরাণ

পুরাণ অনুসারে ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণের অংশ। তিনি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসরূপে আবির্ভূত হয়ে পুরাণ গ্রন্থগুলো রচনা করেছিলেন।

পুরাণের দুটি ভাগ। (১) মহাপুরাণ, (২) উপপুরাণ। মহাপুরাণের সংখ্যা ১৮টি।

(১) **ব্রহ্মপুরাণ**—সর্বপ্রথম এই পুরাণ রচিত হয়েছিল বলে একে 'আদি পুরাণ' বলা হয়। প্রথমাংশে আছে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, দেব ও অসুরদের জন্ম, সূর্যবংশ ও

চন্দ্রবংশের বিবরণ। দ্বিতীয় অংশে আছে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ও নরকের বর্ণনা। রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ চরিত। শেষ হয়েছে যোগ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়ে।

(২) পদ্মপুরাণ—পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। সৃষ্টি খণ্ড, ভূমি খণ্ড, স্বর্গ খণ্ড, পাতাল খণ্ড ও উত্তর খণ্ড। প্রধান আলোচ্যের মধ্যে আছে—গোমাহাত্ম্য, বৃত্রবধ কাহিনী, পৃথুচরিত, বেণ-রাজার কাহিনী, নহুষ ও যযাতির কাহিনী, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, তীর্থ বিবরণ, কাশী-গয়া-প্রয়াগের মাহাত্ম্যকীর্তন, অগস্তের কথা, জগন্নাথের বিবরণ, দধীচি উপাখ্যান, কৃষ্ণের নিত্যলীলা, শিব মাহাত্ম্য, গঙ্গা মাহাত্ম্য, ব্রত মাহাত্ম্য, ভাগবত মাহাত্ম্য, মৎস্য-অবতার উপাখ্যান।

(৩) বিষ্ণুপুরাণ—ছয় ভাগে বিভক্ত। (১) বিষ্ণু-লক্ষ্মীর উৎপত্তি, ধ্রুবচরিত, প্রহ্লাদচরিত। (২) পৃথিবী, সপ্তদ্বীপ, সাত সমুদ্র (৩) ব্যাসের করা বেদ-বিভাগ ও চার বেদের আবার শাখা বিভাগ, আশ্রমধর্ম। (৪) সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশ ও অন্যান্য প্রধান রাজবংশের বর্ণনা। (৫) কৃষ্ণচরিত, বৃন্দাবনলীলা, রাসলীলা, (৬) বিষ্ণুভক্তি, যোগ নিয়ে আলোচনা।

(৪) বায়ুপুরাণ—চারটি ভাগ। (১) ব্রহ্মাণ্ড ও জীবের সৃষ্টি। (২) ঋষিদের বংশপরিচয়, শৈব আখ্যান, (৩) জীব-জন্তু, সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশের বিবরণ, (৪) যোগশাস্ত্র ও শিবমাহাত্ম্য।

(৫) ভাগবতপুরাণ—এই পুরাণের আর এক নাম 'শ্রীমদ্ভাগবত'। এতে রয়েছে, সৃষ্টিতত্ত্ব, মায়াবাদ, ব্রহ্মার সৃষ্টিকাহিনী, বরাহবতার কাহিনী, কপিলাবতার কাহিনী, বেণ-রাজ-চরিত, ধ্রুব-চরিত, সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশের পরিচয়, শ্রীকৃষ্ণচরিত, মথুরা ও বৃন্দাবনলীলা, যদুবংশ ধ্বংসের কাহিনী, শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু কাহিনী।

(৬) নারদীয় পুরাণ—এই পুরাণে রয়েছে বিষ্ণুস্তুতি, বৈষ্ণবধর্ম, হরিভক্তি ইত্যাদি।

(৭) মার্কণ্ডেয়পুরাণ—জৈমিনীর প্রশ্নসমূহ ও মার্কণ্ড মুনির দেওয়া উত্তর নিয়ে এই পুরাণের শুরু। এ'ছাড়া আছে বশিষ্ঠ মুনি ও বিশ্বামিত্রের কলহ কাহিনী, চণ্ডী, দুর্গা ও শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী, হরিশচন্দ্রের কাহিনী, মদালসা-কাহিনী, রুদ্রের জন্ম, পুররবার কাহিনী ও যোগ।

(৮) অগ্নিপুরাণ—অগ্নি কর্তৃক ব্রহ্ম জ্ঞান দেওয়াই এই পুরাণের মূল উদ্দেশ্য। সঙ্গে আছে শিব মাহাত্ম্য প্রচার। আছে বিষ্ণু পূজার নিয়ম, শালগ্রাম লক্ষণ ও পূজা পদ্ধতি, শ্রাদ্ধবিধি, তীর্থ মাহাত্ম্য, প্রায়শ্চিত্তবিধি, গায়ত্রী-অর্থ, ধনুর্বিদ্যা, পশুচিকিৎসা ইত্যাদি।

(৯) ভবিষ্যপুরাণ—এতে আছে সৃষ্টি, চতুবর্ণের সংস্কার ও আশ্রমধর্ম, কৃষ্ণ, শাম্ব, বশিষ্ট, নারদ, ব্যাস ও সূর্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা।

(১০) ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ—চার খণ্ডে আছে ব্রহ্মা, প্রকৃতি, গণেশ ও কৃষ্ণ মাহাত্ম্য। এ'ছাড়াও আছে স্বহা, স্বধা, সুরথ, কার্তবীর্য, সাবিত্রী-সত্যবান, পরশুরাম ইত্যাদির কাহিনী।

(১১) লিঙ্গপুরাণ—এতে রয়েছে, লিঙ্গের উৎপত্তি (শিবের), লিঙ্গ পূজা, লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা পদ্ধতি, শিবের ব্রত, কাশী মাহাত্ম্য, শিবের সহস্র নাম, দক্ষযজ্ঞ, মদনভষ্ম, শিব-পার্বতীর বিয়ে, শিবের নৃত্য, শিব মাহাত্ম্য, শিব পূজাবিধি ইত্যাদি। এ'ছাড়াও আছে বরাহচরিত, নৃসিংহচরিত, অভিমন্যু-উপাখ্যান।

(১২) বরাহপুরাণ—এতে রয়েছে বিষ্ণুর বরাহ অবতার হওয়ার কাহিনী। এ'ছাড়াও রয়েছে শ্রাদ্ধবিধি, ব্রতবিধি, গৌরীর উৎপত্তি, মহিষাসুর বধের জন্য তিন প্রধান দেবতার শক্তি থেকে দেবীর উৎপত্তি ও দেবী মাহাত্ম্য ইত্যাদি।

(১৩) স্কন্দপুরাণ—এতে রয়েছে সাতটি খণ্ড। (১) মহেশ্বরখণ্ড, (২) বৈষ্ণবখণ্ড, (৩) ব্রহ্মখণ্ড, (৪) কাশীখণ্ড, (৫) অবন্তীখণ্ড, (৬) নাগরখণ্ড, (৭) প্রভাসখণ্ড।

(১৪) বামনপুরাণ—বিষ্ণুর বামন হয়ে বলি রাজার সঙ্গে ছলনা কাহিনী-ই প্রধান। এ'ছাড়া আছে, মহিষাসুর বধ কাহিনী, দক্ষযজ্ঞ, মদনভস্ম, শিব-উমার বিয়ে ও তীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণনা।

(১৫) কূর্মপুরাণ — বিষ্ণুর কূর্ম অবতার হওয়ার কাহিনী-ই প্রধান। এ'ছাড়া আছে ভৃগুবংশচরিত, পার্বতীর সহস্র নাম, ব্যাসগীতা, ঈশ্বরগীতা, তীর্থ-মাহাত্ম্য, বর্ণপ্রথা জাতিসংকর নিয়ে আলোচনা।

(১৬) মৎস্যপুরাণ—প্রধান বিষয় বিষ্ণুর মৎস্য অবতার হওয়া। মনুর সঙ্গে মৎস্যাবতারের কথোপকথন ইত্যাদি।

(১৭) গরুড়পুরাণ—বিনতার গর্ভে গরুড়ের জন্ম-কাহিনী, বিষ্ণুর সহস্র নাম, যম, শ্রাদ্ধ, মৃত্যুর পরে যা ঘটে তার বর্ণনা। এতে দীক্ষাবিধি, প্রায়শ্চিত্তবিধি ও আয়ুর্বেদের কথা আছে।

(১৮) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—চারটি খণ্ডে বিভক্ত। (১) প্রক্রিয়াপাদ, (২) অনুষঙ্গপাদ, (৩) উপাদ্‌ঘাত, (৪) উপসংহারপাদ। এতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কাহিনী, যুগভেদ, রাজবংশ পরিচয় ও ভারতবর্ষসহ বিভিন্ন দ্বীপের বর্ণনা রয়েছে।

এইসব পুরাণ ছাড়া ১৮টি উপপুরাণ আছে। উপপুরাণের নাম : (১) সনৎকুমার, (২) নর-সিংহ, (৩) নারদীয়, (৪) শিব, (৫) দুর্বাসা, (৬) কপিল, (৭) মানব, (৮) ঐষনস, (৯) বরুণ, (১০) কালিকা, (১১) শাম্ব, (১২) নন্দী, (১৩) সৌর, (১৪) পরাশর, (১৫) আদিত্য, (১৬) মহেশ্বর, (১৭) ভাগবত, (১৮) বশিষ্ঠ।

এইসব পুরাণ ও উপপুরাণে পুরুষ দেবতা ও মুনি-ঋষিদের মাহাত্ম্যই প্রাধান্য পেয়েছে। দেবীরা প্রায় নেই বললেই চলে। বৈদিক সাহিত্যের এই ধারা থেকেও বুঝতে অসুবিধে হয় না—সে'সময়ের সমাজ ছিল পুরোপুরি পুরুষতান্ত্রিক।

বিভিন্ন পুরাণে বলা হয়েছে চারটি যুগের কথা। যুগগুলো হলো (১) সত্য, (২) ত্রেতা, (৩) দ্বাপর, (৪) কলি। হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী 'চিন্তাবিদ' বা 'দার্শনিক'রা

এই যুগ-ভাগে বিশ্বাস করেন। টেলিভিশনের 'ধর্ম চ্যানেল' ও 'তন্ত্র চ্যানেল' খুললে-ই হাতে-গরম প্রমাণ পাবেন। পুরাণ অনুসারে সত্যযুগের স্থায়িত্ব কাল ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার বছর। ত্রেতা যুগ টিকে ছিল ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার বছর। দ্বাপর যুগ চলেছিল ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার বছর। মনুষ্য সভ্যতা এই তিন যুগ অতিক্রম করে বর্তমানে কলিযুগে অবস্থান করছে। কলিযুগ স্থায়ী হবে ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বছর। কলিযুগের মানব সভ্যতা কত বছর অতিক্রম করেছে—তা জানেন শুধু তান্ত্রিক, ধর্মগুরু, ভাববাদী-দার্শনিক ইত্যাদিরা?

মানব সভ্যতা সত্য, ক্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগে মোট ৩৮ লক্ষ ৮৮ হাজার বছর অতিক্রম করে এসেছে এমনটা যাঁরা ভাবেন, তাঁদের 'বোকা' বললেন বোকাদের-ই অসম্মান করা হয়।

পুরাণগুলোর যে রূপ বর্তমানে আমরা দেখি, সেগুলো রচিত হয়েছিল গুপ্ত যুগে। মতামত আমায় নয়, রোমিলা থাপারের মত কিছু ঐতিহাসিকের।

বৈদিক সাহিত্যে জাদু-বিশ্বাস, যজ্ঞের নামে যৌনাচার

বৈদিক কালের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া দুর্লভ। কারণ শুরুতে বৈদিক সভ্যতা ছিল যাযাবার, পশুপালন নির্ভর ও পরবর্তীতে গ্রামীণ সভ্যতা। আদিম লোকজীবনের অনেক উপাদানই ঢুকে পড়েছিল বৈদিক জীবনে। বাড়ি তৈরি, মাটির পাত্র তৈরির প্রাথমিক প্রয়াসের শুরু ভারতবর্ষে প্রবেশেরও অনেক পরে। তার আগে আর্যভাষীরা যাযাবর জীবনে মুক্ত আকাশের নীচে বা চামড়ার আচ্ছাদনের তলায় রাত কাটিয়েছে। জল বহন করতে ব্যবহার করছে চামড়ার ভিস্তিজাতীয় পাত্র।

আমরা যে আর্যভাষীদের ইতিহাস, জীবনচর্যা, ঈশ্বরবিশ্বাস ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনায় যেতে পারছি, তার মূলে রয়েছেন আমাদের পূর্বসূরী বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী, লোকপুরাণবিশেষজ্ঞ, উপাসনা-ধর্ম গবেষকদের অবদান। তাঁরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করেছেন। সেই সঙ্গে আদিম পর্যায় থেকে বিবর্তনের নানা মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা অনুধাবন করে আমরা বৈদিক যুগের নানা অবস্থা নিয়ে আলোচনায় যেতে পারছি।

আর্যভাষীদের এ'দেশে পদার্পণের পর কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে সমাজ জীবন অনেকটাই পাল্টে গিয়েছিল। আর্যভাষীরা ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রতি অঞ্চলেই আর্যভাষীরা ভূমিপুত্রদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখে নিজ নিজ গোষ্ঠীর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এইসব ছোট ছোট স্বতন্ত্র রাজ্যের গোষ্ঠীপতিরা 'রাজা' হলেন। শুরু হল রাজার শাসন। রাজার শাসনের সহায়ক মানুষজনও ছিল

আর্যভাষী। সংখ্যালঘু আর্যভাষী জনগোষ্ঠী দ্বারা বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে শাসন করা শুরু হল। রাজাদের চাষ বা পশুপালন করে সম্পদ বৃদ্ধি করতে হত না। বরং বৈদিক যুগের ধর্মীয় আইন গ্রন্থে উচ্চবর্ণের অর্থাৎ আর্যভাষীদের শ্রম বিনিয়োগ করে আয় করাটাই ছিল নিষিদ্ধ কাজ। সংখ্যাগুরু শ্রমজীবীদের শোষণ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলাটাই প্রচলিত প্রথা।

এইসব ছোট ছোট রাজাদের আরও ধন, সম্পদের তৃষ্ণা, পররাজ্য আক্রমণ করতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। সেই সঙ্গে নিজের রাজ্যের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার কথাও ভেবেছিল।

স্থূল ভোগ তৃষ্ণাই রাজাদের টেনে এনেছিল 'শামন' বা জাদু-পুরোহিতদের দিকে, কোনও অধ্যাত্মিক চেতনা নয়। জাদু-পুরোহিতরাও রাজাদের বুঝিয়েছিল, তাদের জাদু-ক্ষমতায় রাজাদের সম্পদ বাড়বে, যুদ্ধে জয় হবে, নারী-ভোগের ক্ষমতা বাড়বে। সুরা-নারীতে মগ্ন উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কারণে শরীরে বাসা-বাঁধা রোগকে আরোগ্য করবে।

রাজারা সমৃদ্ধি ও রাজ্যসীমানা বাড়াবার প্রচেষ্টাকে নিশ্চিত করতে এইসব জাদু-পুরোহিতদের দিয়ে অশ্বমেধ, বাজপেয় ও রাজসূয়ের মত বিশাল ব্যয়সাপেক্ষ যজ্ঞ করেছে। পাশাপাশি প্রতিটি কামনা-বাসনা পূর্ণ করার জন্য নিত্য-নতুন যজ্ঞের প্রবর্তন করতে লাগলো এইসব জাদু-পুরোহিতরা। যজ্ঞের প্রয়োজনে 'ব্রাহ্মণ' সাহিত্যের এই সূচনা হল।

ঋক্‌বেদ রচনার শেষ পর্বে 'ব্রাহ্মণ' সাহিত্যের সৃষ্টি হল। বিভিন্ন যজ্ঞ করার নিয়ম-কানুন, এইসব নিয়ম বা ক্রিয়ার ব্যাখ্যা, তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করাই ব্রাহ্মণগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণের তিনটি করে ভাগ আছে। (১) যজ্ঞ প্রণালী, (২) অর্থবাদ বা ব্যাখ্যা, (৩) উপনিষৎ বা ব্রহ্মতত্ত্ব।

'ব্রাহ্মণ' শব্দটির উৎপত্তি ব্রহ্মতত্ত্ব থেকে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি-ই 'ব্রাহ্মণ'। 'ব্রাহ্মণ্যবাদ' শব্দটি নবীন। চর্তুবর্ণ প্রথা ও ব্রাহ্মণদের তৈরি নানা শাস্ত্র অর্থাৎ অনুশাসন ও বিধি বিষয়ক মতবাদ-ই হল 'ব্রাহ্মণ্যবাদ'।

উচ্চবর্ণের লোকেরা যতই নিম্নবর্ণের লোকেদের শোষণ করতে পেরেছে, ততই তারা আরও বেশি সম্পদশালী হয়েছে, সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। এইসব উচ্চবর্ণের মানুষদের দোহন করে নিজেদের আখের গোছাতে ঋষি বা জাদু-পুরোহিতরা নিজেদের মধ্যে পাল্লা দিয়ে নিত্য-নতুন যজ্ঞ-মন্ত্র ও শাস্ত্রের সৃষ্টি করে গেছে। অত্যন্ত দ্রুত হারে বেড়েছে যজ্ঞপরিচালনকারী জাদু-পুরোহিতদের সংখ্যা, দক্ষিণার বহর।

দেবতাদের চরিত্র, জন্মবৃত্তান্ত, এমনকী, মা-বাবার পরিচয় পর্যন্ত পাল্টে গেছে বিভিন্ন বৈদিক ধর্মগ্রন্থে। জাদু-পুরোহিতরা ইচ্ছে মতো পাল্টে দিয়েছে, নতুন নতুন দেবতার জন্ম দিয়েছে, কাউকে তুলেছে, কাউকে নামিয়েছে। দেবতাদের আসল সৃষ্টিকর্তা ছিল এইসব জাদু-পুরোহিতরা।

আর্যভাষীদের বসবাস যতই নতুন নতুন অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছে, ততই দূর-অঞ্চলগুলোতে ধর্ম-প্রচারকদের যাওয়াটা জরুরি হয়ে পড়েছে। যত যজ্ঞ বেড়েছে, ততই বেড়েছে যজ্ঞপুরোহিতদের সংখ্যা। রাজারা রোগমুক্তি থেকে যুদ্ধজয়, সবেই জাদু-পুরোহিতদের কৃপাভিক্ষা করছে। রাজকীয় সম্মান দিয়ে নিয়ে এসেছে। সেবার কোনও ত্রুটি রাখেনি। প্রয়োজনে রানিদেরও এগিয়ে দিয়েছে। প্রচুর দক্ষিণা দিয়েছে। জাদু-পুরোহিতদের প্রতি রাজভক্তি সাধারণ প্রজা থেকে রাজকর্মচারীদের প্রভাবিত করেছে। পুরোহিততন্ত্র শক্ত জমি পেয়েছে।

বৈদিক-ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য যজ্ঞ। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলো যজ্ঞকেই সর্বশক্তির আধার বলে বর্ণনা করেছে। সমস্ত সৃষ্টিকে যজ্ঞক্রিয়ার ফল বলা হয়েছে।

বেদগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি আমরা। (১) মন্ত্র, (২) ব্রাহ্মণ। 'মন্ত্র' হল দেবতার গুণকীর্তন ও প্রার্থনা।

'ব্রাহ্মণ' হল যাগ-যজ্ঞের প্রণালী। ব্রাহ্মণের বক্তব্য অনুসারে—ঋক্ বেদের দেবতারা যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা পরিচালিত হতে বাধ্য। অর্থাৎ যে জন্য যজ্ঞ করা, সে ফল পাওয়া যাবেই। ফলদানের বা ফল আটকে দেবার ক্ষমতা দেবতাদের নেই।

এরপর যে প্রশ্ন উঠে আসা স্বাভাবিক,—তা'হলে মন্ত্র বা প্রার্থনার মূল্য কী রইলো? বেদেরই অংশ 'ব্রাহ্মণ' বলছে—বেদভক্তি, মন্ত্র ও প্রার্থনার কোনও মূল্য নেই। তবে যজ্ঞে ফল লাভ অনিবার্য।

এটা আপাতভাবে বেদের স্ববিরোধ মনে হতেই পারে। কিন্তু এই স্ববিরোধ তৈরি করা। বেদ লেখক জাদু-পুরোহিতদেরই তৈরি করা। স্বার্থবুদ্ধি থেকেই তারা এমনটা করেছে। তারা চেয়েছে সুনিশ্চিত ফল পেতে যজমানরা দেবতার চেয়ে তাদের উপর নির্ভর করুক বেশি।

জাদু-পুরোহিতরা নিজেদের দেবতা বা দেবতার চেয়েও বড় করে হাজির করতে চেয়েছে। তাইতেই তারা লিখেছে—গুরুই দেবতা। এই নীতি প্রাচীনকাল থেকে এখনও বর্তমান।

সামবেদের ঋক্ বা স্তবকগুলোকে যোনি বলা হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোতে যজ্ঞবেদীকে যোনি বলা হয়েছে। বেদিতে যজ্ঞাগ্নি, প্রজ্বলিত হওয়াকে যৌনক্রিয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণেও যজ্ঞবেদীকে নারী ও যজ্ঞক্রিয়াকে যৌনক্রিয়া বলা হয়েছে। ছন্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, কোনও নারীকে মিলনের জন্য আহ্বান করা 'হিংকার'। তাকে মিলনের জন্য অনুরোধ করা 'প্রস্তাব'। তার সঙ্গে শয়ন করা 'উদ্‌গীথ'। তার উপর শয়ন করা 'প্রতিহার'। মৈথুনের শেষ পর্যায় 'বিধান'। বীর্যপাত দ্বারা মৈথুন সমাধা করা 'নিধান'।

ঐতরেয় থেকে যে ব্রাহ্মণেই চোখ রাখবেন, দেখতে পাবেন যজ্ঞের নামে যৌনাচারের ছড়াছড়ি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদও বলা হয়েছে—নারীর নিম্নদেশ হল যজ্ঞবেদী, যৌনকেশ যজ্ঞতৃণ, ত্বক সোমরস-পোষণের ভূমি এবং অণ্ডকোষ দুটি অগ্নি। এই বিশ্বাস নিয়ে যে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়, সে বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ করে।

এখানে দেখেছি যজ্ঞ না করেই শুধু মৈথুনেই যজ্ঞের ফল লাভের ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে আরও বলা হয়েছে, কোনও নারী যৌনমিলন প্রত্যাখ্যান করলে তাকে জোর করে বাধ্য করা উচিত (বৃহদারণ্যক, ৬, ৪, ৬, ৭)। হিন্দুত্ববাদীরা কি হিন্দুধর্মের এই ধর্ষণ সমর্থনের কথা জানেন? বৈদিক যুগের সব কিছুকেই সমর্থন করার আগে, আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে বড়াই করার আগে একবার ভাবুন, না জেনেই প্রশংসা বা নিন্দা—দুই-ই খারাপ। না জেনে জানার ভান ভণ্ডামী, যার আর এক নাম দুর্নীতি।

বাজসনেয়ী সংহিতার ২২-২৩ অধ্যায় থেকে জানতে পারছি, অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রধান জাদু-পুরোহিত প্রধান রানির সঙ্গে প্রকাশ্যে যজ্ঞক্ষেত্রের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে মিলনে মেতে উঠতেন। অন্যান্য রানি ও জাদু-পুরোহিতরা যৌন-মিলনের নানা উত্তেজক দৃশ্যের বর্ণনা দিতে থাকতেন উত্তেজিতভাবে উচ্চস্বরে। সব মিলিয়ে পরিবেশটা হল জীবন্ত ব্লু-ফিল্ম দেখে খিস্তি-খেউড় সহযোগে তা 'রিলে' করে যজ্ঞে হাজির নারী-পুরুষের মধ্যে যৌন উত্তেজনা ছড়িয়ে দেওয়া।

এ'ছিল অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রথম যুগের অবস্থা। পরবর্তীকালে পুরোহিতের জায়গা নেয় যজ্ঞের অশ্বটি। মন্ত্র পড়ে অশ্বটিকে আদিত্য, যম ও ত্রিত'র সঙ্গে অভিন্ন বলে ঘোষণা করা হত। ত্রিত ছিলেন গৌতম মুনির ছেলে এবং যজ্ঞনিপুণ। ঘোষণা ও মন্ত্রপাঠ শেষে অশ্বটিকে মেরে ফেলা হল। সম্ভবত মৃত্যু ঘটানো হত শ্বাসরোধ করে। তারপর প্রধানা রানি অশ্বের লিঙ্গটি নিয়ে নিজের যোনির সঙ্গে স্পর্শ করাতেন।

রানি ও পুরোহিতরা এই মৈথুন দৃশ্যের বর্ণনা করতেন। সেই অশ্লীল খেউড় গান!

মহাব্রত যজ্ঞে যে আনুষ্ঠানিক যৌন মিলন হত তার বর্ণনা মেলে তৈত্তিরীয় সংহিতা, কাঠক সংহিতা, ঐতরেয় আরণ্যক, জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ, শ্রৌতসূত্র ইত্যাদিতে। যজ্ঞবেদীর উত্তর ও দক্ষিণে দুই গণিকাকে প্রকাশ্যে রমণ করতে হতো। এই রমণীকারীদের একজন হতেন ব্রহ্মচারী, যিনি গণিকাকে রমণ করে তাঁর ব্রহ্মচারী জীবনের অবসান ঘটাতেন। আর একজন হতেন নগরবাসী।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যজ্ঞকালে গণমৈথুনের বিধান দেওয়া আছে। কারণ মৈথুনকে যজ্ঞক্রিয়ার প্রতীক বলে মনে করা হত। কী ভাবে মৈথুন করতে হবে, তার যা ডিটেল বর্ণনা ঐতরেয়তে আছে, তাতে সেরা পর্ন-লেখকরাও ঘাবড়ে যাবেন।

ঋক্‌বেদের পরবর্তী যুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠানগুলো জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। কোন্ যজ্ঞে কতজন পুরোহিত লাগবে, কী কী দান সামগ্রী পুরোহিতদের দিতে হবে, যজ্ঞের জন্য কী কী প্রয়োজন হবে, যজমানেরই করণীয় কী—ইত্যাদি নানা নিয়ম-কানুন নতুন নতুন করে জুড়ে বসতে থাকে। একটা অতি সাধারণ যজ্ঞেও সতেরজন পুরোহিতের প্রয়োজন বলে নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রতিটি যজ্ঞেই বহু বলি দেওয়া হত। অশ্বমেধ যজ্ঞে যজ্ঞের অশ্ব ছাড়া অন্তত হাজার খানেক পশু-বলি হত। এইভাবেই গড়ে উঠলো পুরোহিততন্ত্র। তৈরি হল পুরোহিতদের চারটি শ্রেণী বিভাজন। শ্রেণীগুলো হল (১) হোতা, (২) উদ্‌গাতা, (৩) ব্রহ্মা, (৪) অধ্বর্যু। পরবর্তীতে আরও নানা শ্রেণীর পুরোহিত সম্প্রদায় উঠে এল। এই নতুন শ্রেণী প্রধানত সচ্ছল পরিবারের যজমানদের অমঙ্গল কাটাতে, কুদৃষ্টি কাটাতে, তুক্‌তাক্ কাটাতে অথবা পরিবারের মঙ্গল কামনায়, রোগ মুক্তি ঘটাতে যজ্ঞের আয়োজন করতেন। এইসব যজ্ঞেই পুরোহিতরা প্রচুর দক্ষিণা ও দানসামগ্রী গ্রহণ করতেন। বিনিময়ে যজমান যজ্ঞের ফলভোগী হতেন। সন্তানহীন সচ্ছল পরিবার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করাতেন। যজমানের স্ত্রী'কে নিয়ে গোপন যজ্ঞ করতো পুরোহিত। তাতে অনেক সময় সন্তানও হত। বিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই যে সন্তান হচ্ছে, সেটা যজমানরা বুঝতো না, যেমন আজও বোঝে না।

বেদে একই সঙ্গে দেবস্তুতি ও যজ্ঞস্তুতি দেখে মীমাংসা দর্শনের অনুগামী মীমাংসকরা বললেন—আমরা বেদ মানি। বেদ এ'কথাই প্রমাণ করে যজ্ঞই সত্য, দেবতাদের ক্ষমতা মিথ্যা।

জাদু-পুরোহিতদের পাকা মাথা দারুণ কাজ করেছিল। দেবতার চেয়েও জাদু-পুরোহিতদের প্রতি নির্ভরশীলতা বেড়েছিল।

তন্ত্রের আকরগ্রন্থ 'বৃহৎ তন্ত্রসারঃ'-এ বলা হয়েছে —

"গুরুঃ পিতা গুরুর্ম্মাতা গুরুর্দেবো গুরুর্গতিঃ।
শিবে রুষ্টে গরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।।

অর্থাৎ, গুরু পিতা, মাতা ও অভিষ্ট দেবতা স্বরূপ এবং একমাত্র গুরুই অন্তিমে নিস্তার করেন। যার প্রতি শিব রুষ্ট হন, তাকে গুরুদেব ত্রাণ করতে পারেন, কিন্তু যার উপর গুরু রুষ্ট হন, তাকে নিস্তার করার ক্ষমতা কারও নেই।

ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এমন 'উমদা' চালের জন্য সেলাম জানাতেই হবে। সত্যি-ই ওরা রাজনীতি ভালই বুঝতো।

এরকম সংঘবদ্ধভাবে নিরবচ্ছিন্ন প্রতারণার রাজ চালিয়ে যাওয়ার নজির আর কোনও উপাসনা-ধর্মে আছে বলে জানা নেই।

অধ্যায় ঃ আট

হিন্দু উপাসনা-ধর্মে তন্ত্র

সত্য সেলুকাস!

কলেজ-জীবনে পা রাখা আর দীক্ষার শুরু—একই সময়ে। দীক্ষা মানে ধর্মগুরুর কাছ থেকে দীক্ষা। মাথার দুষ্টুবুদ্ধি নড়ে-চড়ে উঠেছিল। ঠিক করলাম বিভিঃ ধর্মগুরুদের দীক্ষামন্ত্র বা বীজ মন্ত্রগুলো জানতে হবে। যেমন-ই ভাবা, অমনি কাজে নেমে পরলাম।

বাবা তখন রেলের চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। বছরে দুটো 'পাস' পেতেন। আমি ছাত্র, বাবার ওপর নির্ভরশীল। তাই আমার নামেও বিনে পয়সায় রেলে চড়ার পাস পেতেন। দূরের গুরুদের আশ্রমে হাজির হতে পাসগুলোই ছিল ভরসা। কাছাকাছিদের কাছে ট্রামে-বাসে-ট্রেনেই মেরে দিতাম। এ'সব নবজন্মের অভিযানে প্রায়শই আমার সঙ্গী হত তপন চট্টোপাধ্যায় আর গোরাচাঁদ দত্ত। দুজনেই আমার কৈশোরের সঙ্গী ও সহপাঠী। হাঁটতেও পারতাম তখন। পাঁচ-দশ মাইল হাঁটাটা কোনও ব্যাপারই ছিল না।

গুরুদের সঙ্গে মেশার ব্যাপারে আন্তরিকতা ছিল একশো ভাগ। যাঁদেরকে আমার মনে ধরেছে, তাঁদের কাছেই দীক্ষা নিতে চেয়েছি এবং পেয়েছি। 'দীক্ষা' মানে নবজন্ম।

গুরুদের সংখ্যা পঁচিশ অবশ্যই পেরিয়েছে। এঁদের কাছে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত মতে দীক্ষা হয়েছে। গুরুদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা সব সময়-ই ছিল একটু অদ্ভুত। গুরুদের কাউকে প্রণাম করতাম না, 'আপনি' সম্বোধন করতাম না। এ'জন্যে প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই হত। উত্তরে বলতাম, আমার গুরু আর আমি দু'জনেই পরমব্রহ্মেরই অংশ, সুতরাং অন্তরের শ্রদ্ধা বাইরে দেখাবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। বয়ঃজ্যেষ্ঠ বলে সম্মান দেখাবার কথা বলছেন। আমাদের সবার আত্মাই তো চির কালই ছিল, জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। সুতরাং আমি বলতে আমার শরীরের বদলে আত্মাকে বোঝালে, আমরা সবাই বয়সে সমান।

গুরুদের প্রায় সকলেই আমাদের যত্ন-টত্ন করতেন। যা যা খেতে চাইতাম, খাবার ব্যবস্থা করে দিতেন। এঁদের অনেকেই শিষ্যদের জানিয়ে দিয়েছিলেন, আমি ঈশ্বরের অংশ, অবতার। এ'সবই ছিল আমার দুষ্টুমির ফল। আমাকে দলে টানলে লাভ বেশি—হয়তো তাঁদের মধ্যে এমন চিন্তা ছিল। অথবা, একটু বাড়তি তোল্লাই দিলে গুরুর ভাণ্ডাফোড় থেকে বিরত থাকবো—এমন ভাবনা ছিল।

আমার ওপর অবতারত্ব চাপিয়ে দেওয়ায় একবার খুব মুশকিলে পড়েছিলাম। গোরাচাঁদদের পরিবারের সকলেই জন্মসিদ্ধ বালক ব্রহ্মচারীর শিষ্য। গোরার সামনেই একগাদা শিষ্যদের কাছে আমাকে দাঁড় করিয়ে বালকব্রহ্মচারী বাছা বাছা বিশেষণে বুঝিয়ে দিলেন, আমি একজন অবতার। ব্যস। গোরাদের বাড়ি যাওয়ার জন্য গোরা বারবার অনুরোধ করতে লাগলো। বিপদের গন্ধ পেলাম। শেষ পর্যন্ত অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হল। আর ওদের বাড়িতে পা দিতেই কেলেংকারির একশেষ। গোরার মা-বাবা গুরুর কথায় বিশ্বাস করে আমাকে অবতার ঠাওরে আমার পা ধুইয়ে, মুছিয়ে প্রণাম নিবেদন করতে চান। গুরুভক্তদের 'সত্যি' বোঝানো যে কী কঠিন, তা সে'দিন হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছিলাম।

হিন্দু উপাসনা ধর্মের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। আর পাঁচটা উপাসনা-ধর্মের মতো কোনও একজন ঈশ্বর প্রেরিত দূত ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে বাণীগ্রহণকারীদের নিয়ে হিন্দু উপাসনা, ধর্ম গড়ে তোলেননি। এ'দেশে নানা পর্যায়ে, নানা কালে, নানা ভাবে ঈশ্বর বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের সঙ্গে মিশে ছিল নানা ধরনের জাদু-বিশ্বাস। এলো মুনি-ঋষি নামধারী জাদু-পুরোহিতদের রমরমার যুগ। তাঁরা দেবতার ওপরে নিজেদের স্থান পাকা করতে কৌশল-টৌশল করলেন। রসে-বসে দিব্বি রইলেন।

হিন্দু উপাসনা-ধর্মের মূল ধারাগুলো খুঁজে বের করার পর আর এক সমস্যা। যত ধর্মগুরু, তত ধর্মমত। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত—যে, দিকেই তাকান দেখতে পাবেন, যত গুরু ততই গুরুতর বিভেদ। এই ঐতিহ্য আমরা আজও বহন করে চলেছি।

আরও একটা মস্ত ঐতিহ্য বৈদিক ঋষিদের কাল থেকে আজও বজায় রেখে চলেছি—কিছু জ্ঞান দেওয়ার জন্য জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন বোধ করি না।

হিন্দু উপাসনা-ধর্মের 'পঞ্চোসাধনা' ও তন্ত্র

বর্তমানে ভারতে হিন্দু উপাসনা-ধর্মের ধারা পাঁচটি। (১) বৈষ্ণব, (২) শৈব, (৩) শাক্ত, (৪) সৌর, (৫) গাণপত্য। এই পাঁচটি ধারাকে একত্রে বলা হয় 'পঞ্চোসাধনা'। একটা ভুল ধারণা বহুল প্রচলিত—শাক্ত ধর্মেই শুধু তান্ত্রিক নীতি

প্রয়োগ করা হয়। বৈষ্ণব ধর্মেও তান্ত্রিক নীতি আছে। তার প্রমাণ মিলবে লক্ষ্মীতন্ত্রে (নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত) ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে। শৈব ও শাক্ত ধর্মের মূল তন্ত্রতত্ত্ব একই। পার্থক্য এই যে, শৈব ধর্মে পুরুষ নিষ্ক্রিয় হলেও প্রধান। শাক্ত ধর্মে প্রকৃতি বা নারী শক্তিই প্রধান। বৈষ্ণব ধর্মে বিষ্ণু-পুরুষ। লক্ষ্মী প্রকৃতি বা নারীশক্তি। কৃষ্ণ পুরুষ শক্তি, রাধা নারী শক্তি। শৈব ধর্মে শিবের শক্তি কালী, তারা ইত্যাদি। তন্ত্রের আকর-গ্রন্থ 'বৃহৎ তন্ত্রসারঃ'-এ বলা হয়েছে, 'ইনি (গণেশ) হস্তে পদ্ম, অঙ্কুশ এবং রত্নকুম্ভ ধারণ করিয়াছেন। ইঁহার ক্রোড়ে পদ্মের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট শক্তি আছেন, ঐ দেবীর যোনিদেশে ইঁহার (গণেশের) এক হস্ত নিহিত আছে এবং ঐ ক্রোড়স্থিতা শক্তি হস্তদ্বারা তাঁহার (গণেশের) ধ্বজাগ্রভাগ (লিঙ্গের মাথা) স্পর্শ করে রয়েছেন।'' (পৃষ্ঠা ২০৮)।

এই পুরুষ ও প্রকৃতি বা পুরুষ ও শক্তির মিলন নির্ভর ধর্মীয় ধারাগুলো তন্ত্র-সাধনারই ধারা। 'পঞ্চোসাধনাতে'-ই এই পুরুষ-প্রকৃতির মিলন নির্ভরতা আছে।

বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দুতন্ত্রের খিচুড়ি

ভারতে প্রাচীন আমল থেকেই বৌদ্ধতন্ত্রের একটি ধারা ছিল এবং এখনও বর্তমান। ভারতে বৌদ্ধতন্ত্রের যে ধারাটি বর্তমান তা হল মহাযান ও মহাযান থেকে উৎপন্ন নানা শাখা, উপশাখা ইত্যাদি। এ'গুলো আসলে হিন্দুতন্ত্রে-ই 'প্রোডাক্ট'।

মহাযান বৌদ্ধধর্মে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকবিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। স্থানীয় নানা দেব-দেবী বৌদ্ধধর্মে ঢুকে পড়েছিল। যে'হেতু সে সময়কার ভারতীয় সমাজ ছিল কৃষিনির্ভর, তাই ভারতে দেবীপ্রাধান্য ছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্মেও আমরা দেখলাম নানা দেবীর প্রাধান্য নিয়ে অনুপ্রবেশ। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বকে পুরুষ কল্পনা করে দেবীদের তাঁর সাধন-সঙ্গিনী, নারীশক্তি হিসেবে গ্রহণ করা হল।

তন্ত্রে বিশ্বাস প্রাক্-আর্য যুগ থেকেই ভারতবর্ষে ছিল। এবং এই তন্ত্রের ধারা ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি উপাসনা-ধর্মকেই প্রভাবিত করেছিল। বৌদ্ধধর্মের মহাযান এই মূলস্রোতের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়েছিল।

অনঙ্গবজ্রের 'প্রজ্ঞোপায় বিনশ্চয়সিদ্ধি' মহামানপন্থীদের একটি প্রামাণ্যগ্রন্থ। এই-গ্রন্থে আমরা দেখতে পাচ্ছি, পঞ্চ ম'কার সাধনার নির্দেশ। অর্থাৎ মদ, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা বা নানা বিচিত্র মৈথুন পদ্ধতি গ্রহণের নির্দেশ। মৈথুন-ই হল তন্ত্র সাধনার মূল অনুষঙ্গ। মহমুদ্রার অভিজ্ঞতার জন্য, অর্থাৎ নানা মুদ্রার সঙ্গে নিজের পরিচয় ঘটাবার জন্য নির্বিচারে নারী সম্ভোগের কথা গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়। তন্ত্র গ্রন্থটিতে আরও বলা হয়েছে—তন্ত্র যোগের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সাধককে তাঁর মাতা, কন্যা, ভগ্নি, ভাগিনেয়ীর সঙ্গে উপগত হতে হবে দ্বিধাহীন মনে। দ্বিধা-ই পাপ। কী ভয়ংকর অজাচার চাপিয়ে দেওয়া ধর্মের নামে।

গুরুদের প্রায় সকলেই আমাদের যত্ন-টত্ন করতেন। যা যা খেতে চাইতাম, খাবার ব্যবস্থা করে দিতেন। এঁদের অনেকেই শিষ্যদের জানিয়ে দিয়েছিলেন, আমি ঈশ্বরের অংশ, অবতার। এ'সবই ছিল আমার দুষ্টুমির ফল। আমাকে দলে টানলে লাভ বেশি—হয়তো তাঁদের মধ্যে এমন চিন্তা ছিল। অথবা, একটু বাড়তি তোল্লাই দিলে গুরুর ভাণ্ডাফোড় থেকে বিরত থাকবো—এমন ভাবনা ছিল।

আমার ওপর অবতারত্ব চাপিয়ে দেওয়ায় একবার খুব মুশকিলে পড়েছিলাম। গোরাচাঁদদের পরিবারের সকলেই জন্মসিদ্ধ বালক ব্রহ্মচারীর শিষ্য। গোরার সামনেই একগাদা শিষ্যদের কাছে আমাকে দাঁড় করিয়ে বালকব্রহ্মচারী বাছা বাছা বিশেষণে বুঝিয়ে দিলেন, আমি একজন অবতার। ব্যস। গোরাদের বাড়ি যাওয়ার জন্য গোরা বারবার অনুরোধ করতে লাগলো। বিপদের গন্ধ পেলাম। শেষ পর্যন্ত অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হল। আর ওদের বাড়িতে পা দিতেই কেলেংকারির একশেষ। গোরার মা-বাবা গুরুর কথায় বিশ্বাস করে আমাকে অবতার ঠাওরে আমার পা ধুইয়ে, মুছিয়ে প্রণাম নিবেদন করতে চান। গুরুভক্তদের 'সত্যি' বোঝানো যে কী কঠিন, তা সে'দিন হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছিলাম।

হিন্দু উপাসনা ধর্মের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। আর পাঁচটা উপাসনা-ধর্মের মতো কোনও একজন ঈশ্বর প্রেরিত দূত ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে বাণীগ্রহণকারীদের নিয়ে হিন্দু উপাসনা, ধর্ম গড়ে তোলেননি। এ'দেশে নানা পর্যায়ে, নানা কালে, নানা ভাবে ঈশ্বর বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের সঙ্গে মিশে ছিল নানা ধরনের জাদু-বিশ্বাস। এলো মুনি-ঋষি নামধারী জাদু-পুরোহিতদের রমরমার যুগ। তাঁরা দেবতার ওপরে নিজেদের স্থান পাকা করতে কৌশল-টৌশল করলেন। রসে-বসে দিব্বি রইলেন।

হিন্দু উপাসনা-ধর্মের মূল ধারাগুলো খুঁজে বের করার পর আর এক সমস্যা। যত ধর্মগুরু, তত ধর্মমত। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত—যে, দিকেই তাকান দেখতে পাবেন, যত গুরু ততই গুরুতর বিভেদ। এই ঐতিহ্য আমরা আজও বহন করে চলেছি।

আরও একটা মস্ত ঐতিহ্য বৈদিক ঋষিদের কাল থেকে আজও বজায় রেখে চলেছি—কিছু জ্ঞান দেওয়ার জন্য জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন বোধ করি না।

হিন্দু উপাসনা-ধর্মের 'পঞ্চোসাধনা' ও তন্ত্র

বর্তমানে ভারতে হিন্দু উপাসনা-ধর্মের ধারা পাঁচটি। (১) বৈষ্ণব, (২) শৈব, (৩) শাক্ত, (৪) সৌর, (৫) গাণপত্য। এই পাঁচটি ধারাকে একত্রে বলা হয় 'পঞ্চোসাধনা'। একটা ভুল ধারণা বহুল প্রচলিত—শাক্ত ধর্মেই শুধু তান্ত্রিক নীতি

প্রয়োগ করা হয়। বৈষ্ণব ধর্মেও তান্ত্রিক নীতি আছে। তার প্রমাণ মিলবে লক্ষ্মীতন্ত্রে (নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত) ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে। শৈব ও শাক্ত ধর্মের মূল তন্ত্রতত্ত্ব একই। পার্থক্য এই যে, শৈব ধর্মে পুরুষ নিষ্ক্রিয় হলেও প্রধান। শাক্ত ধর্মে প্রকৃতি বা নারী শক্তিই প্রধান। বৈষ্ণব ধর্মে বিষ্ণু-পুরুষ। লক্ষ্মী প্রকৃতি বা নারীশক্তি। কৃষ্ণ পুরুষ শক্তি, রাধা নারী শক্তি। শৈব ধর্মে শিবের শক্তি কালী, তারা ইত্যাদি। তন্ত্রের আকর-গ্রন্থ 'বৃহৎ তন্ত্রসারঃ'-এ বলা হয়েছে, ''ইনি (গণেশ) হস্তে পদ্ম, অঙ্কুশ এবং রত্নকুম্ভ ধারণ করিয়াছেন। ইঁহার ক্রোড়ে পদ্মের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট শক্তি আছেন, ঐ দেবীর যোনিদেশে ইঁহার (গণেশের) এক হস্ত নিহিত আছে এবং ঐ ক্রোড়স্থিতা শক্তি হস্তদ্বারা তাঁহার (গণেশের) ধ্বজাগ্রভাগ (লিঙ্গের মাথা) স্পর্শ করে রয়েছেন।'' (পৃষ্ঠা ২০৮)।

এই পুরুষ ও প্রকৃতি বা পুরুষ ও শক্তির মিলন নির্ভর ধর্মীয় ধারাগুলো তন্ত্র-সাধনারই ধারা। 'পঞ্চোসাধনাতে'-ই এই পুরুষ-প্রকৃতির মিলন নির্ভরতা আছে।

বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দুতন্ত্রের খিচুড়ি

ভারতে প্রাচীন আমল থেকেই বৌদ্ধতন্ত্রের একটি ধারা ছিল এবং এখনও বর্তমান। ভারতে বৌদ্ধতন্ত্রের যে ধারাটি বর্তমান তা হল মহাযান ও মহাযান থেকে উৎপন্ন নানা শাখা, উপশাখা ইত্যাদি। এ'গুলো আসলে হিন্দুতন্ত্রে-ই 'প্রোডাক্ট'।

মহাযান বৌদ্ধধর্মে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকবিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। স্থানীয় নানা দেব-দেবী বৌদ্ধধর্মে ঢুকে পড়েছিল। যে'হেতু সে সময়কার ভারতীয় সমাজ ছিল কৃষিনির্ভর, তাই ভারতে দেবীপ্রাধান্য ছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্মেও আমরা দেখলাম নানা দেবীর প্রাধান্য নিয়ে অনুপ্রবেশ। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বকে পুরুষ কল্পনা করে দেবীদের তাঁর সাধন-সঙ্গিনী, নারীশক্তি হিসেবে গ্রহণ করা হল।

তন্ত্রে বিশ্বাস প্রাক্-আর্য যুগ থেকেই ভারতবর্ষে ছিল। এবং এই তন্ত্রের ধারা ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি উপাসনা-ধর্মকেই প্রভাবিত করেছিল। বৌদ্ধধর্মের মহাযান এই মূলস্রোতের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়েছিল।

অনঙ্গবজ্রের 'প্রজ্ঞোপায় বিনশ্চয়সিদ্ধি' মহামানপন্থীদের একটি প্রামাণ্যগ্রন্থ। এই-গ্রন্থে আমরা দেখতে পাচ্ছি, পঞ্চ ম'কার সাধনার নির্দেশ। অর্থাৎ মদ, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা বা নানা বিচিত্র মৈথুন পদ্ধতি গ্রহণের নির্দেশ। মৈথুন-ই হল তন্ত্র সাধনার মূল অনুষঙ্গ। মহমুদ্রার অভিজ্ঞতার জন্য, অর্থাৎ নানা মুদ্রার সঙ্গে নিজের পরিচয় ঘটাবার জন্য নির্বিচারে নারী সম্ভোগের কথা গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়। তন্ত্র গ্রন্থটিতে আরও বলা হয়েছে—তন্ত্র যোগের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সাধককে তাঁর মাতা, কন্যা, ভগ্নি, ভাগিনেয়ীর সঙ্গে উপগত হতে হবে দ্বিধাহীন মনে। দ্বিধা-ই পাপ। কী ভয়ংকর অজাচার চাপিয়ে দেওয়া ধর্মের নামে।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে 'ধারণী' নামের এক ধরনের তন্ত্রশাস্ত্রের পরিচয় মেলে। এখানে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের উল্লেখ রয়েছে।

বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থটিতে উল্লেখ রয়েছে, 'ওঁ মণিপদ্মে হুম্' মন্ত্রটির। 'মণিপদ্মে' শব্দের অর্থ 'যোনিতে লিঙ্গ'। জানি না, যাঁরা শান্ত পরিবেশে 'ওঁ মণিপদ্মে হুম্' শব্দটি ব্যবহার করে একটা দারুণ কিছু মন্ত্র উচ্চারণের আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তাঁরা শব্দটির অর্থ জানেন কি না?

বৌদ্ধতন্ত্রের দুটি উল্লেখযোগ্য আকরগ্রন্থ 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' ও 'গুহ্যসমাজ'। বই দু'টির রচনাকাল খ্রিস্টিয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক।

বৌদ্ধতন্ত্রের এই দুই গ্রন্থের মতে, প্রতিটি সৃষ্টির পিছনেই রয়েছে নারী-পুরুষের মিলন। মিলনের ক্ষেত্রে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাই শ্রেষ্ঠ। প্রজ্ঞার সঙ্গে উপায়ের (পুরুষের) মিলনই প্রকৃত বোধ আনতে সক্ষম। সর্বোচ্চ অধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য নারী ও পুরুষের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক মিলনের প্রয়োজন। এই তিনের মিলনে সত্যের উপলব্ধি ঘটে। এই কথা মাথায় রেখে নারী-পুরুষের মিলন গুহ্য অর্থাৎ গোপন সাধনা হিসেবে কাম্য। এখানে নারী-পুরুষ সম্পর্ক সুন্দর ও স্বাভাবিক। প্রজ্ঞা নারী অর্থ ভগবতী নারী। অর্থাৎ 'ভগ' বা 'যোনি' বিশিষ্টা নারী। 'প্রজ্ঞা'র আসল অর্থ পুষ্ট যোনি। 'উপায়' বা আদর্শ-পুরুষের আর এক নাম বজ্র, যার অর্থ বজ্রের মত পুরুষাঙ্গ। প্রজ্ঞা ও উপায় অর্থাৎ পুষ্ট যোনি ও বজ্র কঠিন লিঙ্গের দীর্ঘ মিলন। শারীরিক মিলনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক মিলন জগতের সব কিছুকে ভুলিয়ে দিয়ে এক অনন্য সুখ ও আনন্দের জগতে নিয়ে যায়। এই মহাসুখ, এই অপার আনন্দই হচ্ছে নির্বাণ। এটাই মহাযানপন্থীদের বিভিন্ন শাখার মূল বিশ্বাস।

মহাযান থেকে মন্ত্রযান, মন্ত্রযান থেকে বজ্রযানের উৎপত্তি। বজ্রযানের একটি শাখা কালচক্রযান। বজ্রযানের দেবীরা হলেন প্রজ্ঞাপারমিতা, আর্য-তারা, লোচনা ইত্যাদি। কালচক্রযানের দেবীদের যেমন নাম, তেমনই ভয়ংকর তাদের চেহারা। এরা ভয়ংকর সব রক্তপিপাসু ডাকিনী। বঙ্গদেশ, মগধ, নেপাল ও কাশ্মীরে কালচক্রযান যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এই ডাকিনীরা আসলে কালীর অংশ। এরা উচ্চকলরব তুলে হাসে, ভয়ংকর ঝড় তুলে সমুদ্রকে আলোড়িত করে, রক্তপানে আনন্দ পায়।

বজ্রযান থেকেই উৎপত্তি সহজযানী বৌদ্ধধর্মের। সহজযানীরা তাদের ধর্মকে বাস্তবিকই সহজ-সরল রূপ দিয়েছিল। সহজযানীরাও মনে করতো—'যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাহা আছে দেহভাণ্ডে'। তারাও যোগের নীতিতে বিশ্বাস করতো। বিশ্বাস করতো মানব দেহের ছয়টি চক্র ও মস্তিষ্কের সহস্রদল পদ্মের অস্তিত্বে।

সহজযান মূলত বঙ্গদেশের নিজস্ব এক বৌদ্ধ মত। পাল আমলে সহজযানী বৌদ্ধদের রমরমা ছিল বঙ্গদেশে। পাল আমল বলতে ৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৩০

খ্রিস্টাব্দ। এই সময় বৌদ্ধধর্মের নামে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল ব্যাপক। পাল রাজারা বহু বৌদ্ধ মঠ ও বিহার তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেইসব মঠ ও বিহারগুলোতে তন্ত্র গবেষণার জন্য অঢেল অর্থ সাহায্য পাঠাতেন। সে'খানে বিভিন্ন ঘরে বৌদ্ধ-যুগনদ্ধ সাধনা অর্থাৎ মৈথুন সাধনা চলত। যার অর্থ হল নানা মুদ্রায় নারী-পুরুষের মিলনলীলা। এই মিলনের জন্য অঢেল নারী সরবরাহ করা হত। কারণ—যত নারী, তত শক্তি। যত বেশি নারীর সঙ্গে মিলিত হবে তত বেশি শক্তি অর্জন করবে, তত বেশি অলৌকিকক্ষমতা অর্জন করবে, ততই নির্বাণের দিকে এগোবে।

'রুদ্রযামল',, 'মহাচীনাচারক্রম' ইত্যাদি তন্ত্রগ্রন্থে বশিষ্ঠ মুনির সিদ্ধিলাভ নিয়ে একটি কাহিনীর উল্লেখ আছে। বশিষ্ঠ মুনি কামরূপের কামাখ্যা দেবীর কাছে দীর্ঘকাল সাধনা করেও সিদ্ধি লাভে ব্যর্থ হন। স্বয়ং তারাদেবী বশিষ্ঠকে দেখা দিয়ে বলেন, চিনদেশে গিয়ে বুদ্ধের কাছ থেকে তন্ত্র শিক্ষা নিতে। বশিষ্ঠ চিনে যান। বুদ্ধকে প্রথম যখন দেখলেন, তখন বুদ্ধ অসংখ্য নগ্না নারী পরিবৃত হয়ে রক্ত ও মদ্যপান করছেন। অবাক বশিষ্ঠকে বুদ্ধ বললেন, বিস্মিত হইও না। পঞ্চমকার ছাড়া সিদ্ধি বা নির্বাণের কোনও পথ নেই।

"মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনং এব চ।
পুনঃ পুনঃ সাধয়িত্বা পূর্ণ-যোগী বভুব সঃ।

মদ, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন দ্বারা বারবার সাধনা করে পূর্ণ-যোগী হতে হয়। কী ভয়ংকর কথা? 'পূর্ণ-যোগী' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি 'পূর্ণ-ভোগী'? প্রাচীন জাদু পুরোহিতরা সাধারণ মানুষদের কী আহাম্মক-ই না বানিয়েছিল। 'বানিয়েছিল' বলে ভুল করলাম—এখনও বানিয়ে চলেছেন।

মহাযানপন্থীদের অনেক শাখাই বুদ্ধের তিনটি মূর্তি রেখে পুজো করে। এই ত্রিমূর্তিকে বলে 'ত্রিকায়'। মূর্তি তিনটি হল : (১) ধর্মকায় অর্থাৎ বুদ্ধের অধ্যাত্মিক দেহ, (২) সম্ভোগকায় অর্থে-সম্ভোগের আনন্দপূর্ণ দেহ, (৩) রূপকায় অর্থে বাস্তব দেহ।

তিন বুদ্ধই সত্য। তিন বুদ্ধকে রেখে তাই পুজো করা হয়। সম্ভোগ বুদ্ধ হলেন তান্ত্রিক-বুদ্ধ।

বৌদ্ধতন্ত্র, বৈদিক যুগের যোগ ও পরবর্তীকালের তন্ত্র কুলকুণ্ডলিনী শক্তিতে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে চূড়ান্ত মিলনের বিস্ফোরণ কালে মস্তিষ্কের উষ্ণীষকমল হাজার পাপড়ি মেলে দেয়।

বৈষ্ণবধর্ম ও তন্ত্র

হিন্দু উপাসনা-ধর্মের অন্যতম প্রধান ধারা বৈষ্ণবধর্ম। সাধন-সিদ্ধ হওয়ার জন্য তন্ত্রের সেই পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব বৈষ্ণবধর্মেরও সার কথা।

যাঁরা মনে করেন বৈষ্ণবধর্ম ভক্তিযোগের ধর্ম, এখানে তন্ত্রের স্থান নেই—তাঁরা জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে ভুল বলেন। সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

হিন্দু উপাসনা-ধর্মে বিশ্বাসীদের মধ্যে যে সম্প্রদায় বিষ্ণু, নারায়ণ, বাসুদেব, কৃষ্ণ বা গোপাল ইত্যাদিকে উপাস্য দেবতা মনে করে, তারাই বিষ্ণুধর্মী বা বৈষ্ণব। ভারত বিরাট দেশ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈষ্ণবদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে।

বৈষ্ণবধর্মের শুরু সম্ভবত পশ্চিম ভারতে। বৈষ্ণবরা আদিতে যাদব উপজাতির মানুষ ছিলেন। কৃষ্ণ এই যাদব উপজাতির একজন বুদ্ধিমান বীর ছিলেন। কৃষ্ণকে পরবর্তীকালে দেবতা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং এক সময় কৃষ্ণ ও বৈদিক বিষ্ণুকে এক ও অভিন্ন বলে যাদবগোষ্ঠীরা মনে করতে থাকে। পরবর্তীতে অন্যরাও।

যাদবদের মধ্যে কৃষ্ণকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করা, ভালোবাসা উজাড় করে দেওয়া, এবং কৃষ্ণ ও বিষ্ণুকে অভিন্ন মনে করে নিজেদের বৈষ্ণবধর্মী বলে ঘোষণা করার আনুমানিক কাল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক।

নারায়ণকে যদিও কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন বলে বৈষ্ণবরা মনে করেন, কিন্তু নারায়ণ সম্ভবত 'নর' গোত্র বা 'ক্ল্যান'-এর কোনও বিশিষ্ট নেতা ছিলেন।

তৈত্তিরীয় অরণ্যকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নারায়ণ, বাসুদেব ও বিষ্ণুকে অভিন্ন বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে আমরা দেখতে পেলাম কৃষ্ণ, হরি, নর, নারায়ণ — চারজনকে অভিন্ন বলা হয়েছে।

পশ্চিম ভারতের পশুপালক উপজাতিগোষ্ঠী আভীর। তাদের নেতা 'কৃষ্ণ' গোপীদের সঙ্গে যে সব রসলীলা করেছিলেন—তা নিয়েও গড়ে উঠেছে আরও এক কৃষ্ণ চরিত্র।

কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম (১০৮টি নাম) দেখে মনে হয় আরও কিছু উপজাতিদের জাতির নায়ক বা দেবতার সঙ্গে কৃষ্ণের ট্রাইবাল চরিত্রগত মিল থাকার কারণে এক সময় এঁরা অভিন্ন চরিত্রের মান্যতা পায়। এইসব চরিত্রগুলো অভিন্নভাবে উঠে এসেছে মহাভারতে, গীতায়, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে।

মথুরার কাছে 'মোরা' থেকে একটি শিলালেখ পাওয়া যায়। লেখটি খ্রিস্টিয় প্রথম শতকের। এতে পাঁচ বৃষ্ণি বীরের কথা আছে। এরা হলেন, সংকর্ষণ (কৃষ্ণের বড় ভাই, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন (বাসুদেব বা কৃষ্ণের ছেলে), শাম্ব (বাসুদেবের আর এক ছেলে এবং অনিরুদ্ধ (প্রদ্যুম্নের ছেলে)।

বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলায় দ্বিতীয় শতকের তৈরি পাঞ্চাল রাজের যে মুদ্রা পাওয়া গেছে, তাতে শঙ্খ, চক্র, গদাধারী একটি চতুর্ভুজ মূর্তি উৎকর্ণ দেখা

যায়। অনুমান করা যায়, এ'ও বিষ্ণুধর্মের প্রভাবেরই ফল। কুষাণ আমলের শিলেও শঙ্খ, চক্র, গদাধারী চতুর্ভুজ মূর্তি পাওয়া গেছে।

এ'সব শিলালেখ, বৈদিক সাহিত্য, নানা উপজাতিদের ইতিহাস থেকে এমনটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর দেবতারা এক সময় অভিন্ন বলে ঘোষিত হয়েছিল। এইসব দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু, কৃষ্ণ, নারায়ণ, বাসুদেব, মধুসূদন, গোপাল ইত্যাদি প্রধান। এইসব অভিন্ন দেবতাদের উপাসনা পদ্ধতি বৈষ্ণবধর্ম বলে ঘোষিত হয়েছে।

আড়বার

ষষ্ঠ থেকে নবম শতকে দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব ধর্মের বিশাল প্রভাব ছিল। 'আড়বার' নামের বৈষ্ণব সাধক সম্প্রদায় চার হাজারের বেশি ধর্মীয় সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। এইসব গান ছিল কৃষ্ণ, নারায়ণ, বলরাম, ইত্যাদিদের নিয়ে।

একাদশ শতকে রামানুজ শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য হন। এই সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহলে শংকরাচার্যের বেদান্ত সূত্র যথেষ্টর বেশি প্রভাব ফেলেছে। শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ বা বেদান্ত সূত্রের মূল কথা—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। দৃশ্যমান বস্তুজগতের সব কিছুই মিথ্যা। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে রামানুজ বললেন, ব্রহ্ম থেকেই সবের উৎপত্তি। সবেই ব্রহ্ম বর্তমান। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় হলেও তিনি তিনটি রূপের প্রতীক। তিনিই জীব ও জড়জগতের স্রষ্টা বা নিমিত্ত, ভোক্তা এবং ধ্বংসের কারণ। রামানুজের রচনাবলীর মধ্যে বেদান্ত সূত্রের বৈশিষ্ট্য, দ্বৈতবাদী ভাষ্য, বেদান্তসার, বেদান্তদীপ ইত্যাদি বিখ্যাত।

নিম্বার্ক ও বল্লবপন্থী

নিম্বার্ক ছিলেন দ্বাদশ শতকের মানুষ। দক্ষিণ ভারতীয় হলেও তাঁর সাধনক্ষেত্র ছিল বৃন্দাবন। নিম্বার্কপন্থী বৈষ্ণবরা কপালে ও কণ্ঠে তিলক লাগান। গলায় তুলসীর মালা ধারণ করেন। উপাস্য গোপীজনবল্লভ হলেন পুরুষ এবং প্রকৃতি বা শক্তি হলেন রাধা।

বল্লভের জন্ম ১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে। দক্ষিণ ভারতের মানুষ হলেও তাঁর ধর্মীয় জীবন কেটেছে মথুরা, বৃন্দাবন ও বারাণসীকে কেন্দ্র করে। বল্লভপন্থীরা কৃষ্ণকে প্রেমিক, শৃঙ্গার রসের আধার, আনন্দময় পুরুষ বলে মনে করেন। বস্তুত কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং সব জীবাত্মাই নারী—এমনটা বিশ্বাস করেন। তাই নারীভাবে তাঁরা কৃষ্ণ ভজনা করেন। পরিধান করেন শাড়ি। এবং তাঁরা কৃষ্ণকেই স্বামী মনে করেন। গুজরাট ও রাজস্থানে বল্লভপন্থী বৈষ্ণবদের প্রভাব খুবই বেশি। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুবাদ অত্যন্ত প্রবল। সব কিছুই তাঁরা প্রথমে গুরুকে নিবেদন করে তারপর নিজেদের ভোগে লাগান। সব কিছুই।

স্বামীনারায়ণ একজন বল্লভপন্থী বৈষ্ণব। তাঁকে কেন্দ্র করে স্বামীনারায়ণ গোষ্ঠী ও স্বামীনারায়ণ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণবধর্ম

বল্লভেরই প্রায় সমসাময়িক ছিলেন শ্রীচৈতন্য। জন্ম ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর জন্ম বঙ্গদেশে হলেও কর্মক্ষেত্র ছিল বঙ্গদেশ ও ওড়িশা। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। ভক্তিবাদের ও প্রেমের প্লাবন এনেছিলেন। তাঁর বৈষ্ণবধর্মে জাত-পাত, ধর্মা-ধর্ম, নারী-পুরুষে কোনও ভেদ ছিল না। ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচারে মানসিকভাবে জর্জরিত অন্তজ শ্রেণীর মানুষরা আরও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে অত্যাচারিত নারীরা দলে দলে বৈষ্ণবধর্মকে গ্রহণ করলো।

শ্রীচৈতন্যের মতবাদ 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' নামে খ্যাত। তাঁর এই মতামত অনুসারে—ব্রহ্মা স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক প্রেমময়। এই মত শংকরাচার্যের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী।

চৈতন্যের মতে, স্রষ্টা-প্রভু-ঈশ্বর-ব্রহ্মা যে নামেই ডাক, সবই হলেন কৃষ্ণ। আর তাঁর শক্তি হলেন শ্রীরাধা। চৈতন্য বঙ্গদেশে ও ওড়িশায় ভক্তিবাদের প্লাবন এনেছিলেন, যে ভক্তির আবেগ যুক্তির সবচেয়ে বড় শত্রু।

পাল রাজাদের আমলে বৈষ্ণবদের মধ্যে বৌদ্ধ সহজযানের বিকাশ ঘটতে দেখেছি আমরা। আবার বৈষ্ণবধর্ম সহজযানীদের প্রভাবিত করেছিল। বাংলাদেশের বৈষ্ণবধর্মে ও বৈষ্ণব সাহিত্যে পরকিয়া প্রেমের জয়গান সহজিয়াপন্থাকেই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নারী-পুরুষের ভাললাগার সঙ্গে কণ্ঠি-বদল, ঘর বাঁধা বা দেহতত্ত্বের গান গেয়ে যাযাবর জীবনে ভেসে যাওয়া—এ'সব মিলিয়েই 'সহজিয়াধর্ম'। যখন মনের মিলে চিড় ধরতো, তখন সম্পর্কের ভারি বোঝা টেনে না বেড়িয়ে আবার দু-জন যেত দু'পথে। সম্পর্ক খারাপ না করেই দু'পথে। এ'যেন আধুনিক যৌথজীবনের বাস্তব রূপ।

অকিঞ্চন দাসের 'বিবর্তবিলাস' গ্রন্থ থেকে আমরা বেশ কিছু বৈষ্ণব সাধকদের সাধনসঙ্গিনী বা তন্ত্রসঙ্গিনীর নাম জানতে পারি।

চৈতন্যের সাধনসঙ্গিনী ছিলেন সাঠি। রঘুনাথের মীরাবাঈ, শ্রীরূপের মীরা, ভট্টরঘুনাথের, কর্ণবাঈ, সনাতনের লক্ষ্মীহীরা। কৃষ্ণদাসের সাধনসঙ্গিনী ছিলেন গোপকন্যা পিঙ্গলা, শ্রীজীবের নাপিতকন্যা শ্যামা। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, সনাতন, গোপাল ভট্ট—প্রত্যেকেরই বৈষ্ণবতন্ত্র মত অনুসারে সাধনসঙ্গিনী ছিল।

লক্ষ্মীতন্ত্র মতে—নারায়ণ বা বিষ্ণু পুরুষ এবং লক্ষ্মী তাঁর শক্তি। লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর চেয়ে অনেক বড় করে দেখানো হয়েছে। বিষ্ণু এখানে বীজ দানকারী, কিন্তু লক্ষ্মীই সৃষ্টির কারণ। শক্তিরূপী লক্ষ্মীকে তুষ্ট করার জন্য পঞ্চমকার সহযোগে বামাচারী সাধনার কথা বলা হয়েছে।

'গুহ্যাতিগুহ্য' তন্ত্রে বিষ্ণুর দশ অবতারের সঙ্গে দশ শক্তি মহাবিদ্যার সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে।

বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত হলেও পঞ্চমকার ও বামাচার ছাড়া সাধনায় সিদ্ধিলাভের কোনও উপায় নেই। শুধু ভক্তিবাদে উত্তোরণের উপায় নেই। তাই ভক্তিবাদের প্রবক্তা শ্রীচৈতন্যকেও শক্তিরূপা সাঠির সঙ্গে মিলনসাধনা করতে হয়েছিল।

এখানে, পুরোহিত নির্ভরতা বা যাগ-যজ্ঞ, আচার সর্বস্বতা, উৎকট যৌনাচার ইত্যাদি ছিল না। সে'দিক থেকে বৈষ্ণব দেহতত্ত্ব অনেক বেশি মানবিক, অনেক বেশি প্রগতিশীল।

শৈবধর্ম ও তন্ত্র

মহেঞ্জোদারো হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন যা পাওয়া গছে, তা থেকে এই সিদ্ধান্তে দ্বিধাহীনভাবে পৌঁছে যাওয়া যায় যে, সেই সময়ে কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার কারণে উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাস ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ নিয়ে আমরা আগেই যথেষ্ট আলোচনা করেছি। পুরানিদর্শন হিসেবে প্রচুর শিব লিঙ্গ পাওয়া গেছে— তাও বলেছি। যা বলা হয়নি তা হল, এখনও মন্দিরে মন্দিরে যোনি ও লিঙ্গের যুগল মূর্তিকে পুজো করা হয়। প্রাক অর্থ যুগ থেকে গুপ্ত সম্রাটদের যুগের (৩২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৪৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) সময় পর্যন্ত শিব লিঙ্গের সঙ্গে যোনি যুক্ত ছিল না। লিঙ্গ ও যোনিকে পৃথক পৃথক মূর্তিতেই পুজো করা হত।

শিব পুজোর বা লিঙ্গ পুজোর সঙ্গে তন্ত্র জড়িত হওয়ারই ফল হিসেবেই যোনি মধ্যে লিঙ্গ যুক্ত করে পুজোর শুরু।

ঋক্‌বেদে শিব নেই। আছে লিঙ্গ পুজোর নিন্দে। যজুর্বেদেও শিব অনুপস্থিত। অথর্ববেদে পশুপতি ও মহাদেব নামের দুই দেবতাকে আমরা পেলাম। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আমরা শিব নামটি পেলাম, তবে রুদ্রের সঙ্গে যুক্ত করে।

পাশুপত

মহাভারতের শান্তিপর্বে আমরা শিবের নাম পাচ্ছি, যিনি পাশুপত ধর্ম, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাশুপত ধর্মের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য হল, কার্য, কারণ, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত। পাশুপতপন্থীরা কার্য-কারণ সম্পর্কে বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস করেন যোগ সাধনায়,

নিয়ম-বিধি পালনে। বিশ্বাস করেন, দুঃখ আছে, তার নিবৃত্তির উপায়ও আছে। পাশুপত ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের একটা মিল পাওয়া যায়। দুই ধর্মেই জাত-পাতের ভেদ নেই।

বৌদ্ধধর্ম আগে এসেছিল, না পাশুপত ধর্ম? উত্তর খুঁজতে আমাদের তাকাতে হবে মহাভারতের রচনাকালের দিকে। মহাভারতের আনুমানিক রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতক। শান্তিপর্ব লেখা হয়েছে বুদ্ধের মৃত্যুরও কয়েক'শ বছর পরে। ফলে বুঝতে অসুবিধে হয় না, পাশুপত ধর্মে বুদ্ধের প্রভাব ছিল।

পাশুপত ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মিল যেমন আছে, অমিল তেমন আছে। বৌদ্ধ ধর্ম নৈতিক অনুশাসনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল সবচেয়ে বেশি। পাশুপত ধর্ম যোগ ও তন্ত্রকে গুরুত্ব দিয়েছিল সর্বাধিক। বৌদ্ধ ধর্ম নিরীশ্বরবাদী।। পাশুপত ধর্মে ঈশ্বর আছেন। সেই ঈশ্বর হলেন শিব।

পাশুপত ধর্ম অনুসারে দুঃখের নিবৃত্তি করা যায় দুটি পথে। (১) যোগ। যোগ নিয়ে আগেই বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে, তাই আবার আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। (২) বিধি। বিধি বলতে বলা হয়েছে—শরীরে ছাই মাখবে, ছাইয়ের গাদায় শোবে, হাসবে-গাইবে-নাচবে, জেগে থেকে ঘুমোবার ভান করবে, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কাঁপাবে, মেয়েদের দেখলে আদিরসাত্মক শারীরিক ভঙ্গি প্রদর্শন করবে। এমন সব আচরণ করবে, যাতে সাধারণ মানুষ পাগল বলে মনে করে। এদের আমরা দেখতে পাই কুম্ভমেলায় 'নাগা (নাঙ্গা)' সন্ন্যাসীরূপে।

নায়নার

দক্ষিণ ভারতে শৈব ধর্মের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। এখান থেকেই বেশ কিছু শৈব মতবাদ উঠে এসেছিল। 'নায়নার' এমনই এক শৈব সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় শৈব ধর্মের উপর বহু গ্রন্থ ও হাজার হাজার শ্লোক রচনা করেছেন। 'পেরিয়াপুরাণম' গ্রন্থে নায়নার সম্প্রদায়ের ৬৩ জন শৈব সিদ্ধ সাধকের জীবনী লেখা আছে। গ্রন্থটি পড়ে, বোঝা যায় নায়নার শৈব সম্প্রদায় জাত-পাত মানতো না। কারণ এই ৬৩ জন সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যে ব্রাহ্মণ থেকে পতিত জাতির মানুষ সবই আছেন।

তামিল সাহিত্যে ভক্তিবাদের প্রচলন ও প্লাবন আসে 'নায়নার' সম্প্রদায়।

শৈব সিদ্ধান্ত

'শৈব সিদ্ধান্ত' দক্ষিণ ভারতের আরও একটি শৈব সম্প্রদায়ের নাম। এঁরা ছিলেন চূড়ান্ত ভক্তিবাদী। এঁদের মতে 'যোগ জ্ঞান' দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন ঘটানোর পথ যথেষ্ট কঠিন। তারচেয়ে অনেক সোজা চর্যা মার্গের মধ্য দিয়ে পরমাত্মা বা ঈশ্বর লাভ। সাধকের জীবনচর্যাই হবে এমন যে সে নিজেকে শিবের অনুচর

ভৃত্য বলে মনে করবে। এভাবেই ভক্তির দ্বারা সবচেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছের মানুষ হওয়া যায়। শিবকে উপলব্ধি-ই মোক্ষ বা সিদ্ধি।

এখানেও আমরা দেখলাম ভক্তির বন্যা। আবেগের আধিক্য।

আগমান্ত

দক্ষিণ ভারত থেকেই উঠে এসেছিল আরও একটি শৈব ধর্মীয় সম্প্রদায়। নাম— আগমান্ত শৈবধর্ম। এই সম্প্রদায় মনে করে 'আগম শাস্ত্র' অপৌরুষেয়। এগুলো স্বয়ং শিব তাঁর পঞ্চমুখে বর্ণনা করেছিলেন। আগমশাস্ত্র আসলে তন্ত্রশাস্ত্রেরই একটা ধারা। এই সম্প্রদায় 'অষ্টযোগ' প্রক্রিয়ার দ্বারা নানা অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করার কথা বিশ্বাস করে। 'যোগ' নিয়ে আলোচনায় আগেই আমরা অষ্টযোগের কথায় এসেছি। এছাড়াও ওঁরা বিশ্বাস করেন, মানুষের দেহে ষট্‌চক্রের অবস্থানে। বিশ্বাস করেন, কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে মাথার খুলির নীচে থাকা সহস্রদল পদ্মকুঁড়ি ফুটে উঠবে। পদ্ম পাপড়ি মেলতেই কুড়ির ওপর ফণা মেলে থাকা সাপ ফণা গুটিয়ে নেবে। এই সাপই মহাশক্তি। পদ্মের বীজে রয়েছেন স্বয়ং শিব।

এই শৈব সম্প্রদায় যে শিব-শক্তির মিলন বা দেহতত্ত্বে বিশ্বাস করেন, এ'কথা বোধহয় আরও একবার মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল না, যোগে দেহতত্ত্বের কথা শিব-শক্তির মিলনে পরম ব্রহ্ম বা শিব লাভের কথা বহুবার উল্লিখিত হয়েছে।

বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎ

শৈব ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও প্রগতিশীল সম্প্রদায় হল 'বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎ'। এই শৈব সম্প্রদায়ের প্রাণপুরুষ ছিলেন কন্নড় ব্রাহ্মণ বাসব। বাসব ছিলেন চালুক্যরাজ বিজ্জলের অত্যন্ত প্রভাবশালী মন্ত্রী। চেয়েছিলেন কর্ণাটক থেকে জৈনদের ঝেঁটিয়ে, বিদায় করে শৈব ধর্মকে সংস্কার করে প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি একদিকে যেমন প্রকৃতই ধর্ম-সংস্কারকের ভূমিকা নিয়েছিলেন, আর একদিকে তেমন-ই জৈনধর্মকে কর্ণাটক থেকে উৎখাত করে ছেড়েছিলেন।

বাসবের এই বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎরা জাত-পাত ও নারী-পুরুষের ভেদাভেদে বিশ্বাস করে না। বাসব স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের বুদ্ধি ও পদমর্যাদাকে ব্যবহার করেছিলেন।

উচ্চবর্ণদের কায়িক শ্রমের উপর নিষেধাজ্ঞার ঐতিহ্য চলে আসছিল বৈদিক যুগ থেকে। উচ্চবর্ণদের মধ্যেও কায়িকশ্রমে উৎসাহ দিলেন বাসব। তিনি বাণিজ্যের ওপরেও জোর দিলেন।

এইসব নিত্য নতুন নিয়ম প্রবর্তন ও সমাজ-সংস্কার করতে গিয়ে রাজা বিজ্জলের সঙ্গে বাসবের মতবিরোধ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছোয় যে, পরিণতিতে বাসবের

চক্রান্তে বিজ্জল নিহত হন। এতে বাসবের রাজনৈতিক ক্ষমতা যেমন বাড়ে, তেমনই গতি পায় সমাজ সংস্কার।

বাসবের উপদেশগুলো 'বচন' নামে পরিচিত এবং বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎদের পবিত্র ধর্ম উপদেশ হিসেবে গৃহীত। বীরশৈবরা শক্তির প্রাধান্যকে স্বীকার করে। বীরশৈব মতকে অনেক দার্শনিকই 'শক্তিবিশিষ্টদ্বৈতবাদ' বলে উল্লেখ করেছেন।

বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎরা শিবলিঙ্গের মূর্তি বা খোদিত মূর্তি অথবা ছবি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ধারণ করেন। এই সম্প্রদায়ে বাল্য-বিবাহ নিষিদ্ধ। ওই সময়ে দাঁড়িয়ে এই হিন্দু ধর্মীয় গোষ্ঠী বিধবা বিবাহকে নিজেদের সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য করেছিল। উচ্চবর্গের অনগ্রসর, প্রাচীন ও স্থবির ধ্যান-ধারণাকে দূর করতে বাসব যথেষ্ট কড়া হাতে তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর কাজে জনসমর্থন যোগাড় করতে বীরশৈবপন্থীদের যথেষ্ট উদ্দীপ্ত করেছিলেন, লড়াকু চরিত্র দিয়েছিলেন। পাশাপাশি বীরশৈবদের অবশ্য পালনীয় নীতিতে স্থান পেল—অন্নদান, জল দান, ওষুধ দান ও বিদ্যা দান।

শংকরাচার্যের মায়াবাদকে বাসব খণ্ড করেছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে। তিনি শিব ও শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

বাসবের মতে জীব ও জড় জগতের সৃষ্টি ও তার ক্রমবিবর্তনকে বাস্তব সত্য বলে স্বীকার করলে শংকরাচার্যের 'মায়াবাদকে' অস্বীকার করতেই হয়। ক্ষিদে, তৃষ্ণা ও অসুখ হলে অন্ন, জল ও ওষুধ গ্রহণ না করে 'সবই মায়া' বলে শংকরাচার্যপন্থীরা কি চুপ করে বসে থাকেন?

তাঁদের অন্ন, জল, ওষুধ, গ্রহণ করেই বাঁচতে হয়। নীতি এক রকম, চর্যা (জীবনযাপনপ্রণালী) আর এক রকম হওয়াটা নীতিহীনতারই লক্ষ্মণ।

বৈদিক সাহিত্যে শিব

বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্যে শিব সম্পর্কে কিছু কিছু কথা লেখা হয়েছে। এসব পড়ে বুঝতে অসুবিধে হয় না নিম্নবর্গের মানুষদের দেবতা শিবের প্রতি তাদের বিরূপতা ছিল স্পষ্ট।

ভাগবত পুরাণে শিবকে তমোগুণের আধার, উন্মাদ ও উন্মাদদের প্রিয়, শ্মশানচারী, বাঁদরের মতো চোখ, কাজ-কর্মহীন, দিগম্বর, জটাধারী চিতাভস্মে স্নানকারী, মুণ্ডমালা ধারণকারী, অমঙ্গলকারী ইত্যাদি বলে ধিক্কার জানানো হয়েছে।

ঋক্‌বেদের কেশীসূক্তে বলা হয়েছে—শিব-পূজকরা ধুলো-ছাই মাখা, মলিন বস্ত্রধারী, দীর্ঘকেশধারী উন্মত্তপ্রায় এক শ্রেণীর মুনি।

নাঙ্গা সন্ন্যাসী ও শৈবধর্ম

এই শিব পূজকরাই আজকের নাঙ্গা সন্ন্যাসী। কুম্ভমেলা থেকে সাগরমেলা—সর্বত্রই এরা বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এরা মেলার ভিভিআইপি। অসাধারণ এদের দাপট। নগ্নশরীরে ছাই মাখা। মাথার জটা ধরা দীর্ঘ চুল। চোখ সব সময়ই নেশায় টক্‌টকে লাল। এর দামী এসি লাগানো তাঁবুতে থাকে। কানে ওয়াকম্যান। দামি মটোরবাইকে ঝড় তুলে ছুটে বেড়ায়। সুন্দরী তরুণী দেখলে লিঙ্গ প্রদর্শন করে প্রকাশ্যে অশ্লীল আহ্বান জানায়। স্নানের যোগে বা মুহূর্তে এদের স্নানের অধিকার সবার আগে। অশ্লীল, বেপরোয়া এইসব মানুষগুলোকে দেখে ভক্তি-গদগদ হন মন্ত্রী থেকে আমলা ও তাদের পরিবারের লোকজন। প্রতিবার মেলাতেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে চলছে।

এদের 'পাবলিক নুইসেন্স অ্যাক্ট'-এ ধরার কেউ নেই। আসলে ধর্মের নামে যে কোনও আইন-ই বোধহয় এ'দেশে ভাঙা যায়।

"শিবঠাকুরের আপন দেশে আইন কানুন সর্বনেশে।"

সৌরধর্ম ও তন্ত্র

ঋক্‌বেদে সূর্য বা আদিত্য দেবতা ছয়জন। (১) মিত্র, (২) অর্যমা, (৩) ভগ, (৪) বরুণ, (৫) দক্ষ, (৬) অংশু। তৈত্তিরীয়'তে সূর্য-দেবতা বা আদিত্য দেবতা আটজন। (১) মিত্র, (২) বরুণ, (৩) ধাতা, (৪) অর্যমা, (৫) অংশু, (৬) ভগ, (৭) ইন্দ্র, (৮) বিবস্বান। শতপথ ব্রাহ্মণে বারো আদিত্য বারো মাসের প্রতীক। এই বারো আদিত্যের সৃষ্টি তত্ত্বে পুরাণে বলা হয়েছে—স্ত্রী সংজ্ঞা পতি সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে পিতা বিশ্বামিত্রকে সমস্যার কথা জানান। বিশ্বামিত্র সূর্যের তেজ কমাতে সূর্যকে বারো টুকরো করেন। এই বারো টুকরো সূর্য-ই হল বারো আদিত্য। এসব নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

সূর্য দেবতার কল্পনা আর্যভাষীরা ইরান থেকেই এনেছিল। ইরানের সূর্য-দেবতার নাম ছিল মিথ; আর্যভাষীদের সূর্য দেবতা হলেন মিত্র। গুপ্ত যুগে ও তার পরবর্তীকালে উত্তরভারতে যে সব সূর্যমূর্তি পাওয়া গেছে, তাদের পায়ে দেখা যায় বুটজুতো, যেমনটা দেখা যায় কণিষ্কমূর্তিতে। এই জুতোও ইঙ্গিত বহন করে যে, সূর্য দেবতার ভাবনা এসেছিল ইরান থেকে। কারণ ইরানিয় দেবতাদের মধ্যে বুটজুতোর প্রচলন ছিল।

হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভাকরবর্ধন সৌর ছিলেন। মুলতান, গুজরাট, কচ্ছে সূর্য-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ওড়িশার কোণার্কে তেরশো শতকে সূর্য মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন রাজা নরসিংহবর্মা। কাশ্মীরের মার্তণ্ডদেবে খ্যাতিও যথেষ্ট।

কিন্তু এখন সূর্য পূজার জনপ্রিয়তা অনেক কমে গেছে। বিহার ও তার আশে পাশের অঞ্চলে সূর্য-পূজা 'ছট্ পূজা'র অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। এ'খানে সূর্য-পূজক প্রায় সকলেই নারী। তারাই উপোস করে দণ্ডি কেটে জলাশয় পর্যন্ত যায় সূর্য পুজো করতে। পরদিন স্নান করে সূর্য প্রণাম সেরে উপোস ভঙ্গ। ছট্ পুজো

অনেকটা যেন ব্রত-পালন। সূর্য পুজোর সঙ্গে ব্রাহ্মণ-পুরুষদের সম্পর্ক গায়ত্রী মন্ত্রে।

গায়ত্রী মন্ত্রের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক

ব্রাহ্মণদের দিনে তিনবার গায়ত্রী মন্ত্র পাঠের বিধান রয়েছে। ভোরে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে উপবীত গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ গায়ত্রী জপ না করলে সে শূদ্রে পতিত হয়।

'তন্ত্রতত্ত্ব' গ্রন্থে তান্ত্রিক পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য বলছেন, "গায়ত্রীই সাবিত্রী—সূর্যদেবতার প্রকাশক।"

প্রাতের সূর্য, মধ্যাহ্নের সূর্য ও সায়াহ্নের সূর্যের সঙ্গে গায়ত্রী সম্পর্কযুক্ত। (১) প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করেন। গায়ের রঙ রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা, এক হাতে অক্ষসূত্র, অন্য হাতে কমণ্ডলু। ইনি ব্রহ্মের কন্যা এবং ঋক্‌বেদের সঙ্গে সম্পর্কিতা। (২) 'মধ্যাহ্ন সাবিত্রী'। রবিমণ্ডলের মধ্যে এঁর অবস্থান। চতুর্ভুজা, চার হাতে রয়েছে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। বাহন গরুড়। ইনি বিষ্ণুর শক্তি। যজুর্বেদের সঙ্গে সম্পর্কিতা। (৩) 'সায়াহ্ন সরস্বতী' রবিমণ্ডলে সায়াহ্ন সূর্যের মধ্যে এঁর অবস্থান। শুক্লবর্ণা, দ্বিভুজা। এক হাতে ত্রিশূল, অন্য হাতে ডমরু। ত্রিনয়নী। বাহন বৃষ। রুদ্র দেবের সঙ্গে এবং সামবেদের সঙ্গে সম্পর্কিতা।

গায়ত্রীর তিন দেবী মাতৃবীজরূপিনী সূর্যমণ্ডলে অবস্থানকারী, তিন মহাশক্তি বা কুণ্ডলিনী। এই তিন মহাশক্তিকে দিনের তিনটি সময়ে তিনরূপে চিন্তা করে ষটচক্র ভেদ করে মস্তিষ্কের সহস্রদল পদ্মকে প্রস্ফুটিত করা যায়—তন্ত্র এমনটাই বিশ্বাস করে।

গায়ত্রীর তিন মাতৃকাশক্তির পুরুষ হলেন যথাক্রমে ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। পরশুরাম-কল্পসূত্রকার বলছেন, "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং, তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতং, তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চমকারাঃ.......(১/১১)" অর্থাৎ ব্রহ্মই আনন্দ, আনন্দের অবস্থান দেহে, আর পঞ্চম'কার সেই আনন্দের অভিব্যঞ্জক। (পঞ্চমকার অর্থে—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন)।

সৌরধর্ম শেষ পর্যন্ত পঞ্চম'কারের গণ্ডীতে আবদ্ধ এক তন্ত্রধর্ম।

গাণপত্য ও তন্ত্র

অতুলচন্দ্র গুপ্তের কথায়—আদিতে গণেশ কর্মসিদ্ধির দেবতা ছিলেন না। ছিলেন কর্মবিঘ্নের দেবতা, অনেকটা শনির মতো।

ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন, আমরা গণদেবতা বলতে গণেশকে বুঝি। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, গণপতি বা গণেশ একজন নন, বহু।

মানবগুহ্যসূত্রে আমরা গণেশের যে ছবি পাই, তা যথেষ্ট-ই ভয়াবহ। এই সূত্র আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রচিত। সূত্র মতে, কারও উপর গণেশের বা গণপতির দৃষ্টি পড়লে বিঘ্নের শেষ নেই। কুমারীর বিয়ে হয় না, বিবাহিতার সন্তান হয় না, সন্তানবতীর সন্তানবিয়োগ হয়, রাজা রাজ্য হারায়, গুরুর শিষ্য জোটে না, চাষীর ফসল গোলায় ওঠে না, বাণিজ্যের লাভ বণিকের ঘরে ঢোকে না।

যাজ্ঞবাল্কস্মৃতি রচিত হয়েছিল মানবগুহ্যসূত্র রচিত হওয়ার কয়েক'শ বছর পরে। তখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি, গণেশ বা গণপতির দৃষ্টি শুধু ক্ষতি ও বিঘ্নই ঘটায়।

এ'সব দেখে মনে হয়, গণপতি বলতে 'জনগণের পতি' বা শাসকশ্রেণীকেই বোঝানো হয়েছিল। শাসকশ্রেণীর কুদৃষ্টি তখনও গৃহস্থের ক্ষতির কারণ হত।

ধর্মীয়-আইনের স্রষ্টা মনু গণেশকে শূদ্রদের দেবতা বলে উল্লেখ করেছেন। গণেশ-পূজকদের উচ্চবর্ণের শ্রাদ্ধ বাড়িতে প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

গণপতি বলতে সম্ভবত ট্রাইব বা উপজাতিদের নেতাদের-ই এক সময় বোঝানো হত। তাই ব্রাহ্মণ্যবাদীরা গণপতি-বিরোধিতা করেছিল।

শিব ও কিরাতকন্যা পার্বতীর মতই গণেশ প্রথম দিকে আর্যভাষীদের কাছে ব্রাত্য ছিলেন। পরবর্তীকালে শিব-পার্বতীর সঙ্গেই গণেশ একটু একটু করে জাতে ওঠেন। পরিচিত হন শিব-পার্বতির পুত্র হিসেবে। সর্ববিঘ্নকারী গণপতি শেষ পর্যন্ত হয়ে গেলেন বিঘ্ননাশক সিদ্ধিদাতা।

গণেশকে নিয়ে নানা মুনির নানা মত। বৈষ্ণবৈবর্তপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, গণেশপুরাণ, নারদপুরাণ গণেশকে নিয়ে নানা কাহিনী হাজির করেছে। একটার সঙ্গে আর একটার মিল নেই। মিল থাকারও কথা নয়। দেবতারা তো ইতিহাসের চরিত্র নয়, তাঁরা কল্পনার সৃষ্টি। স্রষ্টা মুনি-ঋষি বা জাদুপুরোহিতরা। স্রষ্টারা নিজেদের মনের মতো করে দেবতাদের চরিত্র গড়ে ছিল বলেই গণেশসহ সব দেবতাদের জন্ম থেকে কর্ম—সবেই অনেক গরমিল।

গণেশের চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে পৌরাণিক অভিধান রচয়িতা সুধীরচন্দ্র সরকার জানাচ্ছেন, দেহ খর্বাকৃতি, ত্রিনয়ন, চার হাত। হাতে আছে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। মাথা হাতীর। বাহন মূষিক। কারণ এই মূষিক বৃষরূপধারী ধর্মের অবতার। গণেশের 'শক্তি' হলেন পুষ্টি।

আবার মহারাষ্ট্রের গণেশমূর্তির হাতে পাশ, অঙ্কুশ, গদা ও ডালিম ফল দেখা যায়। গণেশের গায়ের রং টুকটুকে লাল। লাল রঙের সঙ্গে আদিম সমাজের রজঃ-চিন্তার প্রভাব আছে বলে অনেক পণ্ডিতের অনুমান।

গণেশ পূজার প্রাচীন-বিধি পুরোপুরি তন্ত্র নির্ভর। বর্তমানে গণপতির পুজো সর্বজনীন উৎসবের রূপ নিয়েছে। ফলে গুহ্য বা গোপন তন্ত্র-মতে গণপতির পুজো

প্রকাশ্যে সম্ভব হচ্ছে না। 'গণেশ-তন্ত্র' মতে, গজানন প্রচণ্ড সুরা ও নারী-শক্তিতে আসক্ত। সুরাপান করতে করতে তিনি তাঁর শক্তির সঙ্গে শৃঙ্গার করেন।

গণেশ পূজকদের ছ'টি ধারা। সেগুলো যথাক্রমে উচ্ছিষ্টগণপতি, মহাগণপতি, নবনীতগণপতি, হরিদ্রাগণপতি, স্বর্ণগণপতি এবং সন্তানগণপতি।

উচ্ছিষ্ট-গাণপত্যরা মনে করেন, উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র বলে কিছু নেই। কেউ খেতে খেতে খাওয়া শেষ না করেই উঠে গেল, তার পড়ে থাকা খাবারকে উচ্ছিষ্টজ্ঞান করা অর্থহীন। কারণ সে প্রথম গ্রাস খাবার গ্রহণের পর তো উচ্ছিষ্টই খায়। খাদ্যবস্তু খাবার জন্য। একের খাবার পর দ্বিতীয়জন সেই খাবার গ্রহণ করলে তাকে উচ্ছিষ্ট গ্রহণ ভাবার কোনও কারণ নেই। নারী-পুরুষের সম্পর্কটাও অনেকটা একই রকম। এক নারী ও এক পুরুষের আমরণ সম্পর্ক, বহুর সঙ্গে মিলনের আনন্দ উপভোগের পক্ষে বাধা। বিয়ে-ই এই বাধার সৃষ্টিকারী। নারী-পুরুষের মিলন সব সময়ই সুন্দর। এই মিলনের পর কেউ-ই কারও উচ্ছিষ্ট হয়ে যায় না। পরবর্তী মিলন-পুজোয় ব্রাত্য হয়ে যায় না। এই গাণপত্য শাখার নীতিতে বিশ্বাসীরা বিবাহ সংস্কার বর্জিত। জাত-পাতকে চাপিয়ে দেওয়া বিভাজন মনে করেন। জাত-পাতে বিশ্বাস করেন না। সুরাপানকে পঞ্চমকারের অঙ্গ হিসেবে এবং সুরাকে আনন্দদায়ক পানীয় বলে মনে করেন। পাপ-পুণ্যের ভেদ করেন না। এ-সবই আমাদের আদিম সমাজের ভাবধারারই স্মারক।

মহা-গাণপত্যরা মনে করেন গণেশ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। সৃষ্টি-কাজে সব সময় ব্যস্ত থাকেন। সৃষ্টির জন্যেই তিনি শক্তির সঙ্গে অনন্ত মিথুনরত।

হরিদ্রা-গাণপত্যরা বিশ্বাস করেন, গণপতি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদি কারণ। ব্রহ্মাদি দেবগণের তিনি অংশস্বরূপ। এই সম্প্রদায়ের উপাসকরা তাঁদের বাহুতে গণেশের মুখ এঁকে রাখেন।

গাণপত্যদের প্রভাব পশ্চিম-ভারতেই প্রধানত সীমাবদ্ধ। হাল-খাতায় হিন্দু ব্যবসায়ীরা গণেশ ও লক্ষ্মীর পুজো করে। গাণপত্যে ও লক্ষ্মীতন্ত্রে বিশ্বাস না করলেও করে। এটা এখন ব্যবসার একটা প্রচলিত প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণেশ ও লক্ষ্মীকে প্রতিদিন জল-বাতাসা, নকুলদানা বা সন্দেশ দেওয়া সেই প্রথারই অঙ্গ। দোকান একদিন বন্ধ মানে গণেশ-লক্ষ্মীর নির্জলা উপবাস।

গণেশকে জল বাতাসা দেবার পরও ফি-বছর প্রচুর ব্যবসা লাটে উঠছে। আর আমরা গল্পের সেই ভেড়ার পালের লাঠি সরিয়ে নেবার পরও লাফিয়েই চলেছি। গল্পটা অনেকেরই জানা। পালের প্রথম ভেড়ার সামনে একটা লাঠি আড়াআড়ি করে একটু উঁচুতে ধরুন, ভেড়াটা লাফিয়ে পেরুবে। এবার লাঠি সরিয়ে নিন। দেখবেন সব ভেড়াই ওখানে এসে লাফিয়ে পেরুচ্ছে।

গণেশকে পুজো করে দেশের অর্থনীতি ফেরাতে পারবো—এমনটা বিশ্বাস করার মত মানুষ এদেশে সংখ্যায় বেশি ভেবে কষ্ট হয়।

অধ্যায় ঃ নয়

শক্তিধর্মে তন্ত্র

কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই পাল্টায়। অন্তত সংস্কৃতি তো পাল্টায়-ই। সংস্কৃতি পাল্টাবার গতি নির্ভর করে স্থান ও কালের উপর। যে গতিতে ইউরোপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চিন এগিয়েছে, তার সংস্কৃতি এগিয়েছে, তার ধারে কাছেও যেতে পারেনি এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশগুলো। এখনও ও'সব মহাদেশ ও উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্র জাঁকিয়ে বসে আছে তুক্‌তাক, ঝাড়ফুঁক, ব্ল্যাক-ম্যাজিক, ভুডু-মন্ত্র ও জাদু-পুরোহিতরা। এখনও আফ্রিকা ও লাতিন-আমেরিকার দেশগুলো ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল খেলতে আসে জাদু-পুরোহিত নিয়ে। বিশ্বাস করে জাদু-পুরোহিতরা তুক্‌তাক্ করে কাপ জিতিয়ে দেবে। এখনও এ'দেশের কোটিপতি জুয়েলাররা দোকানের কোটি টাকার সম্পদ চোরেদের হাত থেকে বাঁচাতে বন্ধ সাটারের সামনে কাগজে আগুন জ্বেলে তিনবার ঘুরিয়ে নিশ্চিন্ত হয়।

'সংস্কৃতি' মানে চলমান-জীবনের সবকিছু। বস্তুগত, অবস্তুগত সব উপাদানের-ই চলমান ধারা। বস্তুগত উপাদান বলতে রান্নার কড়াই থেকে কম্পিউটার সব-ই। অবস্তুগত উপাদান বলতে নীতিহীনতা থেকে আদর্শ, সাহিত্য থেকে চিত্রকলা, যুক্তিবাদ থেকে কুসংস্কার সবই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তা-চেতনা পাল্টায়। সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানগুলো পাল্টায়। পাল্টায় সংস্কৃতি।

উপাসনা-ধর্ম সংস্কৃতির-ই অঙ্গ। পাল্টায় উপাসনা-ধর্ম, সমাজ বিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই। পাল্টেছে তন্ত্র ও তান্ত্রিকদেবীর রূপ। শ্রী শ্রী শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য তন্ত্রশাস্ত্রে পণ্ডিত মানুষ হিসেবে প্রসিদ্ধ। তিনি তাঁর 'তন্ত্রতত্ত্ব' গ্রন্থে লিখেছেন, "দক্ষিণাকালী ও শিবের মূর্তিতে বর্তমানে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমানকালে কালীমূর্তি অনেকটা ভদ্ররুচিসম্পন্ন, কিন্তু শাস্ত্রবিগর্হিত। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণাকালী শিবের তথা মহাকালের উপর উপবিষ্ট থাকেন ও মহাকাল-শিবের নীচে

সদাশিব শায়িত থাকেন। 'বিপরীতরতাতুরা'-দেবী সাধককে জন্মমৃত্যুচক্র থেকে বিমুক্ত করার জন্য বিপরীতরতাতুরা (বিপরীত আসনে রতিক্রিয়া-রতা)।" (তন্ত্রতত্ত্ব পৃষ্ঠা ৪৪)। অন্যান্য তন্ত্রগ্রন্থেও দক্ষিণাকালীর মূর্তি বিপরীতরতাতুরা।

মহাকালের উপর বিপরীত আসনে মৈথুনরতা কালী-ই শাস্ত্রসম্মত

কালীর নীচে শুয়ে এক শিব, তার নীচে আরও একশিব অর্থাৎ কালীর পায়ের তলায় শুয়ে দুই শিব। তন্ত্র মতে নীচে শুয়ে থাকা শিব সদাশিব (নির্গুণ) ও তার উপরের শিব মহাকাল (সগুণ)। মহাকালের উপর বসে মৈথুনরতা দেবী কালী। এ'টাই তন্ত্রসম্মত দেবী কালী বা কালিকার রূপ। এমন শিবের উপর বিপরীতরতাতুরা কালীমূর্ত্তির দেখাই মেলে না।

এ'বার দু'হাজার দুয়ের কালীপুজোয় দেখলাম, অনেক কালীই শাড়িতে সুসজ্জিতা। হয় তো এ'সব কালীমূর্তি তন্ত্রসম্মত ও শাস্ত্রসম্মত নয়, কিন্তু অবশ্যই ভদ্ররুচিসম্পন্ন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিকদেবী কালীর রূপও যাচ্ছে পাল্টে। রতিরতা থেকে শাড়ি পরিহিতা।

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ তন্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি মনে করেন, প্রাচীন তান্ত্রিক-ধর্মের ঐতিহ্য ও বৈদিক ধর্মের ঐতিহ্য ছিল একে অন্যের পরিপূরক। অর্থাৎ তান্ত্রিক-ধর্মের ঐতিহ্য পরস্পর বিরোধী তো ছিল-ই না বরং দু'য়ের ঐতিহ্য পরিপূর্ণতা দিয়েছিল।

এই মুহূর্তে আমাদের আলোচনার বিষয় এই নয় যে—ঈশ্বর-নির্ভর ধর্ম-বিশ্বাস, ভুল কি ঠিক। আমাদের আলোচ্য বিষয়— বৈদিক ধর্মের ঐতিহ্য কি তন্ত্র-বিরোধী?

আমরা এতক্ষণের আলোচনায় দেখিয়েছি, আর্যভাষীরা ইরান থেকে যে সব দেব-বিশ্বাস নিয়ে এদেশে পা রেখেছিল, তা কেমনভাবে একটু একটু করে পাল্টে গেছে। কেমন ভাবে ভূমিপুত্রদের সংস্কৃতি আর্যভাষীদের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে আর্যভাষীরা এদেশের মেয়েদের বিয়ে করেছে। মিশ্রজাতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভূমিপুত্রদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে আর্য-সংস্কৃতিতে। ফলে আর্যভাষীদের তন্ত্র-বিরোধী প্রাথমিক মানসিক প্রতিক্রিয়া পরবর্তীকালে অনুপস্থিত ছিল। বরং সত্যি বলতে কী, তান্ত্রিক জাদু-বিশ্বাসের নিত্য-নতুন পদ্ধতি ও পথ তৈরিতে মন দিয়েছিল আর্যভাষী জাদু-পুরোহিতরা। ফলে যজ্ঞ ও যোগের নতুন নতুন পদ্ধতি গড়ে উঠেছে।

ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। তন্ত্র নিয়ে গভীর পড়াশুনা আছে। তাঁর বক্তব্য স্পষ্টতই ভিন্ন ধরনের। তাঁর মতে, তন্ত্র একটি সম্পূর্ণ বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যবিরোধী সংস্কৃতি। জানি না এমন কথা বলার পিছনে ব্রাহ্মণ্যবাদী চেতনা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল কি না?

এমন কথা বলার পরেও ডঃ ভট্টাচার্য বললেন, "এই ধর্ম (শাক্ত) প্রকৃতির দিক থেকে নমনীয় হওয়ার দরুণ বিভিন্ন যুগের সামাজিক ও ধর্মীয় চাহিদার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পেরেছিল। প্রতি যুগেই শাক্তধর্ম সেই যুগের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি গুলির শরিক হয়েছিল।" (ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২১৯)।

কৃষিনির্ভর আদিম সমাজে উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাস, লিঙ্গ-যোনির পূজা, দেহ-মিলন—এ'সব প্রায় গোটা পৃথিবী জুড়েই একটা না একটা সময়ে ছিল। এই সময়টা সব জায়গায় একই সঙ্গে অতিক্রম করবে—এমনটা নয়। আজও আন্দামানের জারোয়ারা যখন আদিম-সমাজ চেতনার একটা পর্যায়ে পড়ে রয়েছে, তখন একই দেশের কিছু মানুষ আকাশে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করছে। প্রগতির আলো জাদু-বিশ্বাস নির্ভর ধর্মকে শেষ করেছে—এটাই ইতিহাস। ডঃ ভট্টাচার্যের কথা মত, শাক্ত ধর্মের মত জাদু-বিশ্বাসের ধর্ম যুগে যুগে প্রগতিশিলতার শরিক হয়েছে এই তথ্য মানতে গেলে ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করতে হয়। উর্বরতামূলক জাদু-বিশ্বাস, তন্ত্রবিশ্বাস, কুসংস্কার কেন সাংস্কৃতিক ভাবে এগিয়ে থাকা দেশগুলো থেকে

বিদায় নিল? কেন শুধু টিকে রইলো অনুন্নত দেশগুলোতে? সোজা উত্তর কেউ খুঁজতে না চাইলে, না খোঁজার পিছনে কোনও উদ্দেশ্য থাকলে অন্য ব্যাপার! শিক্ষা যে সব সময় অহমিকাহীন মুক্ত মনের মানুষ তৈরি করে, এমনটা নয়।

ডঃ ভট্টাচার্যের আরও বক্তব্য, ''মানবদেহের গঠন ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার সূত্রপাত তাঁরাই (তান্ত্রিকরাই) করেন।'' (একই গ্রন্থের ২১৯ পৃষ্ঠায়), ডঃ ভট্টাচার্য পরিচিত চিকিৎসকদের সঙ্গে এ বিষয়ে একটু মত বিনিময় করলেই বুঝতে পারতেন, যোগ ও তন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে মানুষের দেহের ভুল 'অ্যানাটমি' জ্ঞানের উপরে ভিত্তি করে। আমাদের শরীরের ভিতর চক্র-সাপ-হাজার পাপড়ির পদ্ম ইত্যাদি রয়েছে—এমন সব বিজ্ঞান-বিরোধী হিজিবিজি কথাকে বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণার সূত্রপাত বলে ঘোষণা করলে অনেক মনেরই মন খারাপ হয়।

ওই বইয়ের-ই ২২১ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে, ''শাক্তধর্মের বিকাশ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাবার জন্য পুরাণসমূহ অনুশীলন করার প্রয়োজন। প্রায় সকল পুরাণেই দেবীর ক্রিয়াকলাপ, নামসমূহ ও গুণাবলী বিবৃত হয়েছে।''

এই অংশটুকু পড়ে অনেকেই এমনটা মনে করতে পারেন, পুরাণে দেবী-মাহাত্ম্যই প্রধান, দেবতরা অপ্রধান। কেউ মনে করলে করতেই পারেন। কিন্তু পুরাণগুলোতে চোখ বোলালে দেখতে পাবেন— সেখানে দেব-মাহাত্ম্যের-ই সুস্পষ্ট প্রাধান্য রয়েছে।

ডঃ ভট্টাচার্যের মত সুপণ্ডিতের কাছ থেকে এমন একপেশে লেখা কাম্য নয়। তাঁর মত বিদগ্ধ মানুষের লেখা পড়ে অনেকেই নিজেদের জ্ঞানকে ঋদ্ধ করতে চান। সে কারণেই লেখার ক্ষেত্রে তাঁর কাছে আরও একটু সতর্কতার প্রত্যাশা রইলো। শ্রদ্ধার সঙ্গেই রইলো।

বিদেশের অত্যন্ত নামী-দামী প্রচার মাধ্যমগুলোর কাছে 'তন্ত্র' একটা আকর্ষণীয় বিষয়। এইসব প্রচার-মাধ্যমের অনেক সাংবাদিকই আমার কাছে আসেন, তন্ত্র নিয়ে জানতে। তাঁদের জানতে চাওয়ার মধ্যে গভীর আন্তরিকতা থাকে। ভিস্যুয়াল মিডিয়া ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক, ডিসকভারি, এসব দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না—কতটা শ্রম, কষ্টস্বীকার, আন্তরিকতা ও গভীর গবেষণার ফসল ওদের সৃষ্টি। তন্ত্র-গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁদের একই রকমের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখেছি। যদিও আমার ধারণা তন্ত্র-গবেষণার ক্ষেত্রে একটা গোটা জীবন যথেষ্ট নয়। আবার একটার বেশি জীবনও তো সম্ভব নয়, সুতরাং এতেই যা হয়, উপায়-ই বা কী! পূর্ববর্তী গবেষকদের গবেষণা কাজকে নিজের জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েও মনে হয়—এখনও একটা জীবন, তন্ত্র গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়।

এ দেশের মিডিয়ার অনেকেই তন্ত্র নিয়ে কাজ করতে আমার সাহায্য চেয়েছেন। ডকুমেন্টারি ফিল্ম বা টিভির জন্য ছবি তৈরি করতে চান। তাঁদের দু'টো রূপ আমি দেখেছি। প্রোডিউসার আলোচনায় হাজির থাকলে এক রকম, না থাকলে আর এক

রকম। প্রোডিউসারের বে-হাজিরায় চট্-জলদি ছবি তুলে কিছু টাকা কামাবার লক্ষ্যে কিছু টিপস্ চান তাঁরা। এর বাড়তি কিছু নয়। প্রেডিউসার হাজির থাকলে ওরাই বক্তা, আমি শ্রোতা। প্রোডিউসারকে 'মুরগি' করতে নিজেদের 'ফান্ডা' জাহির করতে হবে যে! শেষ পর্যন্ত তাঁরা যা তোলেন, তাতে আর যাই থাক 'তন্ত্র' থাকে না। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে—এ'টাই মূলস্রোত।

তারাপীঠে সারা বছর ধরে তন্ত্রের নামে মদ্যপান, গাঁজাপান ও খোলামেলা যৌনচর্চা চলে। ভাড়াটে মেয়েমানুষের দালাল ঘুরছে, তারাপীঠে এসে ভক্তরা যাতে তন্ত্রসাধনার প্রাকটিক্যাল ক্লাস করে যেতে পারে। তরুণদের কাছে হাতছানি—ভৈরবীরাই সব শিখিয়ে পড়িয়ে দেবে মুদ্রার বিনিময়ে। অনেক ভক্ত 'ভাড়াটে মেয়ে' নিয়েই আসে। তরুণ-তরুণীরাও আসে 'খুল্লামখুল্লা' এনজয় করতে। বিশাল এলাকা জুড়ে তন্ত্রের নামে যা চলে, তা দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। তারাপীঠে তন্ত্রের নামে যে কদর্যতা চলে, তার কাছে ভারতের আর সব পীঠ শিশু।

কষ্ট পাই, যখন দেখি তারাপীঠের আশ-পাশের শহর ও গ্রামের তরুণদের একটা বড় অংশ নেশায় ধুঁকছে। ঘুম-বড়ির সস্তা নেশা। প্রশাসন শুনতে পাচ্ছেন, কী বলছি? শক্তিপীঠ তরুণ সমাজকে শক্তিহীন ও পঙ্গু করে দিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন কি?

তন্ত্রের ছাইপাঁশ ঘাটতে ঘাটতে ভাল কিছু কথা পেয়েছি শুধু 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' ও 'গুহ্যসমাজ' গ্রন্থে। দুটোই বৌদ্ধতন্ত্রের গ্রন্থ। এখানেই শুধু বলা আছে, নারী-পুরুষের মিলন যখন দৈহিক, মানসিক, আত্মিক তখন-ই সত্য উপলব্ধি ঘটে।

শুধু এই দুই গ্রন্থ নারী-পুরুষের সুন্দর ও স্বাভাবিক মিলনে 'নির্বাণ' খুঁজে পেয়েছে। এমন সুন্দর কাম্য মিলন'কে 'ঈশ্বর' বললে, 'ঈশ্বর' সংজ্ঞা পাল্টে অর্থবহ হয়ে ওঠে।

"আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, জানি।
পরম-ব্রহ্মকে খুঁজতে আপনার ওই চিরুনি তল্লাস
কোনও কাজেই লাগবে না।
মন্দির-মসজিদ-গীর্জা-অবতারের আবর্জনা ঘেঁটে
ঈশ্বর পাবেন না,
এ আপনি ভালই জানেন।

তবু খোঁজা-খুঁজি খেলা!
পেতে হলে বাইরে ছেড়ে ভেতরে খুঁজুন।
কোনও এক তন্ত্র বলে—ঈশ্বর আছেন প্রেমের মিলনে।
চূড়ান্ত অরূপ মিলন বিস্ফোরণে
সহস্রদল পদ্ম ফোটে
করোটির নীচে।

অনন্ত আনন্দে চেতনা মাতাল
শরীরে শরীর নাচে
তালে তালে ব্রহ্ম নাচে তা তা থৈ থৈ...

তন্ত্র প্রতারণা করেনি অন্তত একবার
আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন ...''

প্রেম ও মিলনের মেলবন্ধন কী সম্ভব? কামের তাণ্ডবে এখন প্রেমের আকাল দেশ জুড়ে।

তন্ত্র সাধনা শ্রেষ্ঠ সাধনা

''কলি যুগে তন্ত্র সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা''—এই বক্তব্য বহু আধুনিক তন্ত্রগ্রন্থের শুরুর কথা। শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ-এর 'বৃহৎ তন্ত্রসারঃ' গ্রন্থটি তন্ত্র-পণ্ডিতদের কাছে আকরগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। গ্রন্থটির ভূমিকাতেই বলা হয়েছে, ''সর্বশাস্ত্র অপেক্ষা তন্ত্রশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। মৎস্যসূক্তে লিখিত আছে—যেরূপ দেবতাদিগের মধ্যে বিষ্ণু, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, নদীর মধ্যে গঙ্গা, পর্বতের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, রাজার মধ্যে ইন্দ্র, দেবীর মধ্যে দুর্গা, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সর্ব্ব শাস্ত্রের মধ্যে তন্ত্র শাস্ত্র প্রধান।''

তন্ত্র গুরুমুখী শাস্ত্র

'বৃহৎ তন্ত্রসারঃ'-এর শুরু এ'ভাবে, ''গুরুপদেশ ভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকলাপ কোন ফলপ্রদ হয় না।''

গুরুর কোনও জাত-বিচার, কূল-বিচার, বর্ণ-বিচার, নারী-পুরুষ বিচার নেই। হাড়ি, মুচি, ডোম, রজকী, নটী, বেশ্যা যে কেউ তন্ত্রগুরু হতে পারেন।

বৈশম্পায়ন সংহিতায় বলা হয়েছে—অপুত্রক, মৃতপুত্রক, কুষ্ঠরোগী ও বামন'কে গুরু হিসেবে স্বীকার করা উচিত নয়।

যোগিনীতন্ত্রে লেখা আছে—পিতা, মাতামহ, কনিষ্ঠ সহোদর ও শত্রুপক্ষের কারও কাছে দীক্ষিত হওয়া শাস্ত্র সিদ্ধ নয়।

মৎস্যসূক্তেও বলা হয়েছে—পিতার মন্ত্র নির্বীর্য। পিতার কাছে দীক্ষা নিয়ে সেই মন্ত্রে জপ-পূজা করলে কোনও ফল হয় না। তবে নিজ কুলতিলক হিসেবে বড় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পিতা দীক্ষা দিলে কোনও দোষ হয় না।

যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে, নারীর কাছে দীক্ষা নিলে শুভ ফল হয়। মা'য়ের কাছে দীক্ষায় অষ্টগুণ ফল লাভ হয়।

· বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রে বিরোধীতার শেষ নেই। তবে একটি বিষয়ে সব্বাই এককাট্টা, তন্ত্র গুরুমুখী শাস্ত্র। গুরু বিনা তন্ত্র সাধনা হয় না।

দীক্ষামাস নির্ণয়

বৃহৎ তন্ত্রসারঃ অনুসারে দীক্ষামাস ঠিক করতে হয় যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে বৃহৎ তন্ত্রসারের বক্তব্য, "চৈত্র মাসে মন্ত্র পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়, বৈশাখে রত্নলাভ, জ্যৈষ্ঠে মরণ, আষাঢ়ে বন্ধুনাশ, শ্রাবণে দীর্ঘায়ু, ভাদ্রমাসে সন্তাননাশ, আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়, কার্ত্তিকে ও অগ্রহায়ণে মন্ত্রসিদ্ধি, পৌষ মাসে শত্রুবৃদ্ধি ও পীড়া, মাঘমাসে মেধাবৃদ্ধি ও ফাল্গুন মাসে মন্ত্র গ্রহণে সকল মনোরথ পূর্ণ হয়। এই রূপে মাসের গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করা বিধেয়, পরন্তু বিহিত মাসও যদি মলমাস হয়, তবে তাহা বর্জন করিবে। চৈত্র মাসে যে দীক্ষা উক্ত হইল তাহা গোপাল বিষয়ে জানিবে। চৈত্র মাসে মন্ত্র গ্রহণ করিলে দুঃখ ভোগ ও মরণ হইয়া থাকে ; এইরূপ গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে। অতএব চৈত্র মাসে কেবল গোপাল মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে, অন্য দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারিবে না। আষাঢ় মাসে মন্ত্র গ্রহণ করিলে বন্ধুনাশ হয়, এইরূপ যে লিখিত হইয়াছে তাহা সকল দেবতার পক্ষে নহে, "আষাঢ়ে মন্ত্র গ্রহণ করিলে সুখ ও সম্পদ হয়" যোগিনী হৃদয়ের এই বচন বলে আষাঢ় মাসে শ্রীবিদ্যার মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারে। দীক্ষা বিষয়ে যে সকল মাসের দোষাদোষ লিখিত হইল, তাহা সৌর মাসে জানিবে। দীক্ষাতে সৌর মাসই প্রশস্ত, চান্দ্র মাসগ্রহণ করিবে না। বৈশম্পায়ন সংহিতায়ও এইরূপ মাসের নির্ণয় লিখিত আছে।"

এখানেই অবশ্য সব শেষ নয়। এর পরও আছে বার, তিথি ও নক্ষত্র নির্ণয়ের নানা নিয়ম-কানুন। যতই নিয়ম-কানুনের ফ্যাকড়া বাড়ে, ততই ব্রাহ্মণদের উপর নির্ভরতা বাড়ে, গুরুর উপর নির্ভরতা বাড়ে।

আগম, নিগম ও যামল

শৈব ও শাক্ত তন্ত্র মতে শিব ও শক্তি থেকেই সকল তন্ত্রের সৃষ্টি। তন্ত্রশাস্ত্রগুলো দুটি ভাগে বিভক্ত। (১) আগম—শিবের পঞ্চ-মুখে বলা তন্ত্রই হল 'আগম'। (২) নিগম—শক্তির নিজের মুখে বলা তন্ত্র পদ্ধতি-ই হল 'নিগম'।

বেদের যেমন 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থসমূহ আছে, তেমন-ই 'আগম' ও 'নিগম'-এর 'ব্রাহ্মণগ্রন্থ' হল 'যামল'।

'তন্ত্রতত্ত্ব' গ্রন্থ বলছে—"শিব বা সদাশিবের পাঁচটি মুখ থেকে বিভিন্ন তন্ত্রের সৃষ্টি বা বিকাশ হয়েছিল ও সে তন্ত্রগুলির নাম 'আগম'। পূর্বেই বলেছি, যে তন্ত্রগুলির বিকাশ হয়েছিল শক্তি বা পার্বতীর মুখ থেকে সেগুলি নিগমের অন্তর্গত। সদাশিবের পাঁচটি মুখ—(১) সদ্যোজাত— পূর্বমুখ। এই সদ্যোজাতমুখ দিয়ে যে সকল তন্ত্র ব্যাখ্যা

(বা সৃষ্টি) করেছেন শিব তাদের নাম 'পূর্বান্নায়', (২) দ্বিতীয় অঘোর—দক্ষিণ মুখ ; সুতরাং অঘোর-মুখে যে সকল তন্ত্র ব্যাখ্যা ও প্রকাশ করেছেন শিব তাদের নাম 'দক্ষিণান্নায়', (৩) তৃতীয় তৎপুরুষ—পশ্চিম মুখ ; সুতরাং তৎপুরুষ-মুখ থেকে যে সকল তন্ত্র নিঃসৃত হয়েছিল তাদের নাম 'পশ্চিমান্নায়' ; (৪) চতুর্থ মুখের নাম বামদেব—উত্তর মুখ, সুতরাং বামদেব থেকে যে সকল তন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল তাদের নাম 'উত্তরান্নায়' ; (৫) ঈশান—ঊর্ধ্বমুখ, সুতরাং ঈশান থেকে যে সকল তন্ত্রশাস্ত্র নিঃশাস্ত্র নিঃসৃত হয়েছিল তাদের নাম 'ঊর্ধ্বান্নায়'।"

যামলের ছটি ভাগ। (১) শ্রীযামল, (২) বিষ্ণুযামল, (৩) শক্তিযামল, (৪) ব্রহ্মযামল, (৬) রুদ্রযামল। বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থগুলোতে এই ছটি ভাগের কথা থাকলেও বরাহীতন্ত্র মতে 'যামল' ছটি ভাগে বিভক্ত। ভাগগুলো হল (১) আদিত্যযামল, (২) ব্রহ্মযামল, (৩) বিষ্ণুযামল, (৪) রুদ্রযামল, (৫) গণেশযামল বা শ্রীযামল।

রুদ্রযামলে ষষ্ঠচক্র ও চক্রভেদের পথ নির্দেশ রয়েছে।

বরাহীতন্ত্র মতে আগম বারোটি। (১) মুক্তক, (২) প্রপঞ্চ, (৩) সারদা, (৪) নারদ, (৫) মহার্ণব, (৬) কপিল, (৭) যোগ, (৮) কল্প, (৯) কপিঞ্জল, (১০) অমৃতশুদ্ধি, (১১) সিদ্ধসম্বরণ।

আসলে যত তন্ত্র, তত মত। যত মত, তত দল। যত দল, তত কোন্দল।
এটা শুধু তন্ত্রের বেলায় নয়, সব উপাসনা-ধর্মেই একই ব্যাপার।
অভ্যন্তরীণ দলাদলি, ধর্মে-ধর্মে বিবাদ, হিংসা, হত্যা—
এই নিয়েই উপাসনা-ধর্মের সংস্কৃতি।

শক্তিতান্ত্রিক সম্প্রদায়

ভারতে শক্তি তন্ত্রসাধনার তিনটি প্রধান সম্প্রদায় বা ঘরানায় বিভক্ত। সম্প্রদায় বা ঘরানাগুলো হল (১) বঙ্গীয় বা গৌড়ীয় ঘরানা, (২) কাশ্মিরীয় সম্প্রদায় বা ঘরানা, (৩) দক্ষিণ ভারতীয় সম্প্রদায় বা ঘরানা।

বঙ্গীয় ঘরানা হল দশমহাবিদ্যা নির্ভর তন্ত্র। কাশ্মিরীয় সম্প্রদায় বা ঘরানার শক্তি শ্রীসারদা। শ্রীসারদাই তাঁদের উপাস্য ও তন্ত্রদেবী। কাশ্মিরীয় তন্ত্রশাস্ত্র 'দর্শন' নামেই তান্ত্রিকদের কাছে বেশি পরিচিত। এই সব দর্শনের নাম 'ত্রিকদর্শন'। জীব-শিব-বিমর্শ এই তিন তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে শিব-শক্তি-সাম্যরস লাভ করে তন্ত্রসাধকরা কৃতকৃতার্থ হন। সাম্যরসানুভূতির অর্থ শিব-শক্তির মিলনরসানুভূতি। দক্ষিণ ভারতের তান্ত্রিক ঘরানার শক্তি হলেন ত্রিপুরাসুন্দরী শ্রীবিদ্যা বা ললিতাদেবী।

বঙ্গীয় ঘরানা

গৌড়ীয় শক্তিতন্ত্রের দশমহাবিদ্যা হলেন—(১) কালী, (২) তারা, (৩) ষোড়শী, (৪) ভুবনেশ্বরী, (৫) ভৈরবী, (৬) ছিন্নমস্তা, (৭) ধূমাবতী, (৮) বগলা, (৯) মাতঙ্গী, (১০) কমলা।

বঙ্গীয় তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য রচনা

গৌড়ীয় তন্ত্রশাস্ত্রের কিছু উল্লেখযোগ্য নাম—কৌলাবলী, গান্ধর্ব, সারদাতিলক, কুলার্ণব, ফেৎকারিণী, সনৎকুমার, মহাচীনাচার, কামাখ্যা, গুপ্তসাধন, মাতৃকাভেদ, তারারহস্য, গায়ত্রী, গৌতমীয়, মহানির্বাণ, শ্যামারহস্য, ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়, উড্ডামরেশ্বর, নিরুত্তর, কামধেনু, কঙ্কালমালিনী, নীলতন্ত্র, নির্বাণ, বৃহন্নীল, রুদ্রযামল, যোগিনী, যোগিনীহৃদয়, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, তন্ত্ররাজ, প্রভৃতি। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের 'তান্ত্রিক-সাহিত্য' এবং শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয়ের 'বৃহৎ তন্ত্রসারঃ' পরবর্তী সময়ে রচিত হলেও তন্ত্রশাস্ত্রের অতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

কাশ্মিরীয় ঘরানা

কাশ্মিরীয় ঘরানার তন্ত্র ত্রিকদর্শনের তিনটি ভাগ। (১) আগমশাস্ত্র, (২) স্পন্দশাস্ত্র, (৩) প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্র। আগমশাস্ত্রে আছে জ্ঞান ও তন্ত্রক্রিয়া। স্পন্দশাস্ত্রে আছে শাস্ত্রকারিকা। প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রে রয়েছে মনন ও বিচার। এইসব শাস্ত্রে শক্তি প্রবলভাবে থাকলেও শিবও আছেন। তবে শক্তিকে বাদ দিলে শিব শব। কাশ্মিরীয় ঘরানার উপাস্য শক্তি শ্রীসারদাদেবী।

এই ঘরানা অনুসারে বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টির কারণ শিব-শক্তি। এই শক্তি শিবের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা নয়। তবে এও ঠিক, শক্তির প্রকাশেই জ্ঞানের প্রকাশ। শক্তির যোগান বন্ধ হলেই জীবের মৃত্যু, জড়ের ধ্বংস। শক্তি রুদ্ধ হলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের দিন শেষ হবে। সৃষ্টি ও প্রলয়—এই দু'য়ের কারণ শক্তি শ্রীসারদা ও শিব। সৃষ্টি ও প্রলয় বিশ্ব জুড়ে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। এ'সবই শিব-শক্তির লীলা। এই লীলার আদি নেই, অন্ত নেই।

কাশ্মিরীয় ত্রিকদর্শন বা ত্রিকতন্ত্র গ্রন্থের সংখ্যা প্রচুর। কাশ্মির সরকার সংস্কৃত ভাষায় ষাটের ওপর তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করেছে।

দক্ষিণীয় ঘরানা

দক্ষিণ ভারতীয় শক্তি তত্ত্বে জীব-ঈশ্বর-মায়া এই তিনের সত্তাকে স্বীকার করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় শৈবতন্ত্রের ও শাক্ততন্ত্রের আচরণবিধি, পূজাপদ্ধতি, তন্ত্র-পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। দক্ষিণে ত্রিপুরাসুন্দরী কামেশ্বরী, ষোড়শী, শ্রীবিদ্যা,

ললিতা ইত্যাদি নামে পূজিতা হন। এঁরা শক্তির-ই বিভিন্ন রূপ। 'বৃহৎ তন্ত্রসারঃ' গ্রন্থে ত্রিপুরাদেবীর ধ্যান মন্ত্রে শক্তিরূপিনী মা'র যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা সংস্কৃতে। বাংলা করলে দাঁড়ায়—দেবী ষোড়শী, জবা ফুলকে হারিয়ে দেওয়ার মত লাল গায়ের রং। স্তনের উপর মুক্তাহার শোভা পাচ্ছে। নদীর লাবণ্যময়-আবর্তের মতো নাভিমণ্ডল। কলাগাছের মতো সুকুমার উরুদ্বয়। অতিমনোহর জঙ্ঘাযুগল। বেশভূষা সর্বপ্রকারে শৃঙ্গারের উপযোগী।

কোনও সন্তান মা'র শরীর নিয়ে এমন ধ্যান করলে তার মানসিক সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ জাগাটাই স্বাভাবিক। মুশকিল হল, সব দেবীর প্রার্থনায় ধ্যানে আমরা তান্ত্রিক হিসাবে তাঁদের শরীর নিয়ে কুরুচিকর চিন্তায় ডুবে থাকি। না-বোঝা ভাষায় যখন মন্ত্রগুলো বলে যাই, তখন ভাবি, দারুণ কিছু মন্ত্র বলছি।

দক্ষিণী শক্তি তন্ত্রে বলা হয়েছে, ধ্যান শেষে মনকে নর্তক করে শৃঙ্গারাদি ইত্যাদি তালসহ নৃত্য, গীত ও বাদ্যযন্ত্রদ্বারা দেবীকে সন্তুষ্ট করতে হবে। অনন্তর নিজের শরীরে শক্তিকে নিয়ে কামকলা ভাবনা করবে। (বুঝুন কাণ্ড, এ'বার মা'কে নিয়ে কামকলা ভাবনা?)

দক্ষিণী শক্তি তত্ত্ব অনুসারে সৃষ্টির যত সৌন্দর্য
সবই কামজ। কামজ-মিলন তাই সুন্দর।

দক্ষিণের শৈব ও শাক্ত তান্ত্রিকদের সম্পর্ক মৈত্রীর।

দশমহাবিদ্যা

বঙ্গীয় তন্ত্র সাধনা দশমহাবিদ্যা নির্ভর তন্ত্র—এ'কথা আগেই বলা হয়েছে। এই দশমহাবিদ্যা হলেন, (১) কালী, (২) তারা, (৩) ষোড়শী, ইত্যাদি, যা একটু আগেই বলেছি।

এই ষোড়শীই দক্ষিণের শাক্তদের শক্তিরূপী ষোড়শী, যার অন্যান্য নাম—শ্রীবিদ্যা, ললিতা, ত্রিপুরসুন্দরী ইত্যাদি। এই ষোড়শীর চার বা ষোল হাত আমরা দেখতে পাই।

দশ মহাবিদ্যার নয় শক্তির নয়জন শিব আছেন। ধূমাবতীর কোনও শিব নেই। কালীর শিব মহাকাল, তারার অক্ষোভ্য, ষোড়শীর পঞ্চবকত্রশিব, ভুবনেশ্বরীর ত্র্যম্বক, ছিন্নমস্তার কবন্ধ, ভৈরবীর দক্ষিণমূর্তি কালভৈরব, বগলার একবকত্রশিব, মাতঙ্গীর মাতঙ্গ, কমলার সদাশিববিষ্ণু।

বঙ্গে মাটির কালী প্রতিমার আবির্ভাব

বিশিষ্ট তন্ত্র-পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'তন্ত্র পরিচয়' গ্রন্থে এই অভিমত

প্রকাশ করেছেন যে, এখন যে ধরনের মাটির কালীমূর্তি তৈরি করিয়ে পুজো করা হয়, ঐ ভাবের কালী মূর্তি পুজো কৃষ্ণানন্দ আলমবাগীশই এই দেশে প্রথম প্রচলন করেন। তিনি নিজের হাতে মূর্তি গড়ে প্রতি অমাবস্যায় পুজো করতেন এবং পুজো শেষে মূর্তি নিজের মাথায় বহন করে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে আসতেন। আলমবাগীশের এই ধরনের পুজোর আগে বঙ্গদেশে কালী পুজো হত মন্ত্রে, তন্ত্রে, ঘটে, অথবা সিদ্ধ সাধকের পীঠস্থানে। কোন কোনও ক্ষেত্রে তন্ত্র মতে কালী পুজোয় সর্বসুলক্ষণসম্পন্না শ্যামা সুন্দরীকে এনে তাকেই কালী জ্ঞানে পুজো করতো।

নারীকে শক্তিজ্ঞানে পুজো-বিধি ও মৈথুন

বৃহৎ তন্ত্রসারঃ-এ বলা হয়েছে সর্বসুলক্ষণা রমণীকে রমণেই শিব-শক্তির মিলন ঘটে। শিবশক্তির মিলনের নাম-ই 'যোগ'। এই মিলন-ই তন্ত্র-সাধনা। "এস্থলে শীৎকারই মন্ত্রজপ ; বাক্যই স্তব ; আলিঙ্গনই কস্তুরী ; চুম্বনই কর্পূর ; নখক্ষত, দন্তক্ষত প্রভৃতিই বহুবিধ পুষ্প; মৈথুনই তর্পণ ; বীর্যপাতই বিসর্জ্জন।"

(পৃষ্ঠা-৭০২)

'কুলার্নব' বিখ্যাত তন্ত্রগ্রন্থ। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে, আলিঙ্গন, চুম্বন, স্তনমর্দ্দন, দর্শন, স্পর্শন যোনিবিকাশ, লিঙ্গঘর্ষণ, প্রবেশ, স্থাপন ও এই নববিধ পুষ্পদ্বারা শক্তির পূজা করিবে।"

জ্ঞানার্ণবে আরও বলা হয়েছে, "এই আমি তোমার নিকট সমুদয় জ্ঞানের বিষয় কহিলাম। এ'বিষয়ে সন্দিহান হইলে মনুষ্য পাপভোগী হইবে। যে ব্যক্তি সন্দেহ করিবে, সে গুরুতল্পগামীর ন্যায় মহাপাতক হইবে। অতএব মহেশ্বরি! অসন্দিহান চিত্তে এই সমুদয় সাধন করিবে।" (ঐ গ্রন্থের ৭০৩ পৃষ্টায়)

বৃহৎ তন্ত্রসারঃ ও কুলচূড়ামণিতে বলা হয়েছে, সুলক্ষণা রমণীকে কেশচর্চা করিয়ে দিয়ে, সুসজ্জিতা করিয়ে, ভোজন করিয়ে, পান খেতে দেবে। তারপর গন্ধচন্দনচর্চ্চিত ফুলের মালা পরিয়ে রমণীকে প্রদক্ষিণ করে মন্ত্রসিদ্ধি প্রার্থনা করবে। এবার নিজে শিব জ্ঞানে বিবস্ত্র হবে এবং নারীকে শক্তি জ্ঞানে বিবস্ত্রা করে শিবশক্তির মিলন ঘটাবে। এই মিলন আনন্দময়।

তন্ত্র বলছে, শক্তিপূজার জন্য অন্য নারী না পেলে নিজের মা, বিমাতা, ছোট বা বড় বোন, মামী বা মেয়েকে শক্তি জ্ঞানে পুজো করে শিব জ্ঞানে তার সঙ্গে মিলিত হবে।

নারী-শক্তি বিষয়ে তন্ত্রের সাবধান-বাণী

বৃহৎ তন্ত্রসারঃ অনুসারে নারী-শক্তির কোনও জাত-কূল নেই। যাকে কুল নায়িকা ও শক্তি হিসেবে গ্রহণ করবে সে নটী, কাপালিকা, বেশ্যা, রজককন্যা, নাপিতকন্যা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপকন্যা, মালকারকন্যা হলেও কোনও ব্যাপার নয়। এ'টাই শুধু দেখতে হবে, সে যেন রূপযৌবনবতী হয়।

এইসব শ্রমজীবী মহিলারা উচ্চবর্ণ পরিবারের গৃহবধূদের তুলনায় অনেক বেশি আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী ছিল। তাদের দৈহিক সৌন্দর্যকে ভোগ করার ইচ্ছে থেকেই জাদু-পুরোহিতরা এইসব বর্ণের রমণীদের রমণসঙ্গিনী করতে তন্ত্রে নারীদের জাত-কূলের বিচার তুলে দিয়েছিল। কিন্তু পুরুষদের বেলায় বর্ণপ্রথা, শূদ্র-অচ্ছুত ইত্যাদি ভেদাভেদ পুরোপুরি বজায় রেখেছিল। তারা যে তন্ত্রের নামে নারীদের সুন্দর দেহকে ভোগ করার জন্যেই ভণ্ডামীর আশ্রয় নিয়েছিল, এমন ধারণা আরও জোরদার হয় যখন দেখি, ওই তন্ত্রগ্রন্থেই বলা হচ্ছে বৃদ্ধা, কুৎসিৎ, সন্দিগ্ধচিত্তা, প্রত্যাখ্যানপরায়ণা রমণীকে 'শক্তি' করবে না। এই শিব-শক্তির মিলনের তন্ত্র-প্রক্রিয়া নির্জন জায়গায় করবে। দেখবে যাতে লোকসমক্ষে তা প্রচারিত না হয়।

মেধা আর ভণ্ডামীর যুগলবন্দি থেকেই যে নারী-পুরুষের সহজ স্বাভাবিক সম্পর্কের এমন বিকৃতি ঘটেছিল এ'বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

তন্ত্র-সাধনার সাত আচার

ভারতীয় উপাসনা-ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সিদ্ধির সাফল্যহীন কোনও ধর্ম, ধর্মের মর্যাদা পায়নি। তন্ত্র-সাধনার মাধ্যমে সিদ্ধি-লাভ করা সম্ভব। তাই তন্ত্র-সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনায় জায়গা দখল করে নিয়েছে।

তন্ত্রে সাতটি পদ্ধতির উপাসনা ও আচার আছে। যেমন—(১) বীরাচার, (২) পার্শ্বাচার, (৩) বামাচার, (৪) চীনাচার, (৫) দক্ষিণাচার, (৬) সময়াচার, (৭) কুলাচার। বীরাচার, বামাচার, চীনাচার ও কুলাচার এই চার আচার সাধনে পঞ্চম'কার, কুলচক্রভেদ, শব সাধনা ইত্যাদির প্রচলন রয়েছে। তন্ত্র গ্রন্থগুলোতে এই চার ধারাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়।

সময়াচারী তান্ত্রিকরা 'সময়'কে শিব ও 'সময়া'কে শক্তি মনে করে 'মানসপূজা' করে। 'মানসপূজা'অর্থে মনে মনে পঞ্চম'কারের পূজা। তন্ত্রপণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'তন্ত্র পরিচয়' গ্রন্থে বলছেন, "মনে মনে কল্পনা করিতে হইবে যে আমি সাধক দেবীকে সুরার সাগর, মাংসের পর্বত, মৎস্যের স্তূপ, মুদ্রার সম্ভার দিতেছি এবং পদ্মিনী নারীর সহিত মৈথুন সাহায্যে কুণ্ডলিনীকে জাগরিতা করিতেছি

; ....'' অর্থাৎ সোজা কথায় নারীর পরিবর্তে স্বমৈথুনের সাহায্যে তন্ত্র সাধন পদ্ধতি হল 'সময়াচার'।

পঞ্চম'কার সাধনা

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—এই পাঁচটি শব্দই 'ম' অক্ষর দিয়ে শুরু। এই পাঁচটি দ্রব্য ও বিষয়কে নিয়ে সাধনাই 'পঞ্চম'কার' সাধনা হিসেবে খ্যাত। এই হল তন্ত্র সাধনার 'পঞ্চম'কার তত্ত্ব বা 'পঞ্চ তত্ত্ব'। তন্ত্রসাধনায় এ'সবের স্থূল প্রয়োগই করা হয়ে থাকে।

তন্ত্র মতে মদ বা সুরা অমৃত। সুরা তাই দেবভোগ্য। তন্ত্রে সুরার গুণগান গেয়ে বলা হয়েছে, সুরা কামজভাব বৃদ্ধি করে। ব্যথা, যন্ত্রণা ও পাপাশঙ্কা দূর করে।

তন্ত্রে আট ধরনের পশুর মাংস গ্রহণের বিধি আছে। যেমন—গোমাংস, মেষমাংস, অশ্বমাংস, মহিষমাংস, গোধামাংস (গোসাপমাংস), ছাগমাংস, উষ্ট্রমাংস ও মৃগমাংস (বৃহৎ তন্ত্রসারঃ, পৃষ্ঠা ৬৯৮)।

মাছের মধ্যে তিন রকমের মাছকে তন্ত্রে উত্তম বলা হয়েছে। (১) শাল, (২) পাঠীন (বোয়াল), (৩) রোহিত। অথবা কাঁটাহীন মাছকে 'উত্তম মৎস্য' বলা যায়। যে মৎস্য তৈলাক্ত ও গ্রন্থিযুক্ত, তাকে বলে মধ্যম মৎস্য। এই ধরনের মৎস্য তান্ত্রিক তার সাধনায় লাগাতে পারে। কিন্তু ছোট এবং কাঁটাভর্তি মাছ অধম মৎস্য। এই মাছ তান্ত্রিকের ভোগে লাগানো উচিত নয়।

'মুদ্রা' বলতে তন্ত্রে দু-ধরনের মুদ্রার কথাই আছে। (১) স্বর্ণ বা রোপ্য, অথবা চিবিয়ে খেতে হয় এমন খাদ্যকে মুদ্রা বলে, যেমন চিঁড়ে, মুড়ি, খই ইত্যাদি। (২) ভঙ্গিমা, নানা মৈথুন ভঙ্গি।

যে শক্তির দ্বারা সৃষ্টির বিস্তার হয়, তাকেই বলে 'আদি রস'। আদি রসের সাহায্যে যে সাধনা তা-ই শ্রেষ্ঠ সাধনা, তা-ই মৈথুন সাধনাকে শ্রেষ্ঠ সাধনা মনে করে তন্ত্র। বিশ্বসৃষ্টির যত সৌন্দর্য, যত আনন্দ—সবই কামজ, সবই মৈথুন-তত্ত্ব নির্ভর। মৈথুনেই ষটচক্র ভেদ করে মস্তিষ্কের সহস্রপদ্মের পাপড়ি খোলা যায়। তন্ত্র নিজের দেহস্থ আত্মা ছাড়া কোনও বাইরের শক্তিতে বিশ্বাস করে না।

একমাত্র মৈথুনের সাহায্যেই দেহের আত্মাকে ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি তত্ত্বকে জানা যায়।

দেহ-সাধনার জন্যে স্ত্রী থাকলেও অন্য নারীকে সাধনসঙ্গিনী করার বিধান তন্ত্রে আছে। এ'ধরনের সাধনসঙ্গিনী যে কোনও সুন্দরী নারীকেই করা যেতে পারে। এ'খানে নারীর সঙ্গে সম্পর্ক বা নারীর জাত-কূল ইত্যাদি বিবেচনার প্রয়োজন নেই। এ'বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

নারী-শক্তি বিষয়ে তন্ত্রের সাবধান-বাণী

বৃহৎ তন্ত্রসারঃ অনুসারে নারী-শক্তির কোনও জাত-কূল নেই। যাকে কুল নায়িকা ও শক্তি হিসেবে গ্রহণ করবে সে নটী, কাপালিকা, বেশ্যা, রজককন্যা, নাপিতকন্যা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপকন্যা, মালকারকন্যা হলেও কোনও ব্যাপার নয়। এ টাই শুধু দেখতে হবে, সে যেন রূপযৌবনবতী হয়।

এইসব শ্রমজীবী মহিলারা উচ্চবর্ণ পরিবারের গৃহবধূদের তুলনায় অনেক বেশি আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী ছিল। তাদের দৈহিক সৌন্দর্যকে ভোগ করার ইচ্ছে থেকেই জাদু-পুরোহিতরা এইসব বর্ণের রমণীদের রমণসঙ্গিনী করতে তন্ত্রে নারীদের জাত-কূলের বিচার তুলে দিয়েছিল। কিন্তু পুরুষদের বেলায় বর্ণপ্রথা, শূদ্র-অচ্ছুত ইত্যাদি ভেদাভেদ পুরোপুরি বজায় রেখেছিল। তারা যে তন্ত্রের নামে নারীদের সুন্দর দেহকে ভোগ করার জন্যেই ভণ্ডামীর আশ্রয় নিয়েছিল, এমন ধারণা আরও জোরদার হয় যখন দেখি, ওই তন্ত্রগ্রন্থেই বলা হচ্ছে বৃদ্ধা, কুৎসিৎ, সন্দিগ্ধচিত্তা, প্রত্যাখ্যানপরায়ণা রমণীকে 'শক্তি' করবে না। এই শিব-শক্তির মিলনের তন্ত্র-প্রক্রিয়া নির্জন জায়গায় করবে। দেখবে যাতে লোকসমক্ষে তা প্রচারিত না হয়।

মেধা আর ভণ্ডামীর যুগলবন্দি থেকেই যে নারী-পুরুষের সহজ স্বাভাবিক সম্পর্কের এমন বিকৃতি ঘটেছিল এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

তন্ত্র-সাধনার সাত আচার

ভারতীয় উপাসনা-ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সিদ্ধির সাফল্যহীন কোনও ধর্ম, ধর্মের মর্যাদা পায়নি। তন্ত্র-সাধনার মাধ্যমে সিদ্ধি-লাভ করা সম্ভব। তাই তন্ত্র-সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনায় জায়গা দখল করে নিয়েছে।

তন্ত্রে সাতটি পদ্ধতির উপাসনা ও আচার আছে। যেমন—(১) বীরাচার, (২) পার্শ্বাচার, (৩) বামাচার, (৪) চীনাচার, (৫) দক্ষিণাচার, (৬) সময়াচার, (৭) কুলাচার। বীরাচার, বামাচার, চীনাচার ও কুলাচার এই চার আচার সাধনে পঞ্চম'কার, কুলচক্রভেদ, শব সাধনা ইত্যাদির প্রচলন রয়েছে। তন্ত্র গ্রন্থগুলোতে এই চার ধারাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়।

সময়াচারী তান্ত্রিকরা 'সময়'কে শিব ও 'সময়া'কে শক্তি মনে করে 'মানসপূজা' করে। 'মানসপূজা'অর্থে মনে মনে পঞ্চম'কারের পূজা। তন্ত্রপণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'তন্ত্র পরিচয়' গ্রন্থে বলছেন, "মনে মনে কল্পনা করিতে হইবে যে আমি সাধক দেবীকে সুরার সাগর, মাংসের পর্বত, মৎস্যের স্তূপ, মুদ্রার সম্ভার দিতেছি এবং পদ্মিনী নারীর সহিত মৈথুন সাহায্যে কুণ্ডলিনীকে জাগরিতা করিতেছি

; ...." অর্থাৎ সোজা কথায় নারীর পরিবর্তে স্বমৈথুনের সাহায্যে তন্ত্র সাধন পদ্ধতি হল 'সময়াচার'।

পঞ্চম'কার সাধনা

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—এই পাঁচটি শব্দই 'ম' অক্ষর দিয়ে শুরু। এই পাঁচটি দ্রব্য ও বিষয়কে নিয়ে সাধনাই 'পঞ্চম'কার' সাধনা হিসেবে খ্যাত। এই হল তন্ত্র সাধনার 'পঞ্চম'কার তত্ত্ব বা 'পঞ্চ তত্ত্ব'। তন্ত্রসাধনায় এ'সবের স্থূল প্রয়োগই করা হয়ে থাকে।

তন্ত্র মতে মদ বা সুরা অমৃত। সুরা তাই দেবভোগ্য। তন্ত্রে সুরার গুণগান গেয়ে বলা হয়েছে, সুরা কামজভাব বৃদ্ধি করে। ব্যথা, যন্ত্রণা ও পাপাশঙ্কা দূর করে।

তন্ত্রে আট ধরনের পশুর মাংস গ্রহণের বিধি আছে। যেমন—গোমাংস, মেষমাংস, অশ্বমাংস, মহিষমাংস, গোধামাংস (গোসাপমাংস), ছাগমাংস, উষ্ট্রমাংস ও মৃগমাংস (বৃহৎ তন্ত্রসারঃ, পৃষ্ঠা ৬৯৮)।

মাছের মধ্যে তিন রকমের মাছকে তন্ত্রে উত্তম বলা হয়েছে। (১) শাল, (২) পাঠীন (বোয়াল), (৩) রোহিত। অথবা কাঁটাহীন মাছকে 'উত্তম মৎস্য' বলা যায়। যে মৎস্য তৈলাক্ত ও গ্রন্থিযুক্ত, তাকে বলে মধ্যম মৎস্য। এই ধরনের মৎস্য তান্ত্রিক তার সাধনায় লাগাতে পারে। কিন্তু ছোট এবং কাঁটাভর্তি মাছ অধম মৎস্য। এই মাছ তান্ত্রিকের ভোগে লাগানো উচিত নয়।

'মুদ্রা' বলতে তন্ত্রে দু-ধরনের মুদ্রার কথাই আছে। (১) স্বর্ণ বা রৌপ্য, অথবা চিবিয়ে খেতে হয় এমন খাদ্যকে মুদ্রা বলে, যেমন চিঁড়ে, মুড়ি, খই ইত্যাদি। (২) ভঙ্গিমা, নানা মৈথুন ভঙ্গি।

যে শক্তির দ্বারা সৃষ্টির বিস্তার হয়, তাকেই বলে 'আদি রস'। আদি রসের সাহায্যে যে সাধনা তা-ই শ্রেষ্ঠ সাধনা, তা-ই মৈথুন সাধনাকে শ্রেষ্ঠ সাধনা মনে করে তন্ত্র। বিশ্বসৃষ্টির যত সৌন্দর্য, যত আনন্দ—সবই কামজ, সবই মৈথুন-তত্ত্ব নির্ভর। মৈথুনেই যটচক্র ভেদ করে মস্তিষ্কের সহস্রপদ্মের পাপড়ি খোলা যায়। তন্ত্র নিজের দেহস্থ আত্মা ছাড়া কোনও বাইরের শক্তিতে বিশ্বাস করে না।

একমাত্র মৈথুনের সাহায্যেই দেহের আত্মাকে ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি তত্ত্বকে জানা যায়।

দেহ-সাধনার জন্যে স্ত্রী থাকলেও অন্য নারীকে সাধনসঙ্গিনী করার বিধান তন্ত্রে আছে। এ'ধরনের সাধনসঙ্গিনী যে কোনও সুন্দরী নারীকেই করা যেতে পারে। এ'খানে নারীর সঙ্গে সম্পর্ক বা নারীর জাত-কূল ইত্যাদি বিবেচনার প্রয়োজন নেই। এ'বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

কুমারী পুজো ও 'রজঃ'

প্রাচীন আমলে একটা বিশ্বাস বহু দেশেই প্রচলিত ছিল—পুরুষের 'শুক্র' ও নারীর 'রজঃ' মিলিত হয়ে সন্তানের জন্ম দেয়। গোটা ধারণাটাই ভুল। শুক্র থাকলেই প্রজনন ক্ষমতা থাকবে—এমন ধারণা ঠিক নয়। প্রজননের ক্ষেত্রে শুক্রকীটের ভূমিকা রয়েছে। সাধারণভাবে একজন সুস্থ-সবল পুরুষ প্রতিবার সঙ্গমে ১০০ মিলিয়ন থেকে ৪০০ মিলিয়ন শুক্রকীট শুক্রের বা বীর্যের সঙ্গে বের করে দেয়। এক মিলিয়ন হচ্ছে ১০ লক্ষ। বীর্যে শুক্রকীটের পরিমান খুব কম হলে সেই বীর্য প্রজননে অক্ষম হয়।

দেহ-মিলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে শুক্রকীটগুলো নারীর ডিম্বকোষের দিকে ছুটতে থাকে। শুক্রকীটগুলো আবার সবাই সমান সবল হয় না। কোন্ শুক্রকীটটি ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হবে, তা নির্ভর করে শুক্রকীটের মাথার তীক্ষ্ণতা ও দৌড়ে এগিয়ে থাকার উপর। শেষ পর্যন্ত বলিষ্ঠ, তীক্ষ্ণ মাথার এগিয়ে থাকা শুক্রকীট ডিম্বকোষের গায়ে আঘাত করে ডিম্বকোষ ভেদ করে ভিতরে ঢুকে যায়। নারী-পুরুষের ডিম্বকোষ ও শুক্রকীটের মিলনে শুরু হয় নতুন জীবনের স্পন্দন। শুরু হয় কোষ বিভাজন। দুই থেকে চার, চার থেকে আট, এ'ভাবে হাজার, লাখ ...। সাত দিনের মাথায় কোষ-সমষ্টি জরায়ুর সংযোগনল বা ফ্যালোপিয়ন টিউব থেকে জরায়ুতে এসে ডেরা বাঁধে। একটু একটু করে তৈরি হতে থাকে শিশু।

রজঃ বা ঋতুস্রাবের সঙ্গে বীর্যের মিলনে প্রজননের কোনও সম্পর্ক নেই। রজঃ ডিম্বকোষের মৃত্যু ঘোষণা করে। সাধারণভাবে একটি ঋতুবতী নারীর 'ওভারি' বা ডিম্বগ্রন্থির মধ্যে অনেকগুলো ওভাম বা ডিম্বকোষ জন্ম নেয়। তারপর শুরু হয় ডিম্বকোষগুলোর মধ্যে যুদ্ধ। যুদ্ধে জয়ী বলিষ্ঠতমা ডিম্বকোষ ডিম্বগ্রন্থি থেকে বেরিয়ে জরায়ুর সংযোগনলে এসে অপেক্ষা করতে থাকে। প্রতিটি ঋতুচক্রে এভাবে ডিম্বকোষ অপেক্ষা করে। কোনও শুক্রকীট তার ভিতর প্রবেশ না করলে ঋতুস্রাবের মধ্যে দিয়ে ডিম্বকোষটির মৃত্যু ঘটে।

বিজ্ঞানের এই পরীক্ষিত সত্যকে মেনে না নিয়ে আজও তন্ত্র বিশ্বাস করে রজঃ-ই হল 'স্ত্রী-বীজ', এবং শুক্র 'পুরুষ বীজ'। দুয়ের মিলনে সৃষ্টি।

তন্ত্র রজঃকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তন্ত্রের ভাষায় রজঃ হল রক্তচন্দন বা খপুষ্প (আকাশের ফুল)। খপুষ্প দেবী শক্তির কাছে অতি পবিত্র।

সবচেয়ে পবিত্র হল অক্ষতযোনি কিশোরী বা কুমারীর প্রথম রজঃ।
আর সবচেয়ে পবিত্র কাজ হল—প্রথম রজঃস্বলা
কুমারীকে শক্তি জ্ঞানে পুজো করে শিব
জ্ঞানে তার সঙ্গে মিলিত হওয়া।

সব নারী-ই শক্তিস্বরূপা। তবে কুমারী পুজোই শক্তির শ্রেষ্ঠ পুজো। এই পুজোয় দেবী সবচেয়ে খুশি হন। কূলচূড়ামণি-তে বলা হয়েছে রজঃস্বলা রমণীকে তিন রাত পুজো করলে লক্ষপীঠের ফল পাওয়া যায়।

জ্ঞানার্ণবে বলা হয়েছে, কুমারীপূজা করলে পূজা-হোম-যজ্ঞ ইত্যাদি যা ফল পাওয়ার কথা তার কোটিগুণ ফল পাওয়া যায়। (বৃহৎ তন্ত্রসারঃ পৃষ্ঠা ৭১০)

যামলে বিভিন্ন বয়সের কুমারীদের বিভিন্ন নামের শক্তিরূপে পূজার বিধান দেওয়া হয়েছে। সপ্তমবর্ষীয়া কুমারীর নাম মালিনী, অষ্টমবর্ষীয়ার নাম কুব্জিকা, নবমবর্ষীয়া কুমারীর নাম কালসন্দর্ভা, দশমবর্ষীয়া-অপরাজিতা, একাদশবর্ষীয়ার নাম রুদ্রাণী, দ্বাদশবর্ষীয়া ভৈরবী, ত্রয়োদশবর্ষীয়া মহালক্ষ্মী, চতুর্দশবর্ষীয়া কুমারী পীঠনায়িকা, পঞ্চদশবর্ষীয়া কুমারীর নাম ক্ষেত্রজ্ঞা, ষোড়শবর্ষীয়া কুমারীর নাম অম্বিকা।

মহানবমীতে, মহাপর্বে এবং পবিত্র দিনে কুমারীপূজা করার নির্দেশ রয়েছে। পূজাক্রমে বলা হয়েছে—কুমারীকে বস্ত্রে-পুষ্পে সুসজ্জিতা করবে। তারপর 'ঐঁ' (ওঁ নয়) বীজমন্ত্র পাঠ করে কুমারীর শক্তিনাম উচ্চারণ করতে হবে। যেমন, চতুর্দশবর্ষীয়া কুমারীর বেলায় 'ঐঁ পীঠনায়িকা' বলে জল দান করতে হবে। পরে 'হ্রীঁ' বীজমন্ত্র পাঠ করে তাকে পাদ্য (পা-ধোয়ার জল) দেবে। 'শ্রীঁ' বীজদ্বারা অর্ঘ্য দেবে। 'হুঁ' বীজদ্বারা চন্দন। 'ঐঁ' বীজদ্বারা ফুল প্রদান করবে। তারপর ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই তিন বীজমন্ত্র দিয়ে ষড়ঙ্গপূজা করতে হবে। 'ষড়ঙ্গ' শব্দের অর্থ ছ'টি অঙ্গ, যথা—দুই বাহু, দুই পা, মস্তক ও কটি বা কোমর। এই ছয়টি অঙ্গের দ্বারা পূজা-ই ষড়ঙ্গ পূজা।

বৃহৎ তন্ত্রসারঃ-এ বলা হয়েছে, "কুমারীই সাক্ষাৎ যোগিনী, কুমারীই সাক্ষাৎ পরমদেবতা। কুমারীপূজা করিলে তদ্বারা অসুরগণ, দুষ্টনাগগণ, দুষ্টগ্রহগণ, ভূতগণ, বেতালগণ, গন্ধর্ব্বগণ, ডাকিনীগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, সমুদায় দেবগণ, ভূলোক, ভূবর্লোক, স্বর্লোক, ভৈরবগণ, পৃথিবীপ্রভৃতি সমুদায় চরাচর ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, সকলেই সর্ব্বতোভাবে পরিতুষ্ট হয়েন।" (পৃষ্ঠা, ৭১২)।

কুমারী পূজায় সন্তুষ্ট হন অসুর থেকে সদাশিব। এই তালিকাভুক্তদের কতজনের অস্তিত্বে শিক্ষিত মানুষরা বিশ্বাস করেন, জানতে ইচ্ছে করে। যাঁরা ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে 'পবিত্র' কুমারী পূজা দেখতে হাজির হন, তাঁরা কি জেনে-বুঝে হাজির হন? নাকি এখানেও সেই ভেড়ার পালের গল্প?

তন্ত্রে বলি ও ফললাভ

"তন্ত্র বলেন, দেহস্থ আত্মা উষ্ণ-শোণিতের দ্বারা সঞ্জীবিত থাকেন ; শোণিত ঠাণ্ডা হইলে আত্মাকেও দেহত্যাগ করিতে হয়, অতএব উষ্ণ শোণিত আত্মার খাদ্য, যাহার সাহায্যে শোণিতের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়, তাহাই আত্মার খাদ্য। সুতরাং আত্মাকে

ভোগ দিতে হইলে উষ্ণ শোণিতই প্রশস্ত ভোগ।" (তন্ত্র পরিচয়, ১৫০ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন উঠতেই পারে—আত্মাকেই যখন চিন্তা বা চেতনা বলা হচ্ছে, তখন চিন্তা বা চেতনার দেহত্যাগ করার প্রশ্ন উঠছে কেন? দেহ ত্যাগ করে চিন্তা কোথায় ঘুরে বেড়ায়?

শোণিতের উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য উষ্ণ শোণিত কি সত্যিই কার্যকর? বরফ ঘেরা ঘরে রেখে উষ্ণ শোণিত ভোগ দিলে কি কোনও তান্ত্রিকের পক্ষে নিজের শরীরকে গরম রাখা সম্ভব? শরীর গরম করতে আজকাল নানা রকমের উত্তেজক পানীয় ও ওষুধ বাজারে এসে গেছে। এ'সবের চেয়ে শোণিত বা রক্ত কি বেশি কার্যকর?

তন্ত্র ও বিজ্ঞানের অবস্থান দুই মেরুতে। সুতরাং এ'সব যুক্তির প্রশ্ন আপাতত মুলতুবি রেখে আসুন, এ'বার ঢুকি বলি'তে।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে ও বৃহৎ তন্ত্রসারঃ-এ বলা হয়েছে, শক্তির উদ্দেশ্যে ছাগ-বলি দিলে বাগ্মী হয়, মেষ-বলি দিলে কবি, (রবীন্দ্রনাথ আদৌ কবি হ'তে পেরেছিলেন তো? যেভাবে সরাসরি বলিপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচার করেছিলেন খুব অল্প বয়সেই, তারপরও তিনি কী করে যে 'কবিগুরু' হলেন!) মহিষ-বলি দিলে সম্পদ বৃদ্ধি হয়, মৃগ-বলি দিলে মোক্ষফল ভাগী হওয়া যায়, গোধিকা বলি দিলে মহাফল লাভ করা যায়। নরবলি দিলে মহাসমৃদ্ধি লাভ হয়, অষ্টসিদ্ধির অধিকারী হয়। বলিদানের ফল ভোগ করে যজমান। ব্রাহ্মণের নরবলি দেবার অর্থাৎ খড়্গাঘাত করার অধিকার নেই।

ব্রাহ্মণ নিজ-হাতে নরবলি দিলে নরকে পতিত হবে। চণ্ডালকে দিয়ে নরবলি দেওয়াতে হবে। যে চণ্ডাল নিজ-হাতে নরবলি দেবে, তার মহাসিদ্ধি লাভ হবে। (এখানেও সেই ভণ্ডামীর গন্ধ পাচ্ছি)।

যাকে বলি দেওয়া হবে তাকে গন্ধপুষ্প দিয়ে পুজো করতে হবে। পুজোর মন্ত্র পশুর কানে বলতে হয়। মন্ত্রটা হল, 'পশ্চাৎ পশুপাশায় বিদ্মহে'। বলি দেবার আগে খড়্গের পুজো করতে হয় 'হ্রুঁ বাগীশ্বরীব্রহ্মভ্যাং নমঃ' মন্ত্র দ্বারা।

বলিদানের বিরুদ্ধে ভারতে একটি আইন আছে, 'Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960'। এতে ঈশ্বর উপাসনার নামে বলিদান শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ২০০২-তে বিহার ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যে এই আইনের প্রয়োগ কঠোর ভাবে করার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল। অন্যান্য রাজ্যে আইন থাকলেও আইনের প্রয়োগ নেই। সত্যি বলতে কী, আইন ভাঙাকে মসৃণ রাখতে ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা থাকে এই রাজ্যেও।

যত দিন এ'দেশের মানুষ প্রকৃত অর্থে 'শিক্ষিত' হয়ে উঠতে পারবে না, ততদিন বলিও থাকবে—এমন ভাবনায় একটা গোলমাল আছে। কড়া হাতে আইনের প্রয়োগ

হলে বে-আইনি কাজ বন্ধ হবে-ই। যারা হৈ-হৈ করে আইন ভাঙছে, অজ্ঞানতা ও আবেগ থেকে, তাদের মূল অংশই শাস্তির ভয়ে আইন মেনে চলবে। অবশ্য আইন রক্ষকদের দুর্নীতি মুক্ত করতে সরকারকে আন্তরিক হতে হবে। পুলিশ প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের চিন্তা সরকারকে ছাড়তে হবে।

তন্ত্রে বীজমন্ত্র ও নাদধ্বনি

তন্ত্রে বিভিন্ন দেব-দেবীর আরাধনার জন্য 'বীজমন্ত্র' রয়েছে। তন্ত্রে 'বীজমন্ত্র' ও দেবতা সমার্থক। শব্দই পরমব্রহ্ম। বীজমন্ত্র উচ্চারণে যে শব্দের উৎপত্তি, তা-ই দেবী-দেবতা।

'ক্রীং' বীজমন্ত্র কালীকে বুঝায়। কিন্তু 'হ্রীং' বীজে কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতিকে বোঝায়। কোনও বীজমন্ত্রে যেমন একটি দেবতাকে বোঝায়, আবার কোনও বীজমন্ত্রে একাধিক দেবতাকেও বোঝায়।

বীজমন্ত্রকে কেন্দ্রীভূত শক্তি বলা হয়েছে। বীজই কামকলা কুণ্ডলিনী। বীজ-বর্ণমালাই দেব-দেবী স্বয়ং। যেমন একটা বিশাল বৃক্ষ ক্ষুদ্র বীজে সুপ্ত থাকে, তেমন-ই বর্ণমালার বীজের মধ্যেই সব-দেবীর অবস্থান।

নাভি বা নাদ থেকে উঠে আসা বীজমন্ত্রের ধ্বনিই শব্দব্রহ্ম, যা সর্বজীবাশ্রয়ী। নাভি থেকে শব্দকে তুলে আনাও সাধনা।

এ'সব তন্ত্রের কথা। নাদধ্বনি বিষয়ে কী বলে? নাভি বা নাদ থেকে যে কোনও ধ্বনীই ওঠে না। ওঠা সম্ভব নয়। আমরা ধ্বনি সৃষ্টি করি ফুসফুসের বায়ুকে স্বরনালী দিয়ে বের করে। এ বিষয়ে আগেই আলোচনা করেছি।

বৈদিক বীজমন্ত্র ওঁকার। যার উচ্চারণ 'অ-উ-ম'। ওঁকার বলতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে বোঝায়। ওঁ-এর মধ্যে সমস্ত দেব-দেবীর বীজমন্ত্রই নিহিত রয়েছে।

'বিন্দু-সাধন' ও মস্তিষ্কে বীর্য প্রেরণ

বাৎসায়নের কামশাস্ত্রে বলা হয়েছে—কামের অন্তরঙ্গ-সাধনা তন্ত্রের নির্দেশেই হয়েছে। তন্ত্রে বলা হয়েছে দীর্ঘ ও নিবিষ্ট মৈথুন-ই জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন ঘটায়, শিব-শক্তির মিলন ঘটায়, কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত করে।

যতক্ষণ বীর্যপতন রোধ করা যায়, ততক্ষণ মৈথুন সম্ভব। বীর্যপাতে মৈথুনের শেষ।

মিলন যত দীর্ঘস্থায়ী, জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনও ততটাই দীর্ঘস্থায়ী। স্খলনহীন দীর্ঘ মৈথুনকে বলে 'বিন্দু-সাধন'।

দেবতত্ত্ববাদী পুরুষ তলায় নিক্রিয় থেকে শক্তিকে বিপরীত আসনে রেখে মিলনকে দীর্ঘস্থায়ী ও আনন্দদায়ক করে।

ছটি চক্র ভেদ করে কুণ্ডলিনী জাগ্রত করতে দুটি পদ্ধতির প্রয়োগ রয়েছে তন্ত্রে। (১) নারী-পুরুষের মিলন (২) মানস।

'চক্র' ছটি আছে আমাদের শরীরে, যথাক্রমে গুহ্যে, লিঙ্গমূলে, নাভিতে, হৃদয়ে, কণ্ঠে ও ভ্রূদ্বয়ের মাঝে। মস্তিষ্কের নীচে রয়েছে সহস্রদল পদ্ম। পদ্মের উপরে ফণা মেলে রয়েছে একটি সাপ। এ'সব আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

নতুন যা নিয়ে আলোচনায় ঢুকতে চাইছি, তা তন্ত্রের-ই পুরোন কথা, তন্ত্রের মূল তত্ত্ব।

তন্ত্র বিশ্বাস করে, মানস সাধনার দ্বারা, অর্থাৎ মানসিকভাবে চিন্তা করে বীর্যকে উর্ধ্বমুখী করে মস্তিষ্কের সহস্রদল-পদ্মে নিয়ে যাওয়া যায়। এবং বীর্যকে আবার স্ব-স্থানে নিয়ে আসা যায়।

এই যে একটার পর একটা চক্র ভেদ করে বীর্যকে মস্তিষ্কে নিয়ে আসা — এটাই হল কুণ্ডলিনী জাগ্রত করার মানস সাধনা।

বীর্যকে এ'ভাবে ওঠানো, নামানো বাস্তবে অসম্ভব। এমন বিজ্ঞান-বিরোধী চিন্তা নিয়েই তন্ত্র ও যোগ। জানি না কবে এ'সবের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য বই লেখার প্রয়োজন ফুরোবে?

'যন্ত্র' বা 'যন্ত্রম' ঃ যে কোনও সমস্যার স্থায়ী সমাধান

কলকাতা থেকে প্রকাশিত নামি দৈনিক পত্রিকাগুলোর দু'য়ের পৃষ্ঠা এখন তান্ত্রিক-জ্যোতিষীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। কিছু টিভি চ্যানেলে তো এখন পুরোপুরো 'তন্ত্র-চ্যানেল'। তান্ত্রিক-জ্যোতিষীদের বিজ্ঞাপনের সুবাদে 'যন্ত্র' বা 'যন্ত্রম' শব্দটা অদৃষ্টবাদীদের কাছে খুবই সুপরিচিত।

জ্যোতিষীদের চেয়ে তান্ত্রিক-জ্যোতিষীদের রমরামই বর্তমানে বেশি। ওঁরা 'যন্ত্র'কে প্রোমোট করতে দারুণ দারুণ স্লোগান হাজির করেছেন। কপি রাইটারদের তৈরি দামি স্লোগান— 'বিনা রত্নে স্থায়ী প্রতিকার', 'যন্ত্রমে নিশ্চিত সমাধান', 'রত্ন মেলে লাখ লাখ, যন্ত্র মেলে এক', 'তন্ত্রের শেষ কথা যন্ত্রম' ইত্যাদি কত না কথার রোশনাই।

রত্নের তুলনায় যন্ত্রমের দিকে ঝোঁকার প্রবণতা বেড়েছে। তান্ত্রিক-জ্যোতিষীরা যেমন 'যন্ত্রম' দিতে বেশি বেশি করে ঝুঁকছেন, তেমন-ই নিয়তিবাদে বিশ্বাসীরাও প্রচারের চমকে গ্রহরত্নের চেয়ে যন্ত্রমের দিকে ঝুঁকেছেন বেশি। তান্ত্রিক-জ্যোতিষীদের ঝোঁকার কারণ, রত্নের তুলনায় যন্ত্রমে লাভ অনেক বেশি। সাধারণত পেসেন্টদের কাছে রত্ন বিক্রি করে মেলে দেড়'শো থেকে তিন হাজার। কিনতে যায় দশ থেকে তিনশো। অর্থাৎ বাড়তি দাম মেলে একশো চল্লিশ থেকে দু'হাজার সাতশো টাকা।

যন্ত্রম-এর বিক্রির দাম পাঁচ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা—যা খুশি দাবে। বাড়তি দাম পাওয়া যায় চার হাজার ন'শো সত্তর টাকা থেকে আটচল্লিশ হাজার আটশো পর্যন্ত। সুতরাং যন্ত্রমের দিকে পাল্লা ভারী তো হবেই।

বিজ্ঞাপন-ই এখন সবচেয়ে বড় জাদু। বিজ্ঞাপনে ভুলে সোনা-চাঁদি চেটে মানুষ মেধা-স্মৃতিকে বাড়াতে চাইছে, মুক্তো ঘষে সাত দিনে ফর্সা হতে চাইছে। বিজ্ঞাপনের আকর্ষণী শক্তিতে মানুষ থেকে লক্ষ্মী-সরস্বতীকে বশ করতে চাইবে, তন্ত্রে নব্বই দিনে এইডস থেকে ক্যানসার সারাতে চাইবে—এতে অবাক হওয়ার কী আছে?

তন্ত্রে অবশ্য যন্ত্রের বা যন্ত্রমের কথা আছে। যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে নানা অসম্ভব কাজ, অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেবার কথাও আছে। সত্যিই আছে। ঈশ্বর সত্যি হলে, তন্ত্র সত্যি হলে, যন্ত্রও সত্যি—অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু 'যন্ত্র' সত্যি কাজের কি না, সেটা জানার আগে 'যন্ত্র' কী—সেটা জানা জরুরি। অর্থাৎ যন্ত্রের সংজ্ঞা কী?

যাঁরা তান্ত্রিক, 'যন্ত্র' বা 'যন্ত্রম' চড়া দামে বিক্রি করেন, তাঁরা যন্ত্রের সংজ্ঞা জানেন—এমন ভাবাটাই স্বাভাবিক। আমিও এমনটা-ই ভেবেছিলাম। জানি, এঁদের অনেকেই স্কুলের গণ্ডি পেরুতে পারেননি। তান্ত্রিক হওয়ার জন্য স্কুলের গন্ডি পেরুনো জরুরি নয়। কিন্তু যাঁরা হেঁকে-ডেকে সমস্ত সমস্যা সমাধানের স্বপ্ন দেখিয়ে 'যন্ত্র' বেচছেন, তাঁরা 'যন্ত্র' শব্দটার সংজ্ঞাই জানবেন না—এ'টা অনৈতিক, এ'টা স্পষ্টতই প্রতারণা।

আজ পর্যন্ত রেডিও-টিভি ও সেমিনারে কম করে শ'দেড়েক জ্যোতিষীর মুখোমুখি হয়েছি। তাঁদের অনেকেই 'যন্ত্র' বা 'যন্ত্রম' দেন। 'যন্ত্র' জিনিসটা কী জিজ্ঞেস করলেই সব্বাই কেমন তোতলাতে থাকেন, গোলাতে থাকেন।

একটি ঘটনা। সময়—আজ থেকে বছর খানেক আগে। এ টি এন ওয়ার্ল্ড টিভি চ্যানেলের জন্য অনুষ্ঠান ক্যামেরা বন্দি করা হচ্ছে। আলোচক—আমি আর 'বিনারত্নে স্থায়ী প্রতিকার'-এর বিজ্ঞাপনে বাজার মাত করে দেওয়া মহিলা জ্যোতিষী 'কাম' তান্ত্রিক। একথা সে'কথায় বিতর্ক জমে গেছে। এমন সময় জিজ্ঞেস করলাম—এই যে আপনি রত্নের বদলে তাবিজ-কবচ-যন্ত্র দেন, তা 'যন্ত্র'টা কী?

মহিলা শুধু এড়িয়ে যাচ্ছিলেন এ'কথা বলে যে — যন্ত্র বা যন্ত্রম ব্যাপারটা এতই বিশাল ব্যাপার যে, এত. কম সময়ে বলা সম্ভব নয়। বললাম—এই যে আপনারা 'তারা-যন্ত্র', 'কালী-যন্ত্র', 'বগলা-যন্ত্র', 'সরস্বতী-যন্ত্র' এইসব বিক্রি করেন, সেই তারা-কালী-বগলা-সরস্বতীর সঙ্গে যন্ত্রের সম্পর্কটা ঠিক কী? আমাকে একজন বলেছিলেন, 'যন্ত্র' মানে 'যোনি'। অর্থাৎ তারা 'তারা-যন্ত্র' মানে তারার যোনি। এ'সব কথা সত্যি না কি?

মহিলা চেঁচালেন—একদম বাজে কথা।

—তা হলে 'যন্ত্র' মানে কী? আপনি যখন জানেন, এটা বাজে কথা, তখন সত্যি কথাটাও নিশ্চয়ই জানেন?

'যন্ত্র' যে এক-দু কথায় বলার মত বিষয় নয়, এটাই আবারও আমাকে বোঝাতে চাইলেন মহিলা।

এ'বার বললাম—একজন আমাকে বলেননি। আমিই বলছি, 'যন্ত্র' বা 'যন্ত্রম' মানে 'যোনি'। 'তারা-যন্ত্রম' মানে তারার যোনি। এই যোনির ছবি আঁকার পর বলে 'যন্ত্র'।

মহিলা চুপ মেরে গেলেন।

'যন্ত্র' আঁকার আবার তান্ত্রিক বিধি রয়েছে। বৃহৎ তন্ত্রসারঃ গ্রন্থে বলা হয়েছে, "কুঙ্কুম, রক্তচন্দন অথবা ভস্মদ্বারা সুবর্ণাদি পাত্রে মাতৃকাযন্ত্র অঙ্কিত করিবে। শক্তিমন্ত্রে কুঙ্কুম, বিষ্ণুমন্ত্রে রক্তচন্দন ও শিবমন্ত্রে ভস্মদ্বারা মাতৃকাযন্ত্র লিখিয়া মন্ত্র সংস্কার করিতে হইবে।"... "তৎপর অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া ঐ পদ্মের অষ্ট পত্র মধ্যে অষ্টবর্গ লিখিবে। পদ্মের বহির্ভাগে চতুর্দ্বার ও চতুষ্কোণ অঙ্কিত করিয়া পদ্ম বেষ্টন করিবে। এই বর্ণময় যন্ত্র সাধক মনুষ্যের সৌভাগ্য ও সম্পদ বৃদ্ধি করে। যন্ত্রের চতুর্দ্দিকে এবং চতুষ্কোণে ঠং লিখিবে। গৌতমীয় তন্ত্রে পদ্মের পূর্ব্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশানকোণ পর্য্যন্ত অষ্টদলে লিখিতে হইবে। তৎপরে চতুরস্র ও চতুর্দ্বার লিখিয়া চতুর্দ্বারে বং এবং চতুষ্কোণে ঠং লিখিয়া যন্ত্র অঙ্কিত করিবে।"

সত্যিই অং বং চং! এর মধ্যে গভীরে কোনও মাহাত্ম্য খুঁজতে যাওয়া বৃথা। আসলে তন্ত্রকে একধরনের প্রাচীন 'Sexology' বা 'কামশাস্ত্র' বললে ভুল হয়

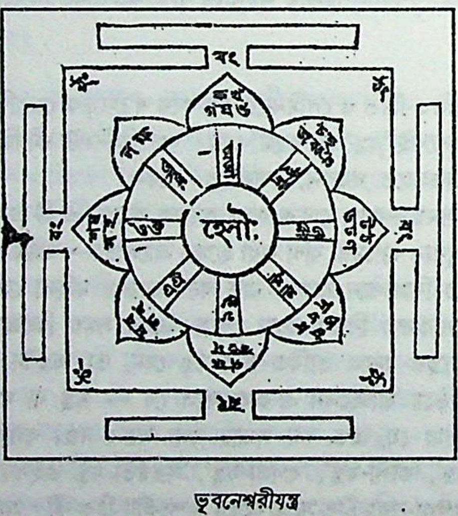

ভুবনেশ্বরীযন্ত্র

না। তবে তন্ত্র এমন-ই এক কামশাস্ত্র যেসখানে ভণ্ডামী ও বিকৃতির দাপটে কামকলার স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও আনন্দ অনুপস্থিত।

শক্তির মধ্যে ছিন্নমস্তাদেবী সবচেয়ে উগ্র। ছিন্নমস্তার যন্ত্রচিত্র কেমন? এই নিয়ে নানা মুনির নানা মত। এ'কথা স্বীকার করে তন্ত্রের বিভিন্ন আকর গ্রন্থও। ছিন্নমস্তাদেবীর একটি যন্ত্র-চিত্র এখানে তুলে দিলাম :

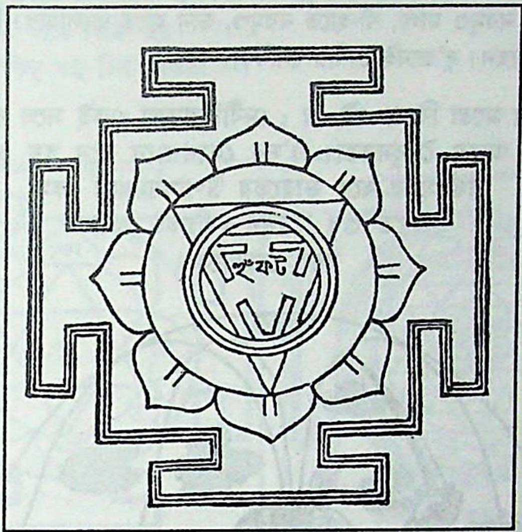

দেবী ছিন্নমস্তাযন্ত্র

যন্ত্র-চিত্র আঁকার নির্দেশ এই রকম : প্রথমে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে মণ্ডলাকারে তিনটি রেখা অঙ্কিত করিবে। সেই মণ্ডলমধ্যে দ্বারত্রয়বিশিষ্ট যোনিমণ্ডল অঙ্কিত করিতে হইবে। ত্রিকোণের বহির্ভাগে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহ্যে ভূবিম্বত্রয় লিখিবে। যোনিমধ্যে 'হুঁ ফট্' এই মন্ত্র লিখিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবে।

তন্ত্র মতে দেবী ছিন্নমস্তার রূপ এই রকম — দেবী নিজের মাথা কেটে ফেলেছেন। বাঁ হাতে ধরা রয়েছে নিজের কাটা মাথা। দেবীর ছিন্ন গলা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে বের হচ্ছে রক্ত। দেবীর কাটা মাথা সেই রক্ত পান করছে। কেশ আলুলায়িত, নানা পুষ্পে বিভূষিতা। দেবীর ডান হাতে তলোয়ার, গলায় মুণ্ডমালা। দেবী নগ্না। ডান পা এগিয়ে, বাঁ পা পিছিয়ে। গলায় উপবীতের মত ঝুলছে সাপ। দেবীর এক রূপ যেমন ভয়ংকর, তেমন-ই দেবীর আর এক রূপ—কামকলারতা ষোড়শী সুন্দরী। একই দেবীর দুই রূপ। দুই-ই সত্য। ষোড়শী সুন্দরী দেবীর স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত। উপবীতের মতো ঝুলছে সাপ, গলায় অস্থিমালা। ষোড়শী সুন্দরী দেবীছিন্নমস্তা কামাতুরা, বিপরীত আসনে পুরুষের সঙ্গে মৈথুন-রতা।

দেবীর ডান ও বাঁয়ে রয়েছেন ডাকিনী ও বার্ণাণী নামের দুই নায়িকা। এঁরাও

দেবীর গলদেশ থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত পান করছেন। বার্ণাণী সৌমাকৃতি, রক্তবর্ণ, মুক্তকেশী, নগ্না। বাঁ হাতে নরমুণ্ড, ডান হাতে তলোয়ার। গলায় নরমুণ্ডমালা ও সাপ। এঁর দক্ষিণ পা এগিয়ে, বাঁ পা পিছিয়ে। বয়সে ষোড়শী।

ডাকিনী ত্রিনয়না। স্তনদ্বয় অতিস্থূল ও উন্নত। ভয়ংকরদর্শনা!, আলুলায়িত কেশী, নগ্না। গলায় নরমুণ্ড মালা, বাঁ-হাতে নরমুণ্ড, ডান হাতে তলোয়ার। ইনিও দেবীর রক্তপান করছেন। দু'জনেই দেবীর সেবিকা।

লক্ষ করার মতো বিষয় এই যে ; দেবীছিন্নমস্তা একই সঙ্গে রক্তপিপাসু এবং অনন্ত মৈথুনরতা। এ'সব দেখে-শুনে মনে হয় একটা দীর্ঘ সময় ধরে ভারতের উপাসনা-ধর্মে 'কর্ম' বলতে শুধু 'মৈথুন-কর্ম'কেই প্রধান বলে বোঝাতো।

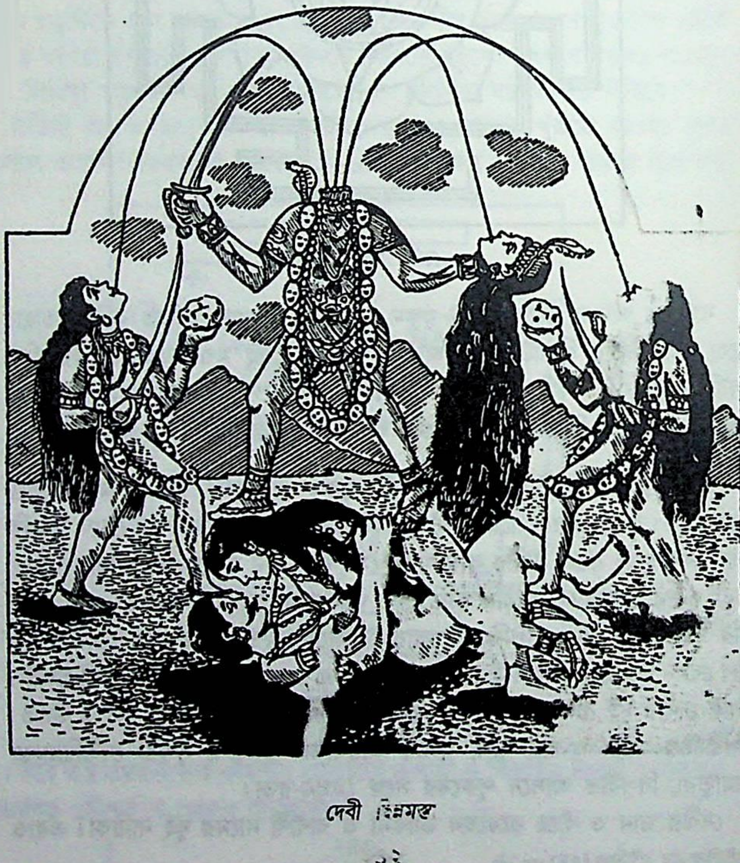

দেবী ছিন্নমস্তা

ফিরি যন্ত্র বা যন্ত্রমের কথায়। রেডিমেড তান্ত্রিকদের জন্য রেডিমেড যন্ত্র পাওয়া যায়। এ'সব যন্ত্র সোনা-রুপো বা তামার পাতে খোদাই করে তৈরি হয় আজকাল। কলকাতার বড়বাজারে প্রধানত বিক্রি হয়। ক্রেতা—তান্ত্রিকরা। বড়বাজারের দাম তিরিশ টাকা থেকে হাজারের মধ্যে। এ'গুলোই হাত-ঘুরে পাঁচ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত দামে বিক্রি হয়।

এখানে কিছু যন্ত্র চিত্র দেওয়া হল

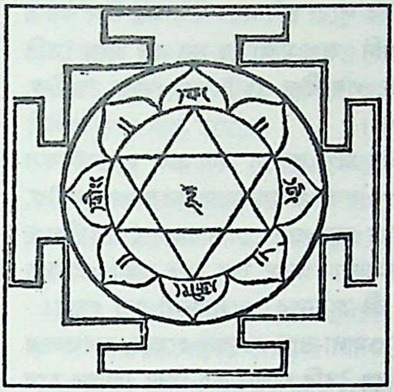

তারাযন্ত্র

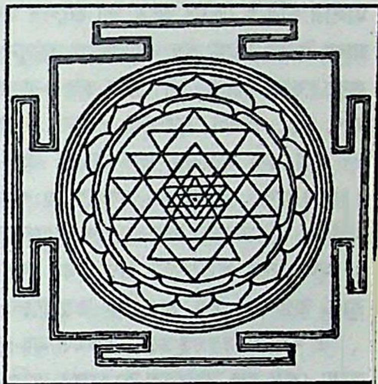

শ্রীবিদ্যাযন্ত্র

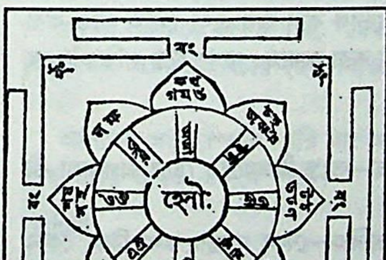

নীলসরস্বতীযন্ত্র

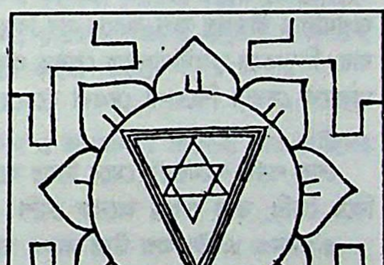

শ্যামাযন্ত্র

এ সি চেম্বার আর দৈনিক বিজ্ঞাপনের খরচ তুলে মাস গেলে তিন লাখ থেকে তিরিশ লাখ লাভ-ই যদি না তোলা গেল, তবে তো তান্ত্রিকের ভেক ধরায় সুখ থাকে না। অতএব দাম তো এভাবে পঞ্চাশ থেকে একশো গুণ বাড়বেই।

জপের মালা

জপের মালা বলতেই আমাদের চোখের সামনে যে তুলসি কাঠে তৈরি জপের মালার ছবি-ই ভেসে ওঠে, তা জপের মালার পুরো ছবি নয়। বীজ-মন্ত্র জপ করার মালা তৈরি নিয়ে তন্ত্র কী বলছে আসুন শুনি। জপ-মালা যে-সব বস্তু দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে, সে'গুলো হল—রুদ্রাক্ষ, পদ্ম-বীজ, ছোট্ট শঙ্খ, মুক্তা, স্ফটিক, মণি, রত্ন, প্রবাল, কুশমূল, সোনা ও রূপা।

এক এক ধরনের জপ-মালায় বীজ-মন্ত্র জপ করলে এক এক ধরনের ফল পাওয়া যায়। যেমন — শঙ্খমালায় শতগুণ ফল, প্রবালমালায় সহস্রগুণ, স্ফটিক, মণি ও রত্নমালায় দশসহস্রগুণ, মুক্তামালায় লক্ষ-গুণ, সোনারমালায় কোটিগুণ, কুশমূলমালায় শতকোটি গুণ এবং রুদ্রাক্ষমালায় অনন্ত ফল লাভ হয়। এই মত বৃহৎ তন্ত্রসারঃ সহ একাধিক তন্ত্রগ্রন্থের। কী হাস্যকর ছেলেমানুষী সব গপ্পো!

এ'খানেও তন্ত্রগ্রন্থগুলো একমত নয়। 'মুণ্ডমালা-তন্ত্র'-তে বলা হয়েছে, জপমালার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল মানুষের আঙুলের অস্থি দিয়ে তৈরি মালা। এই মালা গাঁথতে হবে মানুষেরই নাড়ি দিয়ে। এই জপমালায় বীজ-মন্ত্র জপ করলে সব কামনা পূর্ণ হয়। কী ভয়ংকর বীভৎস চিন্তা—ভাবা যায়!

ত্রিপুরাসুন্দরী তন্ত্রে বলা হয়েছে, রক্তচন্দন দিয়ে তৈরি বীজমালা শ্রেষ্ঠ। এই জপমালায় বীজমন্ত্র জপ করলে সব কিছু ভোগ করা যায় এবং মোক্ষ লাভ করা যায়। বিষ্ণুতন্ত্রে তুলসীমালাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। গণেশতন্ত্রে হাতিরদাঁতের মালাকে সেরার শিরোপা দেওয়া হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে—তন্ত্রে বীজমন্ত্রের চেয়ে জপমালা কী দিয়ে তৈরি, তার গুরুত্ব অনেক বেশি।

এ'খানেও একটা প্রশ্ন উঠে আসা স্বাভাবিক—কোন্ তন্ত্রের কথা ঠিক, কোন্ তন্ত্রের বেঠিক? 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু' বা 'যত মত, তত পথ'-এ বিশ্বাস করার মত বোকা মানুষরাও আজও সংখ্যায় বেশি। এ'টাই তান্ত্রিকদের কাছে আশার কথা।

এ'খানে-ই শেষ নয়। জপমালা আঙুলে, নাকি আঙুলের পর্বে জপতে হবে—সে'খানেও নিয়মের বেড়ি। আঙুলে জপলে একগুণ ফল হয়। আঙুল পর্বে গুণলে আটগুণ ফল।

নানা ভাবে জপে নানা রকম ফললাভের গবেষণা একজনের পক্ষে অসম্ভব। কোনও একটায় জপে চূড়ান্ত ফল লাভ যার হয়ে গেছে তার পক্ষে অন্য জপমালার বা আঙুলে, পর্বের পার্থক্য বোঝা সম্ভব নয়। আবার সম্মিলিত গবেষণায়ও এমন নিক্তির হিসেবে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অসম্ভব! তাহলে? একজনের মনে হল, তাই? এক একজন জাদু-পুরোহিতের এক এক রকম মনে হল, আর তাই তাঁরা গুরুবাক্য হিসেবে বলে গেলেন। ভক্তদের প্রশ্নাতীত আনুগত্য বা নির্ভেজাল বোকামোর দৌলতে গুরুবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো!

জপমন্ত্র ও আসন

'আসন' বলতে এখানে কোনও যোগ মুদ্রাকে বোঝানো হয়নি। আসন বলতে স্পষ্টতই বসার আসন, যে আসনে বসে জপ করতে হবে সে বিষয়ে কিছু নিয়ম-বিধির কথা বলা হয়েছে।

'বীজমন্ত্র' আবার যেখানে-সেখানে বসে জপ করলে ফল মিলবে না। 'হংসপরমেশ্বর তন্ত্র' জপের আসন প্রসঙ্গে জানাচ্ছে, কম্বলের আসন, সুতোর তৈরি আসন, কাঠের আসন এবং চামড়ার আসন-ই প্রশস্ত। কম্বলের মধ্যে লাল কম্বল বেশি ভালো।

জ্ঞান সিদ্ধির জন্য কৃষ্ণসার হরিণের চামড়ার আসনে বসে জপ করতে হবে। সম্পদ কামনায় বাঘের চামড়ার আসন প্রশস্ত।

এখানেও দ্বিমত আছে। বৃহৎ তন্ত্রসারঃ'এ পাচ্ছি, লোম যুক্ত আসনে কোনও ধরনের জপ-সাধন করতে নেই। সঙ্গে বলা হয়েছে, মৃত্তিকাসনে দুঃখ, কাষ্ঠাসনে দুর্ভাগ্য, বংশনাশ, পাষাণে রোগ, তৃণাসনে যশোহানি, বস্ত্রাসনে জপ হানি এবং পাতার আসনে বসে জপ করলে পাগল হয়ে যায়। এ'সব কথা গৌতমী তন্ত্রেও বলা হয়েছে।

আগম কল্পদ্রুমে বলা হয়েছে, "মেষচর্ম্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, গজচর্ম্ম, উষ্ট্রচর্ম্ম ও সর্পচর্ম্ম এই সকল আসন অবিচার (ইষ্ট সিদ্ধিতে) কার্য্যে বিহিত।"

আসনের লড়াই! আর পারি না! আসন ও জপমালার প্রাধান্যে দেব-দেবীদের পিছু হটার ছবিও এখানে স্পষ্ট।

যোগিনী

বিভিন্ন পুরাণে যোগিনীদের কথা রয়েছে। যোগিনীরা হলেন মাতৃকাশক্তি। বিভিন্ন দেবতাদের মাতৃকাশক্তি। যোগিনীদের সংখ্যা আট। এঁদের প্রকাশ আবার আটটি ভিন্ন রূপে। অর্থাৎ মোট যোগিনীর সংখ্যা আট গুণ আট। অর্থাৎ চৌষট্টি।

যেমন ধরুন 'ভদ্রকালী'। ইনি একজন যোগিনী। এঁর আটটি রূপ হল (১) জয়ন্তী, (২) মঙ্গলাকালী, (৩) ভদ্রকালী, (৪) কপালিনী, (৫) দুর্গা, (৬) শিবা, (৭) ক্ষমা, (৮) ধাত্রী।

'উগ্রচণ্ডা' এক যোগনী। তাঁর অষ্টযোগিনী হলেন, (১) কৌশিকী, (২) শিবদূতি, (৩) হৈমবতী, (৪) ঈশ্বরী, (৫) শাকম্ভরী, (৬) দুর্গা, (৭) মহোদরী, (৮) উগ্রচণ্ডা।

'উমা'র অষ্টযোগিনী হলেন, (১) জয়া, (২) বিজয়া, (৩) মাতঙ্গী, (৪) ললিতা, (৫) নারায়ণী, (৬) সাবিত্রী, (৭) স্বধা, (৮) স্বাহা।

এ'ছাড়াও কত না যোগিনী! নামগুলোও বেশ! সুরসুন্দরী, মনোরমা, পদ্মিনী, নটিনী, মধুমতী ইত্যাদি। ডাকিনী-যোগিনী বলতে আমরা পাড়ার কালীপুজোয় যে নগ্না ভয়ংকরী মূর্তি দেখে কল্পনা করি, জাদু-পুরোহিতদের কল্পনার যোগিনীরা কিন্তু আদৌ তেমন নন। এঁরা প্রত্যেকেই ষোড়শী সুন্দরী।

এক সময় চৌষট্টি যোগিনীর শক্তিপুজো ভারতবর্ষে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। খাজুরাহো, জব্বলপুরের কাছে ভেরাঘাট, ভুবনেশ্বরের কাছে হীরাপুর ও সম্বলপুরের কাছে রানিপুরে চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির আছে।

যোগিনীকে ভার্যা করার মন্ত্র-তন্ত্র

'ভূতডামর'-এ বলা হয়েছে—যোগিনীরা দেবতাদের কাছেও দুর্লভ 'শক্তি'। এঁরা পরমাসুন্দরী, চিরযৌবনা, স্তনদ্বয় উচ্চ ও স্থূল। এইসব দেবী-সুন্দরীদের পুজো করে যে ভাবে চাওয়া যায়, সে'ভাবেই পাওয়া যায়। যোগিনী পুজোর পর সাধক বর প্রার্থনা করবে। বর প্রার্থনা করার সময় দেবীকে 'মাতা', 'ভগিনী', অথবা 'ভার্যা' সম্বোধন করতে হবে।

দেবীকে 'মা' সম্বোধন করলে দেবী সাধককে নানা সুন্দর-সুন্দর ও দামী জিনিস-পত্তর উপহার দেন। এমনকি রাজ্য চাইলে রাজাও করে দেন। একই সঙ্গে সোনিয়াজী আর বাজপেয়ীজী ভারতের রাজত্ব চাইলে যোগিনীদেবী কী করবেন? তাত্ত্বিকভাবেও প্রশ্নের উত্তর মেলে না।

সাধক যদি যোগিনীকে 'বোন' সম্বোধন করেন, তাহলে যোগিনী ভাই জ্ঞানে সাধককে অনেক কিছু দিয়ে থাকেন। যেমন ধরুন নানা ধরনের জিনিস, পোশাক এবং সহবাসের জন্য দারুণ সুন্দরী মেয়েদের এনে দেন (বাঃ, এই না হলে বোন!)। এ'ছাড়াও সাধক যা চান, যোগিনী সেই কামনাই পূর্ণ করেন।

সাধক যদি দেবী যোগিনীকে 'ভার্যা' সম্বোধন করতে চান, তাহলে এই সম্বোধনের আগে নিজের বিবাহিতা বউটির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। দেবীকে নিজের বউ করে নিলে দেবীর কিছুই অদেয় থাকে না। শরীর, মন, ধন সবই সাধককে দেন। ষোড়শী যোগিনীর সঙ্গে কামকলার অনন্য সুখের সঙ্গে বাড়তি পাওয়া যায় স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে ভ্রমণের ক্ষমতা। দেবীশক্তি যার বউ, তাঁর ক্ষমতা যে দেবতুল্য, এ'বিষয়ে নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ'বার যোগিনী সাধন প্রণালী ও মন্ত্র বলছি। এই সাধন প্রণালী ও মন্ত্র স্বয়ং মহাদেব কথিত। জাদু-পুরোহিতদের দাবি এমনটাই।

সাধক বটবৃক্ষমূলে যোগিনীর পুজো করবে। 'হ্রীঁ' এই মন্ত্রে প্রাণায়াম করবে। তারপর 'হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ' বলে প্রতিদিন দশ হাজার জপ করতে হবে। সাতদিন এইভাবে জপ করার পর অষ্টম দিনে 'ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ পদ্মিনী স্বাহা' জপ করলে পদ্মিনী আসবেন প্রার্থনা পূরণ করতে। একই ভাবে জপ করে পদ্মিনীর বদলে 'দুর্গা স্বাহা' বললে, 'দুর্গা' আসবেন। এ'ভাবে মন্ত্রে যে কোনও যোগিনীকেই আনতে পারেন সাধক। অষ্টম দিনে অবশ্য দেবী-যোগিনীর উদ্দেশ্যে বলি দিতে বলা হয়েছে।

তন্ত্রে আরও একটি জরুরি নির্দেশ রয়েছে। যোগিনী প্রতিদিনই সাধককে একশো স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে থাকেন। সাধককে প্রতিদিনই এই একশো স্বর্ণমুদ্রাই ব্যয় করতে হবে। অন্যথা হলে দেবী রাগ করেন। স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া তো বন্ধ করেন-ই, সঙ্গে আর যা যা দিচ্ছিলেন, সবই বন্ধ করে দেন।

হায়, আধুনিক তান্ত্রিকগণ, আপনারা কি তন্ত্রে বিশ্বাস করেন না? আপনাদের কি ভাল রকম জানেন যে—তন্ত্রে কিচ্ছুই হয় না? 'যা বলি তা করো, যা করি তা কোরো না'—এটাই কি আপনাদের নীতি?

এমন একজন তান্ত্রিকও কি তন্ত্রের দেশ ভারতে নেই ; যিনি তন্ত্রে বিশ্বাস করেন? থাকলে তিনি এগিয়ে আসুন। এ'দেশের সুমহান অধ্যাত্মবাদ ও তন্ত্রের ঐতিহ্যকে আবার প্রতিষ্ঠিত করুন। তন্ত্রে যোগিনীকে সন্তুষ্ট করে সম্পদে বিল গেইট'কে টেক্কা মারুন। তন্ত্র সত্যি হলে এই টেক্কা মারাটা কোনও ব্যাপারই নয়।

এতে তন্ত্র যে শুধু বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বলে প্রতিষ্ঠিত হবে, শুধু তাই নয়, একটা নোবেল পুরস্কার সুনিশ্চিত। আমরাও পুলকিত হবো। মানব সম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রী মুরলী মনোহর যোশী তো হবেন-ই।

আমার একটি নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী— কোনও তান্ত্রিক-ই এগিয়ে আসবেন না। কারণ তাঁরাই সবচেয়ে ভাল জানেন, তন্ত্র একটি নির্ভেজাল বুজরুকি।

বশীকরণ

তন্ত্রে এমন কিছু গোপন প্রক্রিয়া আছে, যার সাহায্যে নারী, রাজা, মন্ত্রী থেকে যে কোনও শত্রুকেই বশ করা যায়।

নারীদের মধ্যে যাঁদের বশে আনা যায়, প্রেমে পাগল করে দেওয়া যায়, তাঁরা হলেন—উর্বশী, মেনকা, রম্ভা'র মত যে কোনও অপ্সরা, (স্বর্গের ষাট কোটি অপ্সরার যে কেউ বলে বলে অন্তত এক ডজন গোলে হারাবেন মিস ওয়ার্ল্ড বা মিস

ইউনিভার্সদের) যে কোনও রাজকন্যা, যে কোনও দেবকন্যা (লক্ষ্মী, সরস্বতী সমেত সব দেবীই তো দেবকন্যা), ঋষিকন্যা, বিদ্যাধরী, দেবতাদের স্ত্রী ও শত্রুর পত্নী সহ যে কোনও মানব-কন্যা।

নারী-বশীকরণের কয়েকটি অব্যর্থ তন্ত্র প্রক্রিয়ার কথা আকর তন্ত্র গ্রন্থগুলোতে আছে।

● পদ্ধতি এক ঃ দশমহাবিদ্যার যে কোনও একজন মহাবিদ্যাশক্তির চক্র আঁকতে হবে। উদাহরণ হিসেবে আমরা এখানে দেবীমাতঙ্গীর চক্র বা যন্ত্রের ছবি দিলাম।

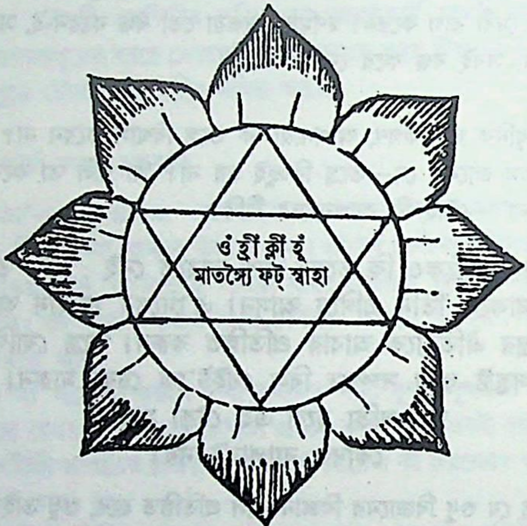

দেবীমাতঙ্গীযন্ত্র

যে নারীকে বশীভূত করতে চান, সাধক তার নাম ওই চক্র বা যন্ত্রের মধ্যে লিখবেন। এবং মনে মনে ওই রমণীর কথা চিন্তা করবেন। তাহলেই দেখা যাবে "সহস্রযোজন দূরস্থিতা অদৃষ্টপূর্ব্বা শ্রুতমাত্রা (যাকে দেখিনি, নাম শুনেছি মাত্র) দুর্লভা রাজকন্যা অথবা অন্যের ভার্য্যা মন্ত্রমূঢ়া ও লজ্জাভয়বিবর্জ্জিত হইয়া সাধকের নিকট আগমন করে।" ....."সাধক যে রমণীকে কদাপি দর্শন করেন নাই, যদি তাহারও নাম চক্রমধ্যগত করিয়া যোনিমুদ্রা ধারণ করেন, তাহা হইলে যক্ষিণী, রাজকন্যা, নাগকন্যা, অপ্সরা, খেচরী, দেবকন্যা, বিদ্যাধরী, দিব্যরূপা ঋষিকন্যা অথবা শত্রুর পত্নীকে আনয়ন করিতে পারেন। মদনসম্ভূত সন্তাপে ঐ সকল রমণীর জঘন বসন স্খলিত হইতে থাকিবে, মদনবাণে তাহাদের অন্তঃকরণ বিভিন্ন হইবে। এইরূপ অবস্থায় তাহারা বিলোললোচনে সাধকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে।"

● পদ্ধতি দুই ঃ একভাগ কুঙ্কুম, একভাগ গোরচনা (গো-পিত্তজাত উজ্জ্বল পীত রঙ্) দুই ভাগ চন্দন একসঙ্গে ভালমত মেশাতে হবে। এই মিশ্রণের তিলক পরতে হবে। তবে তিলক পরার আগে মিশ্রণ সামনে রেখে বা মিশ্রণ স্পর্শ করে একশো বার কোনও এক দশমহাবিদ্যার বীজমন্ত্র জপ করতে হবে। জপ শেষে মিশ্রণের তিলক পরলে ত্রিলোক বশীভূত হবে। কৃতার্থচিত্তে আজ্ঞা পালন করবে।

দেবীমাতঙ্গী দশমহাবিদ্যার-ই একটি রূপ। দেবীমাতঙ্গীর মহামন্ত্র হল—"ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হূঁ মাতঙ্গ্যৈঁ ফট্ স্বাহা।"

● পদ্ধতি তিন ঃ পান, ধূপ, দীপ, জল, ফুল, ফল, পাতা, দুধ, দই, ঘি, কর্পূর, কস্তুরী, কুঙ্কুম, লবঙ্গ বা বস্ত্র যে কোনও একটি দ্রব্যকে স্পর্শ করে একশো-আট বার বীজমন্ত্র জপ করে দ্রব্যটি যে মানুষটিকে দেওয়া হবে, সে ওই দ্রব্য ব্যবহার শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বশীভূত হয়ে যাবে। এই প্রয়োগদ্বারা সমুদায় রমণী বশীভূত ও দাসীর ন্যায় হইয়া থাকে।

● পদ্ধতি চার ঃ শ্রীখণ্ড, গুগ্‌গলু, কর্পূর ও অগুরু সহ হোম করলে ত্রিভুবণে যে কোনও নারী বশীভূত হয়। 'হোম' মানে মন্ত্র উচ্চারণ করে দেব-দেবীর উদ্দেশে যজ্ঞের আগুনে ঘৃতাহুতি দান। আর মন্ত্র? সে তো ইতিমধ্যে আপনাদের জানাই হয়ে গেছে। তাই আর একই কথা আবার লিখলাম না।

● পদ্ধতি পাঁচ ঃ গোরচনার উপর একশো বীজমন্ত্র জপ করার পর সাধকের দৃষ্টির সামনে যারাই আসবে, তারাই বশীভূত হবে।

হে পাষণ্ড, নরাধম তান্ত্রিকগণ, হে বিশ্বহিন্দু পরিষদের সাধু-সন্তগণ, আপনাদের মধ্যে কি জাতীয়তাবোধের তলানিও নেই?

আপনারা তান্ত্রিকরা প্রতিদিন সংবাদপত্রগুলোতে বশীকরণের ঢালাও বিজ্ঞাপন দেবেন, আর পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কদের বশ করা থেকে বিরত থাকবেন—এ সহ্যাতীত! এ দেশদ্রোহিতা।

আপনরা ভারতবন্ধু সাদ্দাম হুসেনের মহাশত্রু আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে বশ করুন। আপনারা নীরব থাকলে জনগণ আপনাদের 'ভণ্ড' ও 'পাষণ্ড' অথবা 'অর্থলোভী গণশত্রু' বলে গাল পাড়বে। প্রতারণার ক্ষেত্রে দক্ষিণভারতের 'কেপমারি'দের খুব নাম-ডাক। শুনেছি, তাঁরা প্রথমেই শেখান—প্রতারণা করতে হলে গায়ের চামড়া মোটা করতে হবে। জানি না ভারতের কত প্রতারক-সম্প্রদায় এই নীতিকে গ্রহণ করেছেন!

মারণ-উচ্চাটন

এবার আপনাদের বলবো তন্ত্রে মারণ-উচ্চাটন কীভাবে করতে হবে। আমি যা বলছি, তা তন্ত্রের কথা। বেশির ভাগ ভারতীয়-ই মনে করেন—এসবে কাজ হয়। এইসব তান্ত্রিক পদ্ধতি পড়ে (যা বিভিন্ন প্রাচীন ও আকর তন্ত্র গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে লিখছি) বিশ্বাস করবেন কী না, সেটা আপনার ব্যাপার। মারণ-উচ্চাটন মন্ত্রে শত্রুর মৃত্যু ঘটানো যায় কী না, এ বিষয়ে দোলচালে থাকা আপনি পরীক্ষায় নামতেই পারেন। আবার মারণ-উচ্চাটন'কে কল্পিত প্রস্তাবনা বা Hypothesis হিসেবে গ্রহণ করাটা পাগলামো মনে করতেই পারেন। সব-ই আপনার অভিরুচি। আমি এবার আমার ভূমিকা পালনে নামি।

● বীরতন্ত্রে রয়েছে মারণ-উচ্চাটন পদ্ধতি। সেখানে বলা হয়েছে, কোনও শত্রুকে তন্ত্রের সাহায্যে মারতে গেলে যা করতে হবে তা এই ধরনের—

শনিবার রাতে শ্মশানে যেতে হবে। সঙ্গে নিতে হবে এক টুকরো কালো কাপড়। শ্মশানের শবদাহ করা কাঠকয়লা নিয়ে কালো কাপড়ে মুড়িয়ে লাল সুতো দিয়ে বাঁধতে হবে। এ'বার পুঁটলি ছুঁয়ে এক'শো বার কোনও এক মহাবিদ্যার বীজমন্ত্র জপ করতে হবে। জপ শেষে পুঁটলি শত্রুর ঘরে ফেললে এক সপ্তাহের মধ্যে তার মৃত্যু হবেই।

● ফোৎকারিণীতন্ত্রে বলা হয়েছে, শনিবার রাত-ই মারণ-উচ্চাটন কাজের পক্ষে একমাত্র উপযুক্ত সময়। হলুদ-বাটা ও ক্ষীর একসঙ্গে ভালমত মেশাতে হবে। একটা মানুষের হাড় যোগাড় করতে হবে। হাড়ের ওপর হলুদ ও ক্ষীরের মিশ্রণ দিয়ে বীজমন্ত্র লিখতে হবে। তারপর ওই বীজমন্ত্র এক হাজার বার জপ করে যার বাড়িতে ফেলবেন, দু'মাসের মধ্যে তার মৃত্যু হবেই। হাড় কোনও ক্ষেতে ফেললে সেই ক্ষেতের ফসল মারা যাবে। গ্রামে ফেললে গ্রামের ক্ষতি হবে।

'মারণ-উচ্চাটন' এখানেই শেষ। আমি তো শেষ করলাম, আপনি?

গভীরে নামছি পিছল সিঁড়ি বেয়ে

সত্যকে জানা ও জানানোর উদ্দেশ্যেই এই বই লেখার তাগিদ অনুভব করেছিলাম। অতীতের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল ঈশ্বর ও উপাসনা-ধর্মের বিশ্বাসগুলো। এ'সব নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকা ভালো। আকাডেমিক জিজ্ঞাসা মানব-প্রজাতির উত্তোরণ আনে—ইতিহাস এ'কথাই বলে। অতীত ইতিহাসে গভীরভাবে না ঢুকে, ভালো কোনগুলো, খারাপ কোনগুলো না বুঝেই অতীত ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করাটা অনেক সময় নিজেদের অজ্ঞানতাকেই বে-আব্রু করে। আমাদের ঐতিহ্য তো বহুবিবাহ, সতীদাহপ্রথার মতো অনেক কিছুই ছিল। এগুলো কি গর্ব

করার মতো ঐতিহ্য? তাই এইসব কদর্য প্রথাকে আমরা 'ঐতিহ্য' হওয়া সত্ত্বেও বিদায় করেছি। বড় কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে জয় এসেছে, কু-ঐতিহ্য বিদায় নিয়েছে।

আজ যাঁরা নিজেদের পূর্বপুরুষকে 'আর্য' বলে গর্ব অনুভব করেন, আর্যভাষীদের সব কিছুকে 'ভারতীয় ঐতিহ্য' বলে মনে করেন, আর্য সংস্কৃতির ভিতর গভীর ভাবে না ঢুকেই গদ্গদ হন, তাঁরা শুধু যুক্তিবিরোধী নন, বিপজ্জনকভাবে প্রগতিবিরোধী। এই সব ভণ্ডপ্রাজ্ঞদের বোকা বানানো খুব সোজা। মুশকিল হল আমাদের এই 'মহান' দেশে শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে কোনও বিষয়ে না জেনে সে'বিষয়ে জ্ঞান দানের প্রবণতা বেশি।

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'মধ্যমেধার মহাযজ্ঞ' প্রবন্ধে (দেশ, ১৮ নভেম্বর ২০০2) লিখেছেন, "আমাদের সমাজে এই মাঝারিয়ানার শাসন চলছে, সেই শাসনের দাপট বাড়ছে।" সত্যিই তাই। মধ্যমেধার মানুষের সংখ্যা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ—সর্বত্রই বেশি। কিন্তু ও'সব দেশের মধ্যমেধার মানুষদের সঙ্গে আমাদের দেশে মধ্যমেধার মানুষদের একটা স্পষ্ট পার্থক্য আছে। আমেরিকার মধ্যমেধার নাগরিকরা উচ্চমেধার মানুষ আমদানি করেন। আমেরিকাকে যতই গাল-মন্দ করি, তারপরও স্বীকার করতেই হয়—আমেরিকা সবচেয়ে উন্নত দেশ। বাংলাদেশের মধ্যমেধার নাগরিকরা আমেরিকা হয়ে উঠতে পারেনি বটে, তবে একটি বিষয়ে তাদের-ই মতো। স্পষ্টভাষী। কোনও বিষয়ে জানা না থাকলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন—"জানি না"। এইসব স্পষ্টভাষীদের মনে জিজ্ঞাসা আছে। আন্তরিকতার সঙ্গে জানতে চান। জানতে চাওয়ার লজ্জা-জ্বরে আক্রান্ত হন না।

আমাদের দেশের মধ্যমেধার ভণ্ডরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোকা বনেন স্কুলের চৌকাঠে পাঁচবার হোঁচট খাওয়া গুরু, জ্যোতিষী বা তান্ত্রিক নামের প্রতারকদের কাছে।

উপাসনা-ধর্ম নিয়ে লিখতে লিখতে ভারতে ঢুকতেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে অনেক কিছু। তন্ত্র, যোগ, বশীকরণ ইত্যাদি অনেক কিছু। সবেই গভীর ভাবে ঢুকতে চেয়েছি এই বিশ্বাস নিয়ে—মানুষ সত্যকে জানুক।

এই শহরেরই এক শ্রদ্ধেয় নাট্যকার বলেছিলেন—"সত্য ততটাই প্রকাশিত হয়, যতটা আমরা তাকে এগিয়ে নিয়ে যাই।" কথাটা হয় তো ঠিক এ'রকম, অথবা একটু অন্য রকম ; কিন্তু অর্থটা একই। কথাটা মনে গেঁথে গেছে। সত্যি। কিন্তু আমাদের দেশের মধ্যমেধার মানুষদের কথা মাথায় রেখে বিচারে বসলে মনে হয়—কথাটা আংশিক সত্যি। বিবেকানন্দ বা অরবিন্দকে জানতে, তাঁদের দৈর্ঘ্য মেপে নিতে, তাঁদের রচনাবলি-ই যথেষ্ট। রচনাবলীগুলোর বিক্রিও যথেষ্ট। মধ্যবিত্ত ও মধ্যমেধার

মানুষরাই প্রধান ক্রেতা। তাঁরা কেনেন। ঘরে সাজিয়ে রাখেন। পড়েন না। পড়লে সত্য প্রকাশিত হত। বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের স্বরিবোধী চরিত্র, বিজ্ঞান-বিরোধী চরিত্র, আজগুবি সব বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরা চরিত্র প্রকাশিত হত পড়ুয়াদের চোখে। সত্যকে সামনে পেলেও যাঁরা চোখ বুঝে থাকেন, ভণ্ডামীকে জীবনের সার বস্তু ও মহৎ চালাকি মনে করেন, তাঁদের কথা বোধহয় আমার প্রিয় নাট্যকার মাথায় রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন। তবে বাঁচোয়া যে গোটা সমাজটা মধ্যবিত্ত ও মধ্যমেধার মানুষে ছেয়ে যায়নি।

'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড জ্যোতিষ নিয়ে। যতদূর মনে হয়, জ্যোতিষীদের সকলেই বইটি কিনেছেন। বইটি কেনার পর কেউ কেউ জ্যোতিষী হয়ে বসেছেন—শুনেছি। আবার বহু মানুষ বইটি পড়ে জ্যোতিষ বিশ্বাসকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছেন। এটাই সত্যি।

পিছল সিঁড়িতে পা রেখেছি। এই গ্রন্থ যেমন উপাসনা-ধর্ম, যোগ-তন্ত্রের 'মিথ'কে ভাঙবে মানুষের মননে ঢুকে, তেমনই অনেক ঠগ, লোক ঠকাতে এই গ্রন্থের জ্ঞানকে কাজে লাগাবে। তারপরও ঝুকিঁ নিতে হল। গ্রন্থটির ভালো-খারাপ প্রতিক্রিয়া ওজন করে করে ভালোটাই ভারী মনে হল। ভালোর জন্য এটুকু ঝুঁকি নেওয়া যায়। নিতে হয়।

অধ্যায় ঃ দশ

ইসলাম ধর্ম ও নবি মোহাম্মদ...

ভারতে ইসলাম ধর্মীয়দের সংখ্যা হিন্দু ধর্মের ঠিক পরে। আর, বাঙালিদের মধ্যে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিতের সংখ্যা হিন্দুর চেয়ে বেশি। তাই ইসলাম ধর্ম নিয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করছি।

ইসলামরা নবীন ধর্ম। তারা কেমন ধর্ম কতটা প্রগতিবাদী এটাকে নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে আমরা নামব।

ইসলাম ধর্ম সর্বাধুনিক, চিরন্তন ও বিজ্ঞান। কোরআন আল্লাহর সৃষ্টি। নবি মোহাম্মদ একজন সর্বগুণসম্পন্ন নিখুঁত মানুষ। এর কোনও একটা বাক্যকে কি কেউ খণ্ডন করতে পারবেন? —এমনটা দাবি করেন জাকির নায়েকের মতন কিছু মানুষ।

ইসলাম ধর্ম, আল্লাহর সৃষ্ট কোরআন ও ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মোহাম্মদ এই তিনটিকেই নিয়ে আমাদের বিশ্লেষণে নামতে হবে। আসুন, আমরা মোহাম্মদকে নিয়ে শুরুতে আলোচনা করে নিই। কারণ তিনিই ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক।

মোহাম্মদ-এর জন্ম ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কার কোরাইশ গোষ্ঠীতে। মক্কা ছিল সে সময় ব্যস্ত বাণিজকেন্দ্র। বণিকদের পণ্যসামগ্রী নিয়ে উটের মিছিল আসত। এই মক্কা শহর থেকে ইরাক, পারস্য, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর, রোম, ভারতবর্ষ ইত্যাদি দেশের সঙ্গে কাফেলা বা উট বাহিনীর দল পণ্য নিয়ে যাতায়াত করত।

মোহাম্মদের বাবা আবদুল্লাহ ও মা আমিনা ছিলেন খুবই গরিব। বাবার মৃত্যুর সময় মোহাম্মদ ছিলেন মায়ের পেটে। অভাবের তাড়নায় মা শিশু মোহাম্মদকে এক বেদুইন মহিলার হাতে তুলে দেন। (Ibn Ishaq, The Life of Muhammad., Trs. A. guillaume, Oxford University Press, 2004.) হালিমা নিজের ছেলের সঙ্গে মোহাম্মদকেও লালন পালন করতে থাকেন।

মোহাম্মদ যখন পাঁচ বছরের তখন হালিমা মোহাম্মদকে মা আমিনার কাছে ফিরিয়ে দেন। মোহাম্মদ যখন ছয় তখন আমিনা ছেলেকে নিয়ে মোহাম্মদের দিদিমার বাড়ি মদিনার উদ্দেশে রওনা হন। মক্কা থেকে মদিনা ২১০ মাইলের পথ। হেঁটে ১০-১২ দিন লাগে। মদিনা থেকে মক্কায় ফেরার পথে তিনি মারা যান।

মোহাম্মদ তাঁর চাচা আবু তালিবের পরিবারে স্থান পান। কিশোর বয়স থেকেই গৃহপালিত পশুচারণের জীবিকায় ঢুকে পড়েন।

যৌবনে মোহাম্মদ মক্কার সবচেয়ে ধনী মহিলা ব্যবসায়ীর অধীনে কাজে ঢোকেন। তরুণ স্বাস্থ্যবান যুবকটির প্রতি ধনী মহিলা খাদিজা আকর্ষিত হন। মোহাম্মদের যখন বয়স ২৫ বছর তখন খাদিজা তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। খাদিজার বয়স তখন ৪০ বছর। বিয়ে হয়ে যায়। এটি খাদিজার তৃতীয় বিয়ে।

তখন মক্কায় 'পবিত্র' কাবায় ৩৬০টি ঈশ্বরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মক্কার বেশির ভাগ জনগোষ্ঠীই ছিল পৌত্তলিক।

খাদিজার এক বয়স্ক চাচাত ভাই ওয়ারাকা পৌত্তলিক থেকে খ্রিস্টান হন। (Ibn Ishaq, Page 83) খাদিজাও খ্রিস্টধর্মে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। পরিণতিতে মোহাম্মদও একেশ্বরবাদী ইহুদি ও খ্রিস্ট ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হন। ইহুদি ধর্মের প্রবর্তক মুসা সিনাই পর্বতের গুহায় ধ্যান করে জেহোবার ১০টি প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন বলে ইহুদিদের বিশ্বাস। মক্কাবাসী একেশ্বরবাদীদের মধ্যে পর্বতগুহায় ধ্যান করার রেওয়াজ ছিল। মোহাম্মদও হিরা পর্বত গুহায় প্রায়ই সময় কাটাতেন। মোহাম্মদ ৪৩ বছর বয়সে একদিন দাবি করেন, তিনি অদৃশ্য কণ্ঠস্বর থেকে কিছু বার্তা পেয়েছেন।

স্ত্রী খাদিজা ও ওয়ারাকা মোহাম্মদের কথায় বিশ্বাস করেন। তাঁরা দুজনে মোহাম্মদকে বলেন, স্বর্গের দূত বা ফেরেস্তার মাধ্যমে ঈশ্বরই তাঁকে কিছু বার্তা দিয়েছেন, যেমনটি দিয়েছিলেন মুসাকে।

মোহাম্মদ এই একেশ্বরবাদী ঈশ্বরের নাম দেন আল্লাহ। তখন আরবের পৌত্তলিক ধর্মের প্রধান দেবতার নাম ছিল আল্লাহ।

গোড়ায় মোহাম্মদ তাঁর নতুন ধর্মের নাম দিয়েছিলেন 'ইব্রাহিমের ধর্ম'। ইহুদিদের আদি পিতা ছিলেন ইব্রাহিম।

মোহাম্মদ মক্কাবাসী পৌত্তলিকদের আহ্বান জানান, পৌত্তলিক ধর্ম ছেড়ে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করতে।

এরপর যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কল্পনা করবে, তারা হবে নীতি লংঘনকারী। বলো, "আল্লাহ সত্যভাষী। সুতরাং ইব্রাহিমের সত্যধর্ম অনুসরণ করো। তিনি পৌত্তলিকদের মধ্যেকার ছিলেন না"। দেখো, প্রথম পবিত্রস্থান (কা'বা) মানবজাতির জন্য নির্দিষ্ট করা হয় বেক্কায় (মক্কা), একটি মহিমান্বিত স্থান, জনগণের জন্য একটি

দিক-নির্দেশক, যেখানে রয়েছে সুস্পষ্ট স্মৃতিস্মারক (আল্লাহর দিক নির্দেশনার), 'এটা সেই স্থান যেখানে ইব্রাহিম প্রার্থনার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন; এবং যে-ই এখানে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। এবং আল্লাহর উদ্দেশে এ ঘরের দিকে তীর্থ করা মানবজাতির কর্তব্য। এবং তার জন্য, যে ঐ স্থানাভিমুখে পথ খুঁজে পায়। আর যে অবিশ্বাস করে (তাকে জানতে দাও) : দেখ। আল্লাহ সকল সৃষ্ট জীব থেকে স্বাধীন।' (কোরআন ৩.৯৪-৯৭)।

৬২২ সালের জুনে একেশ্বরবাদী কোরাইশরা মোহাম্মদকে ধর্মবিরোধী কাজের জন্য মক্কা থেকে বিতাড়িত করে। মোহাম্মদ মক্কা ছেড়ে মদিনায় পালিয়ে যান। এই সময় তাঁর ধর্মে আকৃষ্ট হয়েছিল ১০০ খানেক মানুষ। ৮ বছর মোহাম্মদ তাঁর অনুগামীদের নিয়ে মদিনাতেই ছিলেন।

মদিনা আসার পর মোহাম্মদ জঙ্গিবাহিনী গড়ে তুলতে মন দেন। কারণ বুঝেছিলেন, দ্রুত শিষ্যসংখ্যা বাড়াতে শক্তি প্রয়োগই সেরা পথ। কিন্তু চাইলেই তো আর সেনা সংখ্যা বাড়ানো যায় না! তখন তিনি ভয়ঙ্কর একটা লোভের হাতছানি দিলেন গরিব ও দুর্ধর্ষ মরুবাসীদের উদ্দেশে। তিনি বললেন, 'জিহাদ' বা ধর্মযুদ্ধ হল অ-ইসলামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। তিনি এ বিষয়ে যা বলেছিলেন, সবই কোরআনেও স্থান পেয়েছে।

কোরআন-এর সুরা ও আয়াতের ক্রমিক সংখ্যা ২:১৯৩; ৯:৫; ২৯:৭৩ অনুসারে পৃথিবীর সব মানুষকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে 'মুসলমান' এবং 'অমুসলমান'। এবং আরও বলা হয়েছে অমুসলমানরা যতদিন না ইসলামধর্ম গ্রহণ করে ততদিন তাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। তাদের সম্পদ লুট করতে হবে, হত্যা করতে হবে।

আরও বলা হয়েছে, এই যুদ্ধে কোনও মুসলিম শহিদ হলে সে শহিদ হওয়ার পরই বেহেশ্‌তে অর্থাৎ স্বর্গে যাবে। কেয়ামতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। সেখানে সর্বোত্তম খাবার, মদ ও অসাধারণ সুন্দরী কুমারী যুবতী ও সমকামিতার জন্য সুন্দর কিশোর থাকবে।

লুটের মালকে ভোগ করার অধিকার কোরআন দিয়েছে জিহাদি লুটেরাদের। (কোরআন ৮:৬৯) কোরআন-এর ২৩:৫, ৬-তে বলা হয়েছে বন্দি রমণীদের সঙ্গে অবাধে যখন ইচ্ছে সঙ্গম করা যাবে।

মোহাম্মদের 'জিহাদি' যুদ্ধে যারা শিষ্য হিসেবে অংশ নিয়েছিল তাদের বেশির ভাগ ছিল উচ্ছৃঙ্খল সমাজবিরোধী প্রকৃতির মানুষ।

৬২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি বাণিজ্য কাফেলার ওপর জিহাদি আক্রমণ চালায় মোহাম্মদের শিষ্যবাহিনী। কিন্তু বাণিজ্য কাফেলা কিছুটা বড় আকারের এবং অস্ত্রসজ্জিত ছিল। জিহাদিদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়। কয়েক মাসের মধ্যে আরও দুটি কাফেলার ওপর ব্যর্থ আক্রমণ চালান। (Muir W (1894) The Life of Mahomad, London, Page 225-228)।

৬২৮ সালের মার্চে মোহাম্মদ ১৩০০ থেকে ১৫০০ জিহাদি সেনা নিয়ে মক্কা দখলের জন্য এগোন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মক্কা অভিযান স্থগিত রেখে কোরাইশদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি করতে যান। মক্কা অধিকার করতে অভিযান চালালেও কোরাইশদের সশস্ত্র সেনাবাহিনীর সংখ্যা ও দৃঢ়তা দেখে সন্ধি করতে বাধ্য হন।

৬৩০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে মোহাম্মদ ১০,০০০ জিহাদি সেনা নিয়ে মক্কা অভিযান করেন, সন্ধিপত্র ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে।

এবার প্রায় বিনা বাধায় মক্কা দখল করেন। মোহাম্মদ কাবায় পূজিত সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করেন। এবং মক্কাবাসীদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে বাধ্য করেন।

ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য

ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীরা মনে করে ইহুদি ধর্মের আদি পিতা আব্রাহাম-এর অনুসারী সর্বশেষ নবি বা পয়গম্বর হলেন মোহাম্মদ। তার পর আর কোনও নবি জন্মাবেন না। প্রথম নবি হলেন আদম। তারপর এক এক করে জন্মেছেন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবি। এবং শেষ নবি মোহাম্মদই নবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ইহুদি ধর্মের আদি পিতা আব্রাহামকেও নবি মনে করা হয়। আব্রাহামের জন্ম ১৮১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। ইহুদি ধর্মগুরু 'মজেস'কেও নবি মনে করেন ইসলাম ধর্মের মানুষ। মজেসের জন্ম ১৩৯১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি

এক : কোরআন। যা আল্লাহর দৈববাণী। মোহাম্মদের মৃত্যুর দু দশক পর আল্লাহর দৈববাণীগুলো একত্রিত করে যে গ্রন্থে সংকলিত হয়, তাকেই বলে কোরআন।

দুই : নবি মোহাম্মদের কর্মকাণ্ড বা আত্মজীবনী পরবর্তীকালে যা লেখা হয়, তাকেই বলে হাদিস (সুন্নত)।

তিন : জিহাদ অর্থে অমুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংস আক্রমণ চালিয়ে তাদের হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করো, নতুবা তাদের হত্যা করো। এই জিহাদে গিয়ে কারও মৃত্যু হলে তার জন্য আল্লাহ কী কী ভোগের ব্যবস্থা করে রেখেছেন—তা আগেই উল্লেখ করেছি।

চার : শরীয়া আইন। মুসলমানরা মনে করেন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ইহলৌকিক, পারলৌকিক সমস্ত সমস্যা সমাধানের আইন।

পাঁচ : রোজা। মুসলমান ধর্মের প্রথা হল রমজান মাসে খাদ্য, পানীয় এমনকী থুতু পর্যন্ত না গিলে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত থেকে উপবাস পালন করা। এতে নাকি শরীর-স্বাস্থ্য ভাল থাকে। খাদ্যনালী বিশ্রাম পেয়ে সবল হয়। এই যুক্তি কুযুক্তি। পেটে ঘা বা আলসার থাকলে তা উপবাসে আরও বৃদ্ধি পায়।

ছয় : নামাজ। আল্লাহর উপাসনা করা হয় সূর্যোদয়ের আগে, মধ্যাহ্নে, বিকেলে, সূর্যাস্তের সময় ও রাতে। মোট পাঁচবার।

নবি মোহাম্মদের জীবনে নারী

মোহাম্মদ ও খাদিজার বিবাহিত জীবন ২৫ বছর স্থায়ী হয়েছিল। খাদিজা যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স ৬৫ বছর এবং মোহাম্মদের ৫০ বছর। এই দীর্ঘ ২৫ বছরের বিবাহিত জীবনে তিনি ছিলেন একগামী, এক পত্নীব্রত পতি।

খাদিজার মৃত্যুর পর নবি মোহাম্মদ ১৩ বছর বেঁচেছিলেন। এই ১৩ বছরে আরও ১০টি বিয়ে করেছিলেন।

খাদিজা মারা যাওয়ার এক মাসের মধ্যে জাময়াকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন বিধবা। কয়েক মাসের মধ্যে তিনি তৃতীয় বিয়ে করেন। পাত্রী নবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু খলিফা আবুবকরের ৬ বছরের অতি সুন্দরী কন্যা। কন্যার নাম আয়েশা। যৌন মিলন ছাড়া ইসলাম ধর্মে বিয়ে বৈধ নয়। আয়েশার ৯ বছর বয়সে নবি তার সঙ্গে যৌন মিলন ঘটান এবং বিয়ে সিদ্ধ হয়। মোট ১০টি বিয়ে করেছিলেন নবি।

আবার T. P. Huges, 'Dictionary of Islam'। পৃষ্ঠা ৪০০ বলা হয়েছে মোহাম্মদের ২২টি পত্নী ছিল। যাক ১০ পত্নী ধরলেও তাঁর দুজন উপপত্নীও ছিল। একজন ইহুদি। নাম রায়হানা। অন্যজন খ্রিস্টান, মারিয়া।

মোহাম্মদের একটি বিয়ে নিয়ে বিতর্ক আছে। নীতিবোধ বহির্ভূত কি না—এই নিয়ে বিতর্ক।

জায়েদ ছিলেন মোহাম্মদের পালিত পুত্র। পালিত পুত্র হিসেবে গ্রহণ করার পর জায়েদ পরিচিত হন জায়েদ বিন মোহাম্মদ বলে। জায়েদের বিয়ে হয় জয়নব-এর সঙ্গে। একদিন নবি জয়নবকে দেখে অত্যন্ত কামার্ত হয়ে ওঠেন। জায়েদ পিতার ইচ্ছা পূরণ করতে জয়নবকে তালাক দেন। জয়নবকে বিয়ে করার পক্ষে বাধা ছিল আরবের সামাজিক প্রথা। পালিত পুত্রের বউকেও শ্বশুর বিয়ে করতে পারেন না।

শেষ পর্যন্ত মোহাম্মদ আল্লাহর প্রত্যাদেশ পেলেন। নবির জন্য আল্লাহর প্রত্যাদেশ, প্রাক্তন পুত্রবধূকে বিয়ে করতে পারেন। নবি এবার প্রাক্তন পুত্রবধূকে বিয়ে করে নিলেন।

ইসলাম ধর্মে গুনাহ

ইস্‌লাম ধর্মের গুনাহ বা মহাপাপ ৫০টি। তার মধ্যে সঙ্গীত ও প্রাণীর ছবি আঁকা মহাপাপ। দাড়ি কামানো ও এক মুঠোর কম দাড়ি রেখে বাকিটা ছেঁটে ফেলা মহাপাপ। আরবি পোশাক না পরে প্যান্ট-শার্ট, ধুতি-পাঞ্জাবি ইত্যাদি পোশাক পরা মহাপাপ। শুয়োরের মাংস খাওয়া, মদ্যপান, সুদ গ্রহণ মহাপাপ।

ভাল। কিন্তু মহাপাপ না করলে বাংলাদেশের বাঙালিদের ১ বৈশাখের জাতীয় উৎসব শাড়ি, ধুতি, পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত বাঙালিদের দেখতে পেতাম না। তাঁদের অসাধারণ গান কখনই শুনতে পেতাম না। বাংলাদেশের ব্যাঙ্কগুলো জমা টাকার ওপর সুদ দেয়। ঋণের টাকার ওপর সুদ নেয়।

সুফিরা গানে শ্রোতাদের মাতিয়ে দেন। এরপর কট্টর ইসলাম ধর্মবাদীরা কী বলবেন? ইসলাম সর্বাধুনিক উপাসনা ধর্ম?

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী

বৃহত্তর ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলাম এসেছে সবচেয়ে পরে, অর্থাৎ আধুনিকতম। ইসলাম ধর্ম নারীকে দিয়েছিল কিছু অধিকার যা হিন্দু, খ্রিস্ট বা ইহুদি ধর্ম দেয়নি। তারপর শত শত বসন্ত এসেছে, বিদায় নিয়েছে। ইসলামি পুরুষতন্ত্রের ফাঁস আলগা না হয়ে আরও বেশি করে চেপে বসেছে। নারী আরও বেশি শৃঙ্খলিত হয়েছে। ইসলামি সমাজের বিবর্তনে আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রগতির পরিবর্তে সমাজ তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের আবর্তে।

ইসলাম ধর্মগ্রন্থ কোরআন-এ আছে [সুরা নিসা : ৩৪], "পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লা তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন...স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদের প্রহার কর।"

কেন প্রহার? স্ত্রী কি পুরুষের ক্রীতদাসী? নারী পুরুষকে সমান চোখে দেখে কোরআন নারীকে একসঙ্গে চারটি পতি গ্রহণের অনুমোদন দিতে পারেনি। অথচ পুরুষদের ক্ষেত্রে কোরআন বলছে [সুরা নিসা : ৩], "বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাদের ভালো লাগে, দুই, তিন অথবা চার।"

ইসলাম ধর্ম নারীকে দেখেছে পণ্য হিসেবে। ভোগের সামগ্রী হিসেবে। মানুষ হিসেবে নয়। তারই পথ নির্দেশ রয়েছে কোরআন-এ। সেখানে বলা হচ্ছে [সুরা

বাকারা : ২২৩], "তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র; তাই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে খুশি প্রবেশ করতে পার।"

ইসলাম ধর্ম নারীকে দেখেছে পণ্য হিসেবে। ভোগের সামগ্রী হিসেবে। মানুষ হিসেবে নয়। তারই পথ নির্দেশ রয়েছে কোরআন-এ। সেখানে বলা হচ্ছে [সুরা বাকারা : ২২৩] "তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র; তাই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে খুশি প্রবেশ করতে পার।"

মুসলিম শরীয়াত আইনে নারীকে কিছু আর্থিক ও সম্পত্তির অধিকার দিয়ে কেড়ে নিয়েছে নারীর মানুষ হয়ে ওঠার অধিকার। মুসলমান স্বামী চারটি স্ত্রীর ওপর যখন তখন যৌন অধিকার ফলাতে পারে, যার আর এক নাম অবশ্যই ধর্ষণ। মানবকিতার উপর ধর্ষণ। মুসলমান স্বামীর ধর্মীয় অধিকার রয়েছে কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও স্ত্রীকে শুধু তিনবার 'তালাক' নামক শব্দটি উচ্চারণ করে তাড়িয়ে দেওয়ার। মুসলমান স্বামী একসঙ্গে চার স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করার অধিকারী। তাই পুরনো এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নতুন স্ত্রী ঘরে এনে আইনি লাম্পট্য চালাতেই পারে। এমন তালাকের সুযোগে পুরুষ সম্ভোগ করতে পারে বহু নারী। এমন যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা চালাবার পুরুষ সুলভ অধিকার যে ধর্ম দেয় সে ধর্ম অবশ্যই সুন্দর পৃথিবী গড়ার ধর্ম হতে পারে না।

ধর্মের সূত্র ধরে মরক্কোর সংবিধানে স্ত্রীকে স্বামীর আইনি ক্রীতদাসী করা হয়েছে। ও দেশের সংবিধানে বলা হয়েছে—স্ত্রী বাধ্য বা বিশ্বস্ত থাকবে স্বামীর কাছে, স্বামীর পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনদের সম্মান করবে। স্ত্রী যদি তার মা-বাবাকে দেখতে চায়, স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। ["The Sisterhood of Man" by Newland Kathleen : W. W. Norton & Co., New York : 1979, Page 24]

ইসলামে বিয়ে একটি চুক্তি। ইসলামে বিয়েতে পাত্রপাত্রী যে চুক্তিতে আসে, তা পাত্রপাত্রী ঠিক করে না। চুক্তি সম্পাদন করে পাত্রপাত্রীর অভিভাবক। এই চুক্তি একজন মালিকের সঙ্গে একজন গোলামের চুক্তি ভিন্ন যে কিছুই নয়, তা মুসলিম ধর্মীয় অনুশাসনে নারীদের অবস্থান নিয়ে সামান্য যে আলোচনা করেছি তাতেই যথেষ্ট বেশিই বোঝা গেছে। বিয়েতে নারীর সম্মতির কথা বলা হয়েছে বটে কিন্তু বাস্তবে এই সম্মতি একটি নিয়মরক্ষা বা অভিনয় বই কিছুই নয়। অভিভাবকরা বিয়ে ঠিক করে ফেলার পর আমন্ত্রিতদের সামনে পাত্রীর সম্মতি, একটি আচারের চেয়ে বাড়তি গুরুত্ব পায়নি।

ইসলামে বিয়েতে পাত্র-পাত্রী যে চুক্তিতে আসে, তা পাত্রপাত্রী ঠিক করে না। চুক্তি সম্পাদন করে পাত্র-পাত্রীর অভিভাবক। এই চুক্তি একজন মালিকের সঙ্গেএকজন গোলামের চুক্তি ভিন্ন যে কিছুই নয়।

এমন চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরও মধ্যপ্রাচ্যের ধনীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে তালাক দেওয়ার রেওয়াজ চালু রয়েছে। তালাক দিয়ে নিত্য নতুন মনপসন্দ নারীদের চুক্তি করে বিয়ে করেই চলে ধনী লম্পটরা। তারা যে স্ত্রীকে বন্ধুর পরিবর্তে ভোগপণ্য বা রক্ষিতা বই কিছু মনে করে না, এ কঠোর বাস্তব। ইসলামে বিয়ে যেহেতু চুক্তি, তাই তা যে কোনও সময় বাতিল হতে পারে। তবে বাতিল করার একমাত্র অধিকার রয়েছে পুরুষের; নারীর নয়।

আরব অঞ্চলে 'ইদ্দা' নামে একটি ধর্মীয় বিধান রয়েছে। এই বিধান মতো স্বামী তিন মাসের জন্য স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে এবং তিন মাস পরে আবার তালাক দেওয়া স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারে। এই মধ্যবর্তী সময়ে স্বামী কোনও নারীকে স্ত্রী করে তার চার স্ত্রীর রাখার ধর্মীয় অধিকার বজায় রাখতে পারে। আরবের অনেক পুরুষ 'ইন্দা' বিধান মতো চার স্ত্রীকেই মাঝে মাঝে তিন মাসের জন্য বিদায় দিয়ে নতুন চার স্ত্রীকে নিয়ে যৌন উত্তেজনা উপভোগ করে।

মুসলমান পুরুষ যে কোনও ধর্মের নারীকেই বিয়ে করার অধিকারী। কিন্তু মুসলমান নারী বিধর্মীকে বিয়ে করার অধিকারী নয়। সত্যিই কি বিচিত্র সাম্য! যে ধর্ম মানুষকে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, সে ধর্ম কখনই মানুষের ধর্ম হতে পারে না। প্রতিটি অলৌকিক ও অলীক বিশ্বাস নির্ভর ধর্ম নিয়ে সামান্য পড়াশুনো করলেই দেখতে পাবেন এরা কী প্রচণ্ড রকমের মানবিকতার শত্রু। এরা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে। সৃষ্টি করে ঘৃণা।

খ্রিস্ট ও ইহুদি ধর্ম একইভাবে নারীকে শয়তানের আসনে বসিয়েছে। আর তাই শোষক শ্রেণির কাছে 'ধর্ম' আজ এক শক্তিশালী অস্ত্র, যার সাহায্যে শোষিতদের ভেঙে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা যায় পরম নিশ্চিন্তে, অবহেলে, বিনা প্রতিবাদে, বিনা প্রতিরোধে।

মুসলিম দুনিয়ার বহু দেশেই 'নারী-খৎনা' নামের এক বীভৎস, বর্বরোচিত ধর্মীয় প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এই প্রথা মনুষ্যসমাজের কলঙ্ক বই কিছু নয়। এই প্রথা পুরুষকে মানুষ থেকে শয়তানে পরিণত করেছে। আর নারীকে পরিণত করেছে পশুতর জীবে।

খৎনা প্রথা আজও প্রচলিত আছে ঘানা, গিনি, সোমালিয়া, কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া,

নাইজিরিয়া, মিশর, সুদানসহ উপসাগরীয় বিভিন্ন দেশে। এইসব দেশে নারীদের যৌন কামনাকে অবদমিত করে যৌন আবেগহীন যৌন-যন্ত্র করে রাখতে পুরুষশাসিত সমাজ বালিকাদের ভগাঙ্কুর কেটে ফেলে। নারীর যৌন আবেগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় যোনির প্রবেশমুখে পাপড়ির মতো বিকশিত ভগাঙ্কুর। নারীদের খৎনা করা হয় ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার আগে অর্থাৎ সাধারণভাবে সাত-আট বছর বয়সে। খৎনা যারা করে তাদের বলা হয় 'হাজামী'। দু'জন নারী শক্ত করে টেনে ধরে বালিকার দুই উরু। দুই নারী চেপে ধরে বালিকার দুই হাত। 'হাজামী' ছুরি দিয়ে কেটে ফেলে ভগাঙ্কুর। এই সময় উপস্থিত নারীরা সুর করে গাইতে থাকেন, "আল্লা মহান, মহম্মদ তার নবী; আল্লা আমাদের দূরে রাখুক সমস্ত পাপ থেকে"।

পুরুষশাসিত সমাজ ওইসব অঞ্চলের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই বিশ্বাসের বীজ রোপণ করেছে, কাম নারীদের পাপ, পুরুষদের পুণ্য। খৎনার পর সেলাই করে দেওয়া হয় ঋতুস্রাবের জন্য সামান্য ফাঁক রেখে যোনিমুখ। খোলা থাকে মূত্রমুখ। খৎনার পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত বালিকার দুই উরুকে একত্রিত করে বেঁধে রাখা হয়, যাতে যোনিমুখ ভালমতো জুড়ে যেতে পারে। বিয়ের পর সেলাই কেটে যোনিমুখ ফাঁক করা হয়; স্বামীর কামকে তৃপ্ত করার জন্য। আবারও বলি স্বামীর কামকে তৃপ্ত করার জন্যই; কারণ নারীর কাম তো ওরা পাপ বলে চিহ্নিত করে নারীকে করতে চেয়েছে কাম-গন্ধহীন যৌন-যন্ত্র। সন্তান পেলে বা বিধবা হলে আবার নতুন করে সেলাই পড়ে ঋতুস্রাবের সামান্য ফাঁক রেখে। আবার বিয়ে, আবার কেটে ফাঁক করা হয় যোনি। জন্তুর চেয়েও অবহেলা ও লাঞ্ছনা মানুষকে যে বিধান দেয়, সে বিধান কখনও মানুষের বিধান হতে পারে না। এ তো শুধু নারীর অপমান নয়, এ মনুষ্যত্বের অবমাননা।

ইসলামের বেহেশত শুঁড়িখানা আর বেশ্যাপল্লী বই কিছুই নয়। এখানে যৌন-সুখ ও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার অধিকারী পুরুষ। বেহেশতের হুরেরা সৌন্দর্যে সূর্য, চন্দ্রকেও মলিন করে। পুরুষদের জন্য বেহেশতের সুখ বিষয়ে কোরআন বলছে, "ওদের সঙ্গিনী দেব আয়তনয়না হূর।" [সুরা দুখান : ৫৪] , "সাবধানীদের জন্যে রয়েছে সাফল্য : উদ্যান, দ্রাক্ষা, সমবয়স্কা উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী এবং পূর্ণ পানপাত্র।" [সুরা নাবা : ৩১ : ৩৪] এই আয়তনয়না অসামান্য সুন্দরী হূরদের সঙ্গে বেহেশতে আসা পৃথিবীর পুরুষদের মিলন ঘটাবার লোভ দেখানো হয়েছে [সুরা তুর : ২০] কোরআনে। এইসব স্বর্গসুন্দরীরা হবে অনাঘ্রাত ফুল এবং বেহেশতে আসা পুরুষরাই তাদের জীবনের প্রথম পুরুষ, সেই নিশ্চিন্ততার প্রতিশ্রুতিও রয়েছে কোরআনে [সুরা রহমান : ৫৬]।

ইসলামের বেহেশত শুঁড়িখানা আর বেশ্যাপল্লী বই কিছুই নয়। এখানে যৌন-সুখ ও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার অধিকারী পুরুষ।

কল্পিত স্বর্গ বেহেশতে নারীদের কোনও স্থান হয়নি। বরং মুসলিম নীতি নির্দেশক গ্রন্থ হাদিসে বলা হয়েছে, ''নারী শয়তানের রূপে আসে আর শয়তানের রূপে যায়।''

ইসলামে বলা হয়েছে দাসীকে ধর্ষন অধিকার প্রভুর আছে। তাই বাজার থেকে কিনে বা যুদ্ধ জয় করে কারোর স্ত্রী বা কন্যাকে আনলে সে হবে দাসী। সেই দাসীকে বলাৎকার করলে তাতে কোন অপরাধ বা পাপ হয় না। একথা কোরআন-এর ২৩ সূরা মুমিনূন-এ লেখা আছে।

হিন্দু ধর্মে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-তে বলা হয়েছে প্রভু দাসীকে ধর্ষণ করলে তা গুরুতর অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। ধর্ষণকারীর কঠোর শাস্তি হবে এবং দাসীকে এইক্ষেত্রে মুক্তির বিধান দেওয়া হয়েছে।

ইসলামে যাকাত

ইসলামে সাম্য আনার প্রক্রিয়া হিসাবে দান বা যাকাত এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এটা কোনভাবেই অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার পথ হতে পারে না। কারণ, ভিক্ষে করে ও ভিখারিদের দ্বারা সাম্য আনা যায় না।

ইসলাম ধর্মে শাসকদের প্রতি শাসিতদের জন্য একতরফা আনুগত্য দেখানোর কথা বলা হয়েছে। ৩ সূরা আল্ ইমরাণ।

সুফি মতবাদ ও উদারতা

অনন্ত বিজয় : 'সুফি' মতবাদ বিষয়ে জানতে চাই। সুফিরা কি মুসলমান সন্ন্যাসী? ওরা কি বাউলদের মতোই গান গেয়ে মানুষকে ভালোবাসার কথা শোনায়?

প্রবীর : সুফিদের উৎপত্তি ইসলাম ধর্ম থেকে। তবে অনেক রূপান্তর ও পরিবর্তন ঘটেছে সুফি সম্প্রদায়ের মধ্যে।

ইসলাম ধর্মের প্রবক্তা নবি হজরত মোহম্মদ। তিনি প্রধান তিনটি নীতি ঠিক করে দিয়েছিলেন নামাজ, রোজা ও জিহাদ। জিহাদ কী—তা আগেই বলেছি।

নবি মহম্মদ বলে গিয়েছিলেন, কোরআন* হল সৃষ্টিকর্তার প্রত্যাদেশ।

খ্রিস্টান ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে আজাদির লড়াইতে অংশ নিতে দূর দূর দেশ থেকে হাজার হাজার মুসলিম আসতে থাকে। এইসব জেহাদিদের মধ্য থেকেই কিছু কিছু মুসলিমদের সীমান্তে দুর্গরক্ষার কাজ দেওয়া হয়। এইসব 'রিয়াত' বা চৌকির দায়িত্বে থাকা জেহাদিদের বলা হত 'গাজি'। উদ্দেশ্য : বিধর্মীরা যাতে মাথা চাড়া দিতে না পারে।

এই 'গাজি'রা সুদীর্ঘ কাল ধরে পরিচিত সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে থাকতে শুকনো রুটি ও বেশি হলে সঙ্গে একটু খেজুর খেয়ে অতি সাধারণ জীবন যাপন করত। পরিধানে থাকত সাদা বস্ত্রের পোশাক।

ভোগহীন নিঃসঙ্গ জীবন ছিল বৈচিত্রহীন। এই গাজিরাই জিহাদের যোদ্ধাদের প্রলোভন দেখাবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে থাকে। ওদের 'রিয়াত' বা চৌকিগুলো হয়ে ওঠে আধ্যাত্মিক চিন্তার আশ্রম। ওরা গান-বাজনার মধ্য দিয়ে শান্তি খুঁজে পায়। শরীয়া অনুসারে কিন্তু গান-বাজনা নিষিদ্ধ। এই সম্প্রদায়ের লোকেরাই 'সুফি' বলে পরিচিত হয়। সম্ভবত সাদা পোশাক পরিধানের সঙ্গে সুফি নামকরণের সম্পর্ক ছিল।

সুফিরা গান গাইতে গাইতে অতি আবেগে ভরগ্রস্তের মত আচরণ করে। হরিসংকীর্তনের আসরেও এই ধরনের ভর দেখা যায়। এগুলো হিস্টিরিয়ার লক্ষণ।

পরবর্তীকালে সুফিরা অঞ্চল বিশেষে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়। তবে তারা মূলত ইসলামের গোঁড়ামি থেকে সরে এসেছিল। শরীয়া বিধানের গোঁড়ামি থেকে নিজেদের মুক্ত করেছিল।

ধীরে ধীরে সুফি মতবাদ বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ওদের অনেকেই নবির পথনির্দেশ মানে না। কোরআন পড়ে না। রোজা, নামাজ প্রভৃতি ত্যাগ করে।

দ্বাদশ শতকে এসে ইমাম গাজ্জালী সুফিবাদকে একটা নতুন রূপ দেন। তাঁর সুফিবাদে ইসলামের কিছু ভুল ধারণা ও আচার বাদ দেন। কিন্তু তারপরও মুলত ইসলামি গোঁড়ামি বাঁচিয়ে রাখেন।

* কোরআন লিখে ১:২ বা ৯:৬ লিখলে বুঝতে হবে 'কোলন' (:) চিহ্নের আগের সংখ্যাটি হল সুরার সংখ্যা। এবং কোলন (:) চিহ্নিত পরের সংখ্যাটি হল সুরার আয়াতের ক্রমিক সংখ্যা।

ফলে গাজ্জালীর সুফিবাদ মুসলিম সমাজ মেনে নেয়। এবং গাজ্জালীর সুফিবাদই সুফি সম্প্রদায়ের মূলস্রোত হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতে তুর্কীরা যখন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করে, তখন (১২০৬ খ্রিস্টাব্দে) মুসলিম হামলাকারিদের সঙ্গী হিসেবে গাজ্জালীপন্থী সুফিদের ভারতে আগমন ঘটে। সুফিনেতা ইমাম গাজ্জালী ছিলেন গোঁড়া জিহাদি।

ভারতে এই সময় বিখ্যাত সুফি দরবেশ নিজামুদ্দিন আউলিয়া, আমির খসরু, খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি, নাসিরুদ্দিন চিরাগ-এর আগমন ঘটে।

মণীশ : খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির মাজার রয়েছে আজমেঢ়। সেখানে প্রতি বছর বহু হিন্দুও মঈনুদ্দিনের মাজারে চাদর চড়াতে যায়। অমিতাভ বচ্চন ও তাঁর ফ্যামিলি, আমাদের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন ধোনির ওয়াইফ ইত্যাদির মত বহু হিন্দু সেলিব্রিটিরা যান চাদর চড়াতে। এতে তাঁদের প্রার্থনা পূর্ণ হবে মনে করেন। এতে বোঝা যায় মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি ছিলেন উদার মনের সুফি সাধক, যাঁর কাছে সব ধর্মের মানুষই সমান।

থারটিনথ্ সেঞ্চুরিতে মুসলিম হামলাকারীদের সাথী হিসেবে মঈনুদ্দিনরা ভারতে এসেছিলেন বলে জানালেন। তাহলে তিনি কীভাবে বিধর্মী প্রেমিক হলেন? দ্বিধায় পড়ে যাচ্ছি।

প্রবীর : আমি কিন্তু একবারও বলিনি যে মঈনুদ্দিন সব ধর্মের মানুষদেরই ভালবাসতেন। বরং তিনি হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুদের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘৃণা পোষণ করতেন। আজমেঢ়ে পৌঁছে এই সুফি সাধক প্রতিদিন একটা করে মন্দিরের সামনে গরু জবাই করে গোরক্ত মন্দিরে ছিটিয়ে দেওয়ার কাজ করে গেছেন তাঁর সুফি শিষ্যদের সাহায্যে।

অনেক হিন্দু সেলিব্রিটির জ্ঞান-গম্মি পালের ভেড়ার মত। ভেড়ারা যখন চলতে থাকে, তখন তাদের সামনে একটা লাঠি হাতখানেক ওপরে লম্বালম্বি রাখলে প্রথম ভেড়া লাফিয়ে পার হবে। এবার লাঠি সরিয়ে নাও। দেখবে যে জায়গায় এসে প্রথম ভেড়া লাফিয়েছিল সে জায়গায় এসে সব ভেড়াই লাফিয়ে পার হচ্ছে।

মণীশ : ইসলামে বিশ্বাসীরা কী করে কোনও পীর, ফকির বা সুফির সমাধিতে নতজানু হতে যায়—মাথায় ঢোকে না। ইসলাম ধর্ম বলে আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানাবে না।

প্রবীর : যা বলেছ, সব ঠিক। মাজার তৈরি করাই ইসলাম ধর্ম বিরোধী। তার পরও ভারতীয় উপমহাদেশে অনেক মাজার। এ-সবই গড়ে উঠেছে এই উপ-মহাদেশে বৌদ্ধ স্তূপ ও হিন্দু মন্দিরের দেখাদেখি।

মণীশ : আমির খসরু উদার সুফি কবি হিসেবে খ্যাত। তিনিই কাওয়ালি গানের স্রষ্টা। তিনি যে উদার ছিলেন—এটা তো ঠিক?

প্রবীর : উদারতার ব্যাপারটা বেঠিক। আমির খসরু ছিলেন তবলারও স্রষ্টা। এও ঠিক যে, তিনি আদৌ উদার ছিলেন না। হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ বা ঘৃণা তিনি কখনওই ঢেকে রাখেননি।

রেইকি গ্র্যান্ডমাস্টার, ফেং শুই ক্ষমতার দাবিদার, জ্যোতিষী ও অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের প্রতি

২৫ লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ

আজ এই বইটি প্রকাশের দিন থেকে আমি প্রবীর ঘোষ, এই বইটির লেখক, ঘোষণা রাখছি। বিশ্বের যে কোনও ব্যক্তি কোনও কৌশলের সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা আমার নির্দেশিত স্থানে ও পরিবেশে নিম্নলিখিত যে কোনও একটি ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে পারেন, তবে তাঁকে ২৫ লক্ষ ভারতীয় টাকা দিতে বাধ্য থাকব।

আমার এই চ্যালেঞ্জ আমার মৃত্যু পর্যন্ত অথবা প্রথম অলৌকিক ক্ষমতাবানকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

যে ঘটনাগুলোর যে কোনও একটি অলৌকিক ক্ষমতায় দেখাতে হবে ঃ

১। রেইকি ক্ষমতায় অথবা অলৌকিক ক্ষমতায় আমার তরফ থেকে হাজির করা রোগীকে ১৮০ দিনের মধ্যে রোগমুক্ত করতে হবে। মৃত্যুর দায় পুরোপুরি বহন করতে হবে রেইকি মাস্টার বা অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারকে।

২। অচল টেপ রেকর্ডারকে, রেডিওকে রেইকি ক্ষমতার দ্বারা বা অলৌকিক উপায়ে সচল করতে হবে।

৩। 'ফেং-শুই'-এর অভ্রান্ততা প্রমাণ করতে হবে।

৪। 'বাস্তুশাস্ত্র'-এর সাহায্যে লকআউট কারখানা খুলে লাভের মুখ দেখাতে হবে।

৫। জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে বা অলৌকিক ক্ষমতাবলে আমার দেওয়া দশটি ছক বা হাতের ছাপ দেখে প্রত্যেক ছক বা হাতের ছাপের অধিকারীর অতীত সম্বন্ধে পাঁচটি করে প্রশ্নের মধ্যে অন্তত চারটি করে সঠিক উত্তর দিতে হবে।

৬। আমার তরফ থেকে হাজির করা ছবির মেয়েটিকে ১৮০ দিনের মধ্যে বশীকরণ করতে হবে।

৭। আমার দেওয়া কোনও ছেলে বা মেয়েকে 'সরস্বতী কবজ' দিয়ে বা অলৌকিক উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম করাতে হবে।

৮। প্রজাপতি কবজে বা অলৌকিক ক্ষমতায় আমার দেওয়া ছেলে বা মেয়েকে ১৮০ দিনের মধ্যে বিয়ে দিতে হবে।

৯। আমার তরফ থেকে হাজির করা মামলা জেতাতে হবে।

১০। তন্ত্রের দ্বারা বা অলৌকিক উপায়ে সন্তানহীনাকে জননী করতে হবে। সন্তানহীনাকে হাজির করব আমি।

১১। তন্ত্রের দ্বারা বা অলৌকিক উপায়ে যৌন-অক্ষমকে যৌনক্ষমতা দিতে হবে।

১২। আমার দেওয়া চারজন ভারতবিখ্যাত মানুষের মৃত্যু সময় আগাম ঘোষণা করতে হবে।

১৩। প্ল্যানচেটে আত্মা আনতে হবে।

১৪। সাপের বিষ কোনও কুকুর বা ছাগলের শরীরে ঢুকিয়ে দেবার পর তাকে অলৌকিক উপায়ে সুস্থ করতে হবে।

১৫। বিষ পাথরের বিষশোষণ ক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে।

১৬। কঞ্চি চালান, বাটি চালানের সাহায্যে চোর ধরে দিতে হবে।

১৭। থালা পড়ার সাহায্যে বিষ নামাতে হবে।

১৮। নখদর্পণ প্রমাণ করে চোর ধরে দিতে হবে।

১৯। চালপড়া খাইয়ে চোর ধরে দিতে হবে।

২০। যোগবলে শূন্যে ভাসতে হবে।

২১। যোগবলে ১০ মিনিট হৃদস্পন্দন বন্ধ রাখতে হবে।

২২। একই সঙ্গে একাধিক জায়গায় আবির্ভূত হতে হবে।

২৩। টেলিপ্যাথির সাহায্যে অন্যের মনের খবর জানতে হবে।

২৪। জলের ওপর হাঁটা।

২৫। এমন একটি বিদেহী আত্মাকে হাজির করতে হবে, যার ছবি তোলা যায়।

২৬। যা চাইব, শূন্য থেকে তা সৃষ্টি করতে হবে।

২৭। মন্ত্রে দু'ঘন্টার মধ্যে বৃষ্টি নামাতে হবে।

২৮। মানসিক শক্তির সাহায্যে কঠিন কোনও বস্তুকে বাঁকাতে হবে বা সরাতে হবে।

২৯। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় আমার বা আমার মনোনীত কোনও ব্যক্তির চালানো গাড়ি থামাতে হবে।

৩০। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির সাহায্যে একটি খামে বা বাক্সে রাখা জিনিসের সঠিক বর্ণনা দিতে হবে।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত শর্তগুলো মানতে হবে :

১। আমার চ্যালেঞ্জের অর্থ গ্রহণ করুন বা না করুন, আমার চ্যালেঞ্জ যিনি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাঁকে আমার কাছে, আমার মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে জামানত হিসেবে কুড়ি হাজার টাকা জমা দিতে হবে। তিনি জিতলে আমার চ্যালেঞ্জের টাকাসহ তাঁর জামানতের টাকাও ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

জামানতের ব্যবস্থা রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য আমার সময় ও অকারণ শ্রম বাঁচানো, সেই সঙ্গে যাঁরা শুধুমাত্র সস্তা প্রচারের মোহে অথবা আমাকে অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে

ফেলার জন্য এগোতে চান, তাঁদের প্রতিহত করা।

২। যাঁর নামে জামানতের অর্থ জমা হবে, একমাত্র তিনিই চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী হিসেবে গণ্য হবেন।

৩। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী ছাড়া আর কারও সঙ্গে চ্যালেঞ্জ বিষয়ে কোনও রকম আলোচনা চালানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

৪। কেবলমাত্র চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী চ্যালেঞ্জ বিষয়ে পরবর্তী আলোচনায় আমার সঙ্গে অথবা আমার মনোনীত ব্যক্তির সঙ্গে বসতে পারবেন বা যোগাযোগ করতে পারবেন।

৫। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীকে আমার মনোনীত ব্যক্তিদের সামনে দাবির প্রাথমিক পরীক্ষা দিতে হবে।

৬। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী দাবির প্রাথমিক পরীক্ষায় কোনও কারণে হাজির না হলে, অথবা দাবি প্রমাণ করতে না পারলে, তাঁর জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৭। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আমি সর্বসমক্ষে চূড়ান্ত এবং শেষ পরীক্ষা গ্রহণ করব।

৮। পরীক্ষায় চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ রাখলে, আমি পরাজয় স্বীকার করে নেব।

আপনারা নিশ্চই লক্ষ্য করেছেন, আমি সেই অলৌকিক ক্ষমতাগুলোই দেখাতে বলেছি, যে'গুলোকে নিয়ে বিভিন্ন রেইকি-গ্র্যান্ডমাস্টার, ফেং শুই বিশেষজ্ঞ, বাস্তুবিশেষজ্ঞ, জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, ওঝা, গুণিন ও উপাসনা-ধর্মের গুরুরা দাবি করেন। পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে হেঁকে-ডেকে দাবি করেন।

আমি চাই, আমার এই চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে আরও কিছু মানুষ বুঝতে শিখুন, বিশ্বাস করতে শিখুন, অলৌকিক ক্ষমতাবান কোনও ব্যক্তির অস্তিত্ব বিশ্বে নেই। অলৌকিকতা যা আছে, তা শুধুই পত্র-পত্রিকা, 'ধর্মগ্রন্থ' ও বইয়ের পাতায়।

'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড লেখার সময় রেইকি, ফেং শুই, বাস্তু ইত্যাদি বিশেষজ্ঞ প্রতারকদের রমরমা ছিল না। ওদের প্রতারণা বে-আব্রু করতেই চ্যালেঞ্জের পৃষ্ঠাটি ঢেলে সাজালাম।

অলৌকিক নয়, লৌকিক

প্রবীর ঘোষ